তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ২১

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

ভলিউম ২১

তিন গোয়েন্দা

৭৩, ৭৪, ৭৫

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-16-1284-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল. ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Website. www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Volume-21
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

ধূসর মেরু ৫-১০৬
কালো হাত ১০৭-১৮২
মূর্তির হুঙ্কার ১৮৩-২৪৮

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৫২/-
তি. গো ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৪২/-

তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-

ধূসর মেরু

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৯৩

'আইসল্যাণ্ডে যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন।

বরফের দেশে যাবার কথাটা যেন মধুবর্ষণ করল তিন গোয়েন্দার কানে। স্কুল ছুটি। হাতে কোন কেস নেই। ইয়ার্ডের কাজকর্মও কম। একঘেয়ে লাগছিল বলে গানের কোম্পানি থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছে রবিন। বসে থেকে থেকে গায়ে ঘুণ ধরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল ওদের, এই সময় এরকম একটা আমন্ত্রণ মধু তো বর্ষণ করবেই।

হেডকোয়ার্টারে বসে আফসোস করছিল কিশোর আর রবিন, চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার থাকলেও হয়তো একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারতেন। তিনি আমেরিকায় নেই। শুটিঙের কাজে বাইরে গেছেন। কত দিনে ফিরবেন কোন ঠিকঠিকানা নেই। কি করবে ভেবে ভেবেও যখন কিছু ঠিক করতে পারছিল না দুজনে, এই সময় বাজল টেলিফোন। করেছেন ভিকটর সাইমন। ওদেরকে যেতে বললেন। জরুরী কথা আছে। সেই জরুরী কথাটাই এখন বলছেন তিনি।

'আইসল্যাণ্ড?' চমকে গেছে রবিন।

'হ্যাঁ,' মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকালেন ডিটেকটিভ।

'কি ব্যাপার? কোন রহস্য?' জানতে চাইল কিশোর।

পিঠ-উঁচু স্যুইভেল চেয়ারে দোল খেলেন সাইমন, 'হ্যাঁ। অনেক জটিল আর বিপজ্জনক রহস্যের সমাধান তোমরা করেছ, সেই তুলনায় এই রহস্যটা তেমন কিছু না, যদি…' চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

'যদি?'

'যদি আরেকটা রহস্যের সাথে যোগাযোগ না থাকে।'

'আছে ভাবছেন নাকি?'

'থাকতে পারে। সেটা নিয়েই এখন কাজ করছি আমি। যাই হোক, সেটা টপ সিক্রেট ব্যাপার। এই মুহূর্তে তোমাদেরকে বলা যাবে না। তোমাদের কাজ হলো রেক্স হলবিয়রনসন নামে একটা লোককে খুঁজে বের করা। বীমা কোম্পানি তাকে তিন লাখ ডলার দেয়ার জন্যে খুঁজছে।'

হাসল কিশোর। 'বাহ্, চমৎকার, টাকা দেয়ার জন্যেও মানুষ মানুষকে খোঁজে। তা এই বিরাট অঙ্কের টাকা কে দান করল তাকে?'

'সমুদ্রে একটা লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল সে। সেই লোক।'

'হলবি না কি নাম যেন বললেন,' রবিন বলল, 'সে নাবিক?'

'হ্যাঁ। আর নাবিক বলেই হয়তো তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জাহাজে করে কোথাও চলেই গেছে কিনা কে জানে। খুঁজে না পাওয়ার আরও একটা কারণ থাকতে পারে, তার জটিল এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান নাম। আমার অবশ্য মনে হয় নামটাই দায়ী।'

সংক্ষেপে সব জানালেন সাইমন। নিখোঁজ লোকটার শেষ ঠিকানা হলো লণ্ডনের একটা জাহাজ কোম্পানি। শেষ যে জাহাজে করে সে পাড়ি জমিয়েছিল সেটা ফ্রান্সের উপকূলে দুর্ঘটনায় পড়ে ডুবে যায়। ইউরোপের এক গোয়েন্দা সংস্থা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হয় ব্রিটানির সেই বাড়িতে, সেখানে এক পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন থেকেছে হলোবি, সেটা বেশ কিছুদিন আগে। একটা সূত্র ফেলে গেছে সেখানে, একটুকরো কাগজে লেখা একটা মাত্র শব্দ 'আইল্যাণ্ড'।

'ইংরেজিতে লেখা শব্দটা,' সাইমন বলছেন, 'বানান আই এস এল আ ডি। এর মানে আমরা জানি দ্বীপ। প্রথমেই যেটা মনে আসে, মনে হয় কোন দ্বীপে চলে গেছে হলবি। কিন্তু আমি ভাবছি আরেকটা কথা। অন্য কিছু বুঝিয়েছে সে। আইসল্যাণ্ডের লোকেরা আইসল্যাণ্ডকে উচ্চারণ করে আইল্যাণ্ড। হলোবির বয়েস হবে এখন ষাট। নিশ্চয় সাগরে ঘোরা ছেড়ে দিয়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটানোর জন্যে আইসল্যাণ্ডে চলে গেছে। সেটাই জানতে হবে তোমাদের। লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। প্লেনে করে যাবে, নামবে গিয়ে আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রেকিয়াভিকে। ওখান থেকেই খোঁজা শুরু করবে।'

চুপ করে আছে রবিন। ভাবছে, জবাবটা কিশোরই দিক।

কিশোর তাকিয়ে আছে সাইমনের দিকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, 'ঠিক আছে যাব। খরচটা দেবে কে?'

'অবশ্যই ইনশিওরেন্স কোম্পানি। তোমরা তিনজনেই যাচ্ছ তো? মুসা কোথায়?'

'ওর আব্বা আটকে দিয়েছেন। তাঁর গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, হাতের কাছে মেকানিক থাকতে দূরে যাবেন কেন, কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ছেলেকে। মুসা এখন গাড়ি মেরামত করছে। এতক্ষণে শেষ করে ফেলেছে হয়তো,' কিশোর বলল।

রবিন বলল, 'যাবে তো বটেই। আমরা গেলে সে কি আর রকি বীচে থাকে। এমনিতেই সময় কাটে না…'

'কবে যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখি, দু'এক দিনের মধ্যেই। টিকিট জোগাড় করতে হবে। তোমাদের পাসপোর্ট ঠিকঠাক আছে?'

'আছে।'

'গুড। যাওয়ার জন্যে রেডি হওগে। টিকিট পেলেই ফোন করব।'

ফেরার পথে কিশোর বলল, 'রবিন, গাড়িটাকে যাওয়ার সময়ও দেখেছি, এখনও দেখছি। একটা লাল টয়োটা। যাওয়ার সময় দেখেছি মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে কিছু দূরে দাঁড়ানো, এখন আমাদের পিছে পিছে আসছে। নিশ্চয় অনুসরণ করছে।'

'ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করব?'

'না। দেখি, শিওর হয়ে নিই, আমাদেরই পিছু নিল কিনা?'

'এত তাড়াতাড়ি খবর পেল কি করে?'

'সে কথা আমিও ভাবছি। যেমন চালাচ্ছ, চালাও। আমরা যে বুঝে গেছি যেন বুঝতে না পারে।'

ইয়ার্ড পর্যন্ত ওদের পিছু পিছু এল গাড়িটা। ওরা ইয়ার্ডে ঢুকল, ওটা সোজা চলে গেল। পিছুই যে নিয়েছিল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কোথায় থাকে ওরা দেখে গেল। কালো কাঁচের জন্যে ড্রাইভারকে দেখা গেল না।

খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বাড়ি গেল না আর রবিন, কিশোরের সঙ্গেই খেতে বসে গেল। এই সময় ফোন বাজল। মেরিচাচী ধরলেন। কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে এসে জানালেন, 'মুসা। তোরা ফিরলি কিনা জিজ্ঞেস করল। এই নিয়ে চারবার। অস্থির হয়ে গেছে একেবারে।'

'হবেই,' হাসল রবিন, 'আমরা কোথায় গেছি জানার জন্যে নিশ্চয় ফাটছে।'

কয়েক মিনিট পরেই মুসার জেলপির বিকট শব্দ কানে এল। গাড়ি একখান কিনেছে বটে। আশপাশের সব লোককে জানান দিতে দিতে যায় যে মুসা আমান যাচ্ছে। ইয়ার্ডের ভেতরে ঢুকে পিস্তলের গুলি ফোটার মত শব্দ করে কয়েকবার মিসফায়ার করল পুরানো ইঞ্জিন।

রান্নাঘরের দরজায় দেখা দিল মুসা আমানের মুখ। চওড়া হাসি। 'কি মিয়ারা, কোথায় গেছলে?…কেকটা তো ভালই দেখা যায়!'

মেরিচাচী হাসলেন, 'খেয়ে এসেছ, না না খেয়ে?'

'ওর আবার খাওয়া না খাওয়া কি,' কিশোর বলল।

ফোড়ন কাটল রবিন, 'ও তো সব সময়ই ক্ষুধার্ত।'

এসব টিটকারি গায়েই মাখল না মুসা। চেয়ার টেনে বসে পড়ল। কারও অনুমতির তোয়াক্কা করল না, কেকের ট্রে কাছে টেনে নিল। মেরিচাচীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'খাইছে, আন্টি, দারুণ গন্ধ তো। কি মিশিয়েছেন?'

মেরিচাচী রান্না ভাল করেন, রান্নার প্রশংসা শুনলে খুশি হন। বললেন, 'রুবার্ট টার্ট।'

শব্দটা মুসার কাছে গ্রীক, জীবনেও শোনেনি, কিন্তু সবজান্তার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, 'দারুণ, দারুণ, আমার সব চেয়ে প্রিয়। আপনি নিশ্চয় জানতেন আমি আসব…'

মুসার এসব ন্যাকামি আর সহ্য করতে পারল না রবিন, প্রায় রেগে গিয়েই বলল, 'ছেঁদো কথাগুলো বাদ দাও তো মুসা। পছন্দ হয়েছে খেয়ে ফেল, ব্যস। কোনটা তোমার সব চেয়ে প্রিয় তুমি নিজেও জানো না। সাদা ইঁদুর আর শুঁয়াপোকার কাবাব খেয়ে যে উফআহ করে, জিভ চাটে…'

একটুও রাগ করল না মুসা, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'অনেক দেশের অনেক মানুষের প্রিয় খাবার ওগুলো। আমি দোষটা করলাম কি?'

'ওদের কথায় কান দিও না তো তুমি মুসা,' দুধের জগটা মুসার সামনে রাখতে রাখতে বললেন মেরিচাচী, 'পছন্দ হয়েছে, খেয়ে ফেল। ওরা তো খেতে পারে না,

তাই অন্যের খাওয়া দেখলে সহ্য করতে পারে না…'

'এই জন্যেই আপনাকে এত ভালবাসি, আন্টি,' যেন সেই ভালবাসার পরিমাণ বোঝানোর জন্যেই কেকের ইয়াবড় এক টুকরো মুখে পুরে দিল সে।

খাওয়ার জন্যে রাশেদ পাশাকে ডাকতে চলে গেলেন মেরিচাচী।

কেক চিবুতে চিবুতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'মিস্টার সাইমনের ওখানে,' জবাব দিল কিশোর।

উজ্জ্বল হলো মুসার মুখ, 'নিশ্চয় কোন কেস?'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল, 'আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছি আমরা।'

গলায় খাবার আটকে গেল মুসার। কেশে উঠল। তাড়াতাড়ি দুধ দিয়ে ভিজিয়ে সেটা গলার নিচে পাঠিয়ে দেয়ার পর স্বস্তি। 'কোথায় বললে?'

'আইসল্যাণ্ড।'

'ওই বরফের মধ্যে কেন?'

'একটা লোককে খুঁজতে।'

'ভাল। সময়টা কাটবে ভাল।' আরেক টুকরো কেক তুলে নিল মুসা। প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, তার আগেই রবিন বলল, 'ভাল তো বলছ। তোমার পেটে তো আবার কথা থাকে না। এ খবরটা কিন্তু কাউকে জানাতে পারবে না। মিস্টার সাইমন বার বার বলে দিয়েছেন।'

'তওবা, তওবা, আমি আবার কাকে বলতে যাব?' আরেকবার গলায় আটকে যাওয়ার ভয়ে আরও আধ গেলাস দুধ দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিল মুসা। 'সেখানে কি করতে যাচ্ছি আমরা?'

কেন যেতে হবে বলল কিশোর।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'খুব একটা কঠিন কাজ না। বিপদ-টিপদও নেই মনে হয়। বেড়ানোটাই হবে আসল। ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। এসকিমো দেখার শখ, আর…' কথাটা শেষ করল না, হাতের পাশ দিয়ে দা দিয়ে কোপানোর মত করে কোপ মারল টেবিলে। লাফিয়ে উঠল প্লেট, গ্লাস। ঝনঝন করে উঠল পিরিচে রাখা কাপ।

'ওটা আবার কি হলো?' রবিন অবাক।

'না, ইয়ে…' অবচেতন ভাবে কাজটা করে লজ্জা পেয়ে গেছে মুসা, 'মেরু ভালুকের কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, সামনা-সামনি পড়ে গেলে আর কোন উপায় না দেখলে কারাতেই মেরে দেব। বাঁচতে তো হবে…'

হাসতে হাসতে রবিন বলল, 'তোমার মাথায় আসলে ছিট আছে।'

বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। বারান্দায় দেখা হলো মেরিচাচীর সঙ্গে। মুসা বলল, 'দারুণ একটা জিনিস খাওয়ালেন, আন্টি। পরের কেসটার জন্যে শক্তি জোগাড় হয়ে গেল।'

হেসে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন মেরিচাচী, মহাবিপদের গন্ধ পেয়ে গেছেন। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরেকটা কেস?' রবিনের দিকে তাকালেন, 'কি বলে?'

'ও কিছু না,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'খুব সাধারণ একটা কেস। ভেব না।'

'সব সময়ই তো বলিস কিছু না কিছু না, পরে তো জান নিয়ে টানাটানি পড়ে।'

'এবারেরটা সত্যিই কিছু না,' মেরিচাচীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রবিন, 'বেড়াতে যাচ্ছি আমরা। আইসল্যাণ্ডে।' বলেই বুঝল মস্ত বোকামি করে ফেলেছে।

'কোথায়!' আশ্বস্ত তো হলেনই না চাচী, ভীষণ চমকে গেলেন। 'আইসল্যাণ্ড!' এমন ভঙ্গিতে বললেন, যেন ওখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক জীব-জন্তুর বাস। 'ওটা একটা যাওয়ার জায়গা হলো? মেরু ভালুকের হাত থেকে যদিও বা বাঁচিস, ঠাণ্ডায় জমেই মরে যাবি।'

'ভাইকিং জলদস্যুদের কথা বাদ রাখলে কেন? আর দৈত্য দানবের কথা?'

'বেশি পাকামো করিস না!' রেগে উঠলেন চাচী। 'যা ইচ্ছে করগে!' গটমট করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি। টেবিলে পড়ে থাকা অবশিষ্ট খাবারগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলেন।

রবিন বলল, 'দিলে তো রাগিয়ে। এখন যাওয়াই বন্ধ করে দেবেন।'

'কিচ্ছু হবে না,' হাত উল্টে বলল কিশোর, 'রাজি করিয়ে ফেলব। দরকার হয় চাচাকে ধরব।'

ওঅর্কশপে এসে বসল ওরা। ভূগোল বইতে আইসল্যাণ্ড সম্পর্কে পড়েছে কিশোর। এখন এপ্রিল মাস। এ সময়ে সব চেয়ে ভাল থাকে ওখানকার আবহাওয়া, তার পরেও মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে সাগরে, আর খারাপ আবহাওয়ায় তো কথাই নেই, সব সময়ই ঝড়তুফান লেগেই থাকে। দুই সহকারীকে বলল, 'গরম কাপড় নিও সঙ্গে। বলা যায় না কেমন শীত...'

'কিন্তু এখন তো গরম,' মুসা বলল।

'তাতে কি? ঠাণ্ডা পড়বেই। নামই আইসল্যাণ্ড, অর্থাৎ বরফের দেশ।'

'স্কি করা যাবে? স্নো-শু নেব?'

'না। স্নো-শু দিয়ে কি হবে? কুমেরুতে যাচ্ছি নাকি আমরা?'

'আমরা যে যাচ্ছি ইস্কুলের আর কেউ জানে?'

'খবরদার!' হাত তুলল কিশোর, 'একথা কেউ যেন না জানে। মিস্টার সাইমন মানা করে দিয়েছেন। কাক-পক্ষীও টের না পায়।'

'তার মানে তো সাংঘাতিক ব্যাপার! *কিছু না কিছু না* করছিলে কেন?'

'কিছু না বললেও তো যেতে দিতে চায় না চাচী, বললে কি আর দেবে?'

'হুঁ, তা বটে,' কানের নিচে চুলকাল মুসা। 'ঠিক আছে, যাই। মা কিছু কাজ দিয়েছে, সেরে ফেলিগে, নইলে ছুতোনাতা বের করে আবার আটকে দিতে পারে।'

ভটভট আওয়াজ তুলে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল জেলপি। মায়ের লিস্ট করে দেয়া জিনিসগুলো কেনার জন্যে রকি বীচের একটা বড় হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনে গাড়ি রাখল মুসা।

দোকান থেকে বেরিয়ে ঘুরতেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল একটা লোকের সঙ্গে। 'সরি' বলতে গিয়েও থমকে গেল, হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বিশ্বাস করতে পারছে

না।

মুচকি হাসল ছেলেটা, মুসার চেয়ে সামান্য বড় হবে। লিকলিকে শরীর, অনেক লম্বা। হাতে একটা ভিডিও ক্যামেরা। বলল, 'চিনতে পারছ না? আরে আমি।'

জলজ্যান্ত টেরিয়ার ডয়েল ওরফে শুঁটকি টেরি, তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু!

গম্ভীর হয়ে গেল মুসা, 'আবার এসেছ জ্বালাতে? জেল থেকে ছাড়া পেলে কবে?'

'তোমার কি ধারণা ছিল সারা জীবন জেলেই থাকব? একটা কথা ভুল বললে, জ্বালাতে আসিনি। আমি এখন রকি বীচের টিভি চ্যানেলে কাজ নিয়েছি। আব্বা ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

'কাজটা তো ভালই। কিন্তু কদিন টিকবে?' বলেই টেরিয়ারকে এড়ানোর জন্যে গাড়ির দিকে পা বাড়াতে গেল মুসা।

তার সামনে এসে দাঁড়াল টেরিয়ার। 'হার্ডওয়্যার থেকে কি কিনলে? বাগান করছ নাকি?'

'আমার সময় কোথায়? মা করবে।'

'কেন? স্কুল তো ছুটি। তোমার এত কি কাজ?'

'আছে,' আবার গাড়ির দিকে পা বাড়াতে গেল মুসা।

তাকে কিছুতেই এগোতে দিচ্ছে না টেরিয়ার। 'কি কাজ, বললে না? কোন কেসটেস পেয়েছ?'

টেরিয়ারের পাশ কাটিয়ে এসে গাড়ির বুট খুলল মুসা। কিনে আনা জিনিসগুলো রাখল তাতে। পাশে এসে দাঁড়াল টেরিয়ার, নাছোড়বান্দা, ভাল সাংবাদিকই হতে পারবে টিকে থাকতে পারলে। 'তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছি? তাড়াহুড়ো করে তোমাকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা ব্যাপার আছে, পিছু নিলাম···তাহলে ঠিকই ধরেছি, না? কেস পেয়েছে তিন গোয়েন্দা?'

'আমাদের পেছনে লাগার স্বভাবটা আর তোমার গেল না!' রেগে উঠল মুসা। 'টিভিতে কাজ পেয়েছ, সেটা করছ না কেন গিয়ে?'

'সেটাই তো করছি। তাহলে কেস পেয়েছ বলছ?'

'কখন বললাম! আইসল্যাণ্ডে বেড়াতে যাওয়াটা···' জিভ কামড়ে ধরল মুসা। রাগের মাথায় দিয়েছে ফাঁস করে। শুঁটকি এখন কি করবে আল্লাহই জানে! চিন্তিত ভঙ্গিতে এসে গাড়িতে উঠল সে। আর বাধা দিল না টেরিয়ার।

স্টার্ট নিয়ে আর একবারও ওর দিকে না তাকিয়ে পার্কিংলট থেকে বেরিয়ে পড়ল মুসা। তাকালে দেখতে পেত অদ্ভুত হাসি ফুটেছে টেরিয়ারের ঠোঁটে।

সেদিন বিকেলে ওর বন্ধু টম মার্টিনের টেলিফোন পেল মুসা।

টম বলল, 'মুসা? জলদি চলে এসো আমাদের বাড়িতে। মা পার্টি দিচ্ছে। কিশোর আর রবিনকে ফোন করে দিয়েছি। আরও অনেকে আসবে। চলে এসো।'

'আসব, তবে খেতে পারব বলে মনে হয় না।'

হেসে উঠল টম। 'বলো কি, তুমি খেতে পারবে না?'

'নাহ্, মনটন ভাল না।'

'তোমার আবার কি হলো? চলে এসো, এখানে এলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। রাখলাম।'

টেলিভিশনের সামনে বসে আছে মুসা। টেরিয়ারকে কথাটা বলার পর থেকেই দুশ্চিন্তায় আছে। মনে মনে প্রচুর গালাগাল করেছে নিজেকে আর শুঁটকিকে। আর সময় পেল না শয়তানটা আসার! কি করবে কে জানে? টেলিভিশনেও ঘোষণা দিয়ে দিতে পারে। দেয় কিনা দেখার জন্যেই বসে আছে মুসা।

প্রথমে হলো ন্যাশনাল নিউজ। তারপর অন্যান্য খবর, জরুরী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে। রকি বীচের খবর যখন বলতে আরম্ভ করল সংবাদ পাঠক, দুরুদুরু করতে লাগল মুসার বুক। স্ক্রীনের ওপর যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টি। সিটি কাউন্সিলের কথা হচ্ছে।

পার্টিতে যেতে তখন তৈরি হচ্ছে রবিন। ঘরের কোণে টেলিভিশনটা অন করা তাকাচ্ছেও না সেদিকে। বন্ধ করি করি করেও করছে না। বেরোনোর আগে ক দেবে। কাউন্সিল রিপোর্টের পর হঠাৎ কথাটা শুনে বোতাম লাগাতে লাগাতে থেমে গেল আঙুল। সংবাদ পাঠক বলছে, 'এখন রকি বীচের বিখ্যাত তিন গোয়েন্দা একটা মজার খবর শুনুন।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রবিন।

মুসাকে দেখা গেল পর্দায়। হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনে কথা বলছে। কি বলছে শোনা গেল না। তবে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে। কার সঙ্গে কথা বলছে?

দেখে হাঁ হয়ে গেল রবিন। মুসার যে অবস্থা হয়েছিল, তারও হলো। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। তারপর যে কথাটা শুনল, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না।

হাসি হাসি মুখ করে শুঁটকি টেরি বলছে, 'এবারে আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, একটা জটিল রহস্যময় কেস হাতে নিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে খোলাখুলি কিছু বলেনি ওরা। শুধু একটা ইঙ্গিত দিয়েছে, বরফের মাঝে একটা বিশেষ জায়গায় ভাইকিং জলদস্যুদের গুপ্তধন লুকানো আছে, সেটা বের করার চেষ্টা করবে।' এরপর কোন জলদস্যু, তার নাম, জাহাজের নাম, কোন কোন অঞ্চলে অভিযান চালাত সে, তার একটা ছোটখাট বিবরণ দিয়ে শেষ করল *টেরিয়ার ডয়েল, রকি বীচ টিভি চ্যানেল* বলে।

শুঁটকি টেরি যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রকি বীচে এসেছে এ খবরটাই জানত না ওরা। এসেই শুরু করেছে শয়তানী।

খবরটা শুনে কয়েক সেকেণ্ড থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রবিন। তারপর দৌড় দিল নিচতলায়, কিশোরকে টেলিফোন করতে।

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। প্রায় একই সঙ্গে কিশোরকে ফোন করেছে রবিন আর মুসা।

টেরিয়ারের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছে, কি কি বলেছে, টিভি রিপোর্টিং শোনার

পর সব কিশোরকে ফোনে জানিয়েছে মুসা। দু'জনকেই ইয়ার্ডে আসতে বলেছে কিশোর, আলাপ-আলোচনা যা করার ওখানেই করবে।

তিনজনেই বসেছে এখন জরুরী মীটিঙে।

'পুরোপুরি একটা বদমাশি করল,' ফুঁসে উঠল রবিন।

'ও তো এই তালেই থাকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'মুসার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল…'

'ছিলাম তো! এমন শুরু করল…রাগের চোটে…তুমি হলেও রেগে যেতে।'

'হুঁ। কি হয়েছিল বলো তো আরেক বার?'

খুলে বলল মুসা।

বার দুই নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। টেবিলে টাট্টু বাজাল। তারপর মুখ খুলল, 'গুপ্তধন খুঁজতে যাওয়ার কথা যতই শুনুক, যার বোঝার সে ঠিকই বুঝবে কেন যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি শুনেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। মিস্টার সাইমনের সঙ্গে যে আমাদের যোগাযোগ আছে নিশ্চয় জানা আছে তার।' লাল গাড়িটার কথা মুসাকে জানাল সে।

'তার মানে আমাদের আইসল্যাণ্ড যাওয়া বাতিল?' নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে মুসার।

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। বলল, 'মিস্টার সাইমনকে ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন, ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যেতে পারে আমাদের জন্যে। পেছনে চর লেগে গেছে বোঝাই যায়। তবে সাহস করে আমরা যদি যেতে চাই, তিনি আপত্তি করবেন না।'

সামনে ঝুঁকল রবিন, 'কি ঠিক করলে?'

জবাব দিতে আবার এক মুহূর্ত দেরি করল কিশোর, 'আমাদের সব কেসেই বিপদের ঝুঁকি ছিল। শত্রু থাকলে বিপদ হবেই। সেই ভয়ে বসে থাকলে তো আর গোয়েন্দাগিরি চলে না।' এক এক করে দুই সহকারীর মুখের দিকে তাকাল সে। 'আমি ঠিক করেছি, যাব। তারপর যা হয় হবে, পরে দেখা যাবে। শুঁটকির কাছে হারতে রাজি নই।'

উজ্জ্বল হলো রবিনের মুখ।

দাঁতে দাঁত ঘষল মুসা। 'আসি আগে আইসল্যাণ্ড থেকে! এর শোধ যদি না নিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়! ব্যাটাকে আবার ঘাড় ধরে বের করব রকি বীচ থেকে।'

ফোন বাজল। ধরল কিশোর। স্পীকারের কানেকশন অন করে দিল সবার শোনার জন্যে। টম করেছে। বলল, 'এতবড় একটা খবর চেপে রাখলে?'

'মিথ্যা কথা বলেছে শুঁটকি হারামজাদা!'

'আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছ না?'

'যাব, তবে গুপ্তধন খুঁজতে নয়। অন্য কাজ।'

'কোন কেসটেস নাকি?'

'হ্যাঁ। কিছু মনে কোরো না টম, ব্যাপারটা খুব গোপনীয়।'

'কেস তো গোপনীয় হবেই। অসুবিধে থাকলে বলার দরকার নেই। শুনতে চাইও না। তো, দেরি করছ কেন? আসবে না?'

'আসছি। বেরোনোর জন্যেই তো তৈরি হয়েছিলাম, শুঁটকিটা ভজঘট পাকিয়ে দেরি করিয়ে দিল।'

রবিনের ফোক্সওয়াগনে করে টমদের বাড়িতে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা। ঘরে খুব হৈ চৈ চলছে। স্কুলের অনেক বন্ধুকে দাওয়াত করেছে টম। তিন গোয়েন্দাকে দেখেই থমকে গেল সবাই, পরক্ষণেই ফেটে পড়ল। প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল ঃ অ্যাই মিয়ারা, তোমরা নাকি আইসল্যাণ্ড যাচ্ছ?...কেন যাচ্ছ?...কদিন থাকবে?...ভাইকিংদের মোহরের কোন নমুনা আছে পকেটে, দেখাতে পারবে? এরকম আরও হাজারটা প্রশ্ন।

প্রমাদ গুণল তিন গোয়েন্দা। কি জবাব দেবে?

বাঁচাল ওদেরকে টম। ঘোষণা করল চেঁচিয়ে, 'এই শোনো তোমরা, এখন ব্যাণ্ড শুরু হবে।'

দ্রুত জমে গেল পার্টি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তিন গোয়েন্দা।

ঘরের এককোণে ওদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে টম, 'সারা শহরে খবর হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

'তা তো হবেই,' রবিন বলল, 'শয়তানীটা করেছেই তো শুঁটকি আমাদের বিপদে ফেলার জন্যে।'

'যা হওয়ার হয়েছে, কি আর করা। অন্য কথা বলো।'

ব্যাণ্ড বাজল, খেলাধুলা হলো, খাওয়াও শেষ এরপর নাচ। মুসা বা কিশোর কারোরই ভাল লাগে না এটা। রবিনের লাগে। সে রয়ে গেল। ওরা দু'জন বেরিয়ে এল বাইরে, খোলা বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্যে।

প্রচুর তারা আকাশে। ঝিরঝিরে বাতাস আসছে সাগরের দিক থেকে। সুন্দর রাত। একটার বেশি বাজে। নির্জন হয়ে এসেছে পথঘাট। পাশাপাশি হাঁটছে মুসা আর কিশোর।

পার্কিংলটের কাছ থেকেই স্টার্ট নিল গাড়িটা, গুরুত্ব দিল না দু'জনে। তবে ফিরে তাকিয়ে যদি গাড়ির রঙটা দেখত, তাহলে নিশ্চয় দিত। ভাবল, রাত হয়ে গেছে বলে হয়তো চলে যাচ্ছে পার্টির কেউ।

ঘ্যাঁচ করে এসে দু'জনের পাশে থামল লাল টয়োটা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল দু'জন লোক। দু'দিক থেকে কিশোরের দু'হাত চেপে ধরে টান দিয়ে বলল, 'এসো আমাদের সঙ্গে!'

দুই

একটা মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেল কিশোর। পরক্ষণেই যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে জুজিৎসুর এক প্যাঁচে একটা হাত ছাড়িয়ে নিল। আক্রমণ করে বসল অন্য লোকটাকে।

মুসাও চুপ করে রইল না। দ্বিতীয় লোকটার সামনে চলে এল, মুখোমুখি। ডান

হাতটা বার দুই উঠল নামল ওর, যেন ছোবল হানল সাপ। ছোট্ট একটা শব্দ বেরোল কেবল লোকটার মুখ দিয়ে। গোড়া কাটা কলাগাছের মত টলে উঠল। কংক্রীটের রাস্তায় পড়লে মাথা ফাটবে, তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল সে।

চোখের পলকে ঘটে গেল এসব। চমকে গেল প্রথম লোকটা। বুঝে গেল, ছেলেদুটোর সঙ্গে পারবে না। এক ঝটকায় কিশোরের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল। অন্য লোকটাকে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে মুসা যেতে যেতে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

'হেত্তেরি যা, চলেই গেল!' মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল মুসা। পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাল। নড়ছে না দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'মরে গেল না তো? আরও অনেক প্র্যাকটিস দরকার। কতটা জোরে মারতে হবে খেয়াল রাখতে পারি না।'

হাঁপাচ্ছে কিশোর। হাঁটু গেড়ে বসল লোকটার পাশে। ঘাড়ের কাছের নাড়িতে আঙুল রেখে মাথা নাড়ল, 'না, মরেনি।'

লোকটার কাছে বসে রইল মুসা। কিশোর গিয়ে পুলিশকে ফোন করল। কি ঘটেছে কেবল টমকে জানাল। পার্টির সবাইকে জানিয়ে একটা হট্টগোল বাধাতে চায় না।

লাল-নীল আলো জেলে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এসে থামল দুটো পুলিশের গাড়ি। একটা থেকে লাফিয়ে নামলেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, সঙ্গে তাঁর ড্রাইভার। আরেকটা থেকে নামলেন পেট্রলম্যান হিকারসন।

হুঁশ ফিরেছে ততক্ষণে পড়ে থাকা লোকটার। উঠে বসেছে। তাকে পাহারা িচ্ছে কিশোর, মুসা আর টম।

পুলিশের সাড়া পেয়ে পার্টির অন্য ছেলেমেয়েরাও ঘর থেকে বেরোতে শুরু রেছে একজন দু'জন করে, রবিনকেও দেখা গেল তাদের মাঝে।

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'কিডন্যাপিং,' জানাল কিশোর, 'তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে।'

লোকটার শার্টের কলার ধরে টেনে তুললেন হিকারসন। 'কি মিয়া? ব্যবসাটা কদ্দিনের? কে তুমি?'

জবাব দিল না লোকটা, চুপ করে রইল।

তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে টানতে টানতে গাড়ির দিকে নিয়ে চললেন হিকারসন।

যা যা হয়েছিল, বলছে কিশোর আর মুসা, নোটবুকে লিখে নিচ্ছেন চীফ। লেখা শেষ করে বইটা বন্ধ করে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, 'তাহলে আরও দু'জন ছিল। একজন ড্রাইভার, আরেকজন যে তোমাকে ধরেছিল। যাবে কোথায়, ধরে ফেলব।' গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটাকে তুলে ফেলেছেন হিকারসন। আবার ফিরলেন তিনি কিশোরদের দিকে। 'টেলিভিশনে একটা ঘোষণা শুনলাম। আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছ তোমরা। তার সঙ্গে এই কিডন্যাপিঙের সম্পর্ক নেই তো?'

পার্টির অনেকেই বেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। তাদের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল

একবার কিশোর। আর চেপে রাখা যাবে না বুঝে বলেই ফেলল, 'থাকতে পারে। জানি না।'

তার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন চীফ। বুঝলেন সবার সামনে বলতে চাইছে না কিশোর। চাপাচাপি করলেন না আর। মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিছু জানতে পারলে জানাব। সাবধানে থেকো।'

পুলিশের গাড়ি চলে গেলে আবার ঘরে ঢুকল সকলে। অসংখ্য প্রশ্নের জবাব এড়াতে হলে এখুনি পালানো দরকার বুঝে দেরি করল না কিশোর। টমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুসা আর রবিনকে সহ বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে কিশোর, এই সময় মিস্টার সাইমনের ফোন এল। যেতে বললেন তিন গোয়েন্দাকে, কথা আছে।

রাতের কথা সব জানাল কিশোর।

সাইমন বললেন, 'দেরি করেনি তাহলে, শুরু করে দিয়েছে। যাকগে, যা পারে করুক। তোমরা সাবধানে থাকবে। চলে এসো যত তাড়াতাড়ি পারো। আমাকে টেকসাসে যেতে হবে। দেরি কোরো না, হ্যাঁ?'

'না, আসছি।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিস্টার সাইমনের বাড়িতে পৌঁছে গেল তিন গোয়েন্দা। ওদেরকে পড়ার ঘরে নিয়ে এলেন তিনি। ড্রয়ার খুলে ছোট একটা রেডিওর মত জিনিস বের করে বাড়িয়ে দিলেন।

'জিনিসটা কি?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'এক ধরনের ডিকোডার। ডেসিবেল প্রিন্সিপালে কাজ করে।'

'কি প্রিন্সিপাল?' বুঝতে পারল না মুসা।

'শব্দের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে কাজ করে এটা। সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখে ফেলে একটা বিশেষ কার্ডে। ওই চিহ্নের মানে বের করে মেসেজটা তখন সহজেই জেনে যেতে পারবে।' কালো একটা কোডবুক বের করে দিলেন তিনি, 'মানে বুঝতে এটা সাহায্য করবে তোমাদের।' আরও একটা জিনিস বের করলেন তিনি, খুদে একটা টেপ রেকর্ডার। 'যে কোন টেলিফোন কিংবা রেডিওর সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে কথা রেকর্ড করে ফেলতে পারবে এটা দিয়ে।'

জিনিসগুলো নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কিশোরের সঙ্গে কথা বললেন সাইমন। ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে কি করতে হবে। শেষে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'শোনো, এগুলো খুব সাবধানে রাখবে। বলা যায় না কি বের করতে গিয়ে কি বেরিয়ে পড়ে। আমি এখন যে কেসটাতে কাজ করছি হয়তো তার সঙ্গেও কোন যোগাযোগ থাকতে পারে।'

'আইসল্যাণ্ডের সঙ্গে টেকসাসের?' অবাক হলো রবিন।

'হ্যাঁ। আজকের প্লেনেই রেকিয়াভিক চলে যাও তোমরা। ল্যারিকে দিয়ে টিকেট পাঠিয়ে দেব।'

মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রবিনের গাড়িতে করে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলল তিনজনে। তৈরি হয়ে বিকেলের মধ্যে মুসা আর রবিনকে ইয়ার্ডে চলে আসতে

বলল কিশোর। তাকে নামিয়ে দিয়ে মুসাকে নামিয়ে দিতে চলে গেল রবিন।

বাড়িতে ফিরেই আগে থানায় ফোন করল কিশোর। রাতে ধরে নিয়ে যাওয়া লোকটার পরিচয় পাওয়া গেছে কিনা জিজ্ঞেস করল ইয়ান ফ্লেচারকে। চীফ জানালেন, হলিউড থেকে এসেছে লোকগুলো। ভাড়াটে গুণ্ডা। কে ওদেরকে ভাড়া করেছে কিছুতেই বলছে না, বলতে ভয় পাচ্ছে। ক্যাপ্টেন মন্তব্য করলেন, 'নিশ্চয় খুব ভয়ঙ্কর লোক। চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। হলিউডের পুলিশকে অ্যালার্ট করে দেয়া হয়েছে। যে দু'জন পালিয়েছে, আশা করি খুব তাড়াতাড়িই ধরে ফেলবে।'

বিকেল বেলা টিকিট এবং গাড়ি নিয়ে এল মিস্টার সাইমনের অ্যাসিস্টেন্ট ল্যারি কংকলিন। তিন গোয়েন্দাকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবে। রবিন আর মুসা তৈরি হয়ে চলে এসেছে।

চাচা-চাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। বারবার ওদেরকে সাবধান থাকতে বলে দিলেন মেরিচাচী। পৌঁছেই যাতে একটা খবর দেয় একথাও বলে দিলেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ার পোর্টে পৌঁছে জানা গেল, আইসল্যাণ্ডের বিমানে উঠতে হলে ৭ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকতে হবে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে এল ল্যারি।

গেট দিয়ে ঢুকে কিছুদূর এগোতেই সুন্দর একটা জেট বিমান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তিন গোয়েন্দা। যাত্রীরা উঠছে। ওরাও উঠল, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে সীটের সারির মাঝখানের পথ ধরে এগোল পেছন দিকে। পাশাপাশি সীট ওদের। রবিন বসল জানালার কাছে, কিশোর মাঝখানে, মুসা তার পাশে। একজন স্টুয়ার্ডেসকে যেতে দেখেই ধরল সে, 'শুনুন, এ ফ্লাইটে ডিনার দেয়া হবে তো?'

এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল সুন্দরী স্টুয়ার্ডেস, চেহারা আর কালো চুল দেখেই অনুমান করা গেল আইসল্যাণ্ডের মেয়ে। মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ। প্লেন ছাড়ার একঘণ্টা পরেই দেয়া হবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'বাঁচালেন। থ্যাঙ্কিউ।'

যাত্রী ওঠা শেষ। বন্ধ হয়ে গেল বিমানের দরজা। চলতে শুরু করল বিমান। ট্যাক্সিইং করে এগোচ্ছে। গতি বাড়তে লাগল। শব্দ বাড়ছে ইঞ্জিনের। আকাশে উঠে পড়ল বিমান। এক চক্কর দিয়েই চলে এল সাগরের ওপরে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সীট বেল্ট খোলার নির্দেশ পেল যাত্রীরা। বেল্ট খুলে আরাম করে সীটে হেলান দিল তিন গোয়েন্দা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রবিন। অন্ধকার নামছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে সাগরের রঙ, তন্ময় হয়ে তাই দেখতে লাগল সে। কিশোর একটা ম্যাগাজিন খুলে বসেছে।

খাবার নিয়ে হাজির হয়ে গেল স্টুয়ার্ডেস। ট্রলিতে করে নিয়ে সীটে সীটে দিতে দিতে আসছে। মুসার সীটের পাশে এসে থামল। ভেতরের দিকে রয়েছে রবিন আর কিশোর, ওদেরকেই আগে দিল। ট্রলিতে আর নেই।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'শেষ?'

হেসে ফেলল স্টুয়ার্ডেস, 'না না, শেষ হবে কেন? কতজন প্যাসেঞ্জার উঠবে

খাবারই তো আছে আমাদের। একটু বসো, প্লীজ, নিয়ে আসছি।'

খাবার নিয়ে ফিরে এল স্টুয়ার্ডেস। মুসাকে দিল। ট্রে-টা হাতে নিয়ে সে আলাপ জমানোর ভঙ্গিতে বলল, 'আইসল্যাণ্ডে যাচ্ছি আমরা এসকিমো দেখতে।'

'তাই নাকি?' হাসল মেয়েটা, 'ভাল। কিন্তু আইসল্যাণ্ডে তো এসকিমো নেই।'

'তাই নাকি?' বোকা হয়ে গেল মুসা, মাংসের বড়া মুখে দিতে যাচ্ছিল, মাঝপথেই থেমে গেল কাঁটাচামচ।

একটা একটা করে আঙুল তুলে বলল স্টুয়ার্ডেস, 'আইসল্যাণ্ডে এসকিমো নেই, ব্যাঙও নেই, সাপ নেই।'

'তো আছেটা কি, মিস···?'

'শুধু গেইনি বললেই চলবে। আসল নামটা উচ্চারণ করতে পারবে না, মনেও থাকবে না, অনেক লম্বা।··· অনেক কিছুই আছে। হিমবাহ, গুপ্তমানব, নাইট ট্রোল···'

'এই ট্রোলটা আবার কি জিনিস?'

'এক ধরনের বামন ভূত।'

'ভুউত!' ঢোক গিলল মুসা। 'মানে অপঘাতে মরে গিয়ে যিনারা···?'

'হ্যা, সেসব তো আছেই, আরও অনেক ধরনের ভূত আছে আইসল্যাণ্ডে···'

একজন যাত্রী ডাকল, চলে যেতে হলো গেইনিকে।

'শুনলে, কি বলল?' দুই বন্ধুর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা।

'শুনলাম,' মুচকি হাসল কিশোর। 'এই নানা রকম ভূতের ব্যাপারটা বেশ ইনটারেস্টিং, গিয়ে ভালমত জানতে হবে।'

'এমন জানলে আমি কক্ষনও আসতাম না!'

'এসে যখন পড়েছ,' রবিন বলল, 'প্লেন থেকে নেমে তো আর যেতে পারছ না। হাত গুটিয়ে বসে থেকে খাবারগুলোকে কষ্ট না দিয়ে খেয়ে ফেল।'

খাওয়া হয়ে গেলে ট্রে নেয়ার জন্যে আবার এল গেইনি। তার সঙ্গে আরও কথা বলার ইচ্ছে ছিল মুসার, কিন্তু সময় দিতে পারল না স্টুয়ার্ডেস।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। আইসল্যাণ্ডের ভূত নিয়ে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইল মুসা, কিন্তু কেউ গুরুত্ব দিল না। অগত্যা রাগ করেই সে চোখ মুদল।

মিস্টার সাইমনের দেয়া যন্ত্রপাতিগুলো ভাল করে দেখা হয়নি, সময়ই পায়নি কিশোর, এখন পেল। সীটের নিচে রাখা ফ্লাইট ব্যাগটা টেনে বের করে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। রেডিওটা আছে। কোডবুকটাও আছে জায়গামতই। ওগুলোর এমন কোন বিশেষত্ব নেই। তার আগ্রহ ডেসিবেল কাউন্টারটা নিয়ে।

হঠাৎ বদলে গেল চেহারার ভাব। নিচু গলায় বলল, 'রবিন, ব্যাপারটা কি?'

সীটে আরাম করে মাথা দিয়ে একটা গোয়েন্দা গল্প পড়ছিল রবিন, মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, 'কি হয়েছে?'

'ডেসিবেল কাউন্টারটা··'

'কি হয়েছে এটার? তোমার হাতেই তো···'

'এটা ওই যন্ত্র নয়, সাধারণ একটা রেডিও!'

'রেডিও!' সতর্ক হয়ে উঠল রবিনের দৃষ্টি।

চোখ মেলল মুসা। কিশোরের হাতের রেডিওটার দিকে তাকাল। 'খাইছে! ওটা তোমার ব্যাগে গেল কি করে? জিনিসটা তো আমার!'

তিন

বোকা হয়ে রেডিওটার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। ডেসিবেল কাউন্টার ছাড়া কোডবুকটার কোন মূল্য নেই। যদি জরুরী গোপন কোন মেসেজ পাঠাতে চান মিস্টার সাইমন, ওরা সেটা রিসিভ করতে পারবে না।

মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'এ তো দেখি আইসল্যাণ্ডের ভূতেই ধরল। শুরুতেই সব গণ্ডগোল। প্রথমে কিডন্যাপিঙের চেষ্টা, তারপর ডেসিবেল কাউন্টারের বদলে রেডিও...'

'সব দোষ আমার,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা। 'শুঁটকিটাকে বলে দিয়েই সর্বনাশটা করেছি। লোক লেগে গেল পেছনে...'

'না, তোমার আর কি দোষ?' রবিন তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলল, 'আমরাও ওরকমই কিছু একটা করে বসতাম। শুঁটকিটা যা পাজীর পাজী, নাছোড়বান্দা...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'তোমরা বলতে চাইছ কেউ এটা ঢুকিয়ে দিয়ে আসলটা নিয়ে গেছে? কি করে? এটা তো ছিল মুসার কাছে...'

'মনে পড়েছে!' তুড়ি বাজাল মুসা, 'এটা তোমার টেবিলে রেখেছিলাম, আসার সময় আর নিতে মনে ছিল না...'

'এবং আমি গাধা,' মুসার কথাটা শেষ করে দিল কিশোর, 'ভালমত না দেখেই ব্যাগে ভরে ফেলেছি।'

কিশোরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এবার বলল রবিন, 'এ ভুলটাও যে কারও হতে পারত, দুটো যন্ত্র দেখতে এক।'

'না, পারত না। আর হলে সেটা কিছুতেই মাপ করা যায় না। অনেকটা এক বলতে পারো, পুরোপুরি নয়। আমার সেটা অবশ্যই খেয়াল করা উচিত ছিল, যত তাড়াহুড়োই থাক। গোয়েন্দাগিরিতে এসব ভুল মাপ করা যায় না।'

'যা হওয়ার তো হয়েই গেছে, এখন কি করা যায়, বলো?'

'মিস্টার সাইমনের কাছে একটা মেসেজ পাঠাতে হবে, আর কি। আমাদের বাড়ি থেকে যেন কাউন্টারটা নিয়ে পাঠিয়ে দেন।' হাত তুলে স্টুয়ার্ডেসকে ডাকল কিশোর।

উঠে এল গেইনি। সীটের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'গেইনি,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর, 'একটা বিপদে পড়ে গেছি। একটা মেসেজ পাঠাতে হবে রকি বীচে।'

'জরুরী?'

'হ্যাঁ, খুব জরুরী।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

সীটের সারির মাঝে লম্বা গলিপথ ধরে গেইনির পিছু পিছু এগিয়ে চলল কিশোর। [illegible] কেবিনের দরজায় এসে আস্তে টোকা দিয়ে ঠেলে দরজাটা খুলল স্টুয়ার্ডেস। অসংখ্য ডায়াল আর যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে আছেন গম্ভীর চেহারার একজন মানুষ, এ মুহূর্তে এগুলোই যেন সব তাঁর কাছে, দুনিয়ায় আর কিছু নেই।

গেইনির দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন।

আইসল্যাণ্ডের ভাষায় কথা বলল গেইনি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন তিনি, 'খুব জরুরী, না? ঠিক আছে, বলো, কি মেসেজ তোমার।'

প্যাড আর পেন্সিল বাড়িয়ে দিল কো-পাইলট। দ্রুত লিখে ফেলল কিশোর। মিস্টার সাইমনকে অনুরোধ করল, তাদের বাড়ি থেকে ডেসিবেল কাউন্টারটা নিয়ে গেন আগামী দিন কেফ্লাভিক এয়ারপোর্টে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন। কোথায় রেখেছে যন্ত্রটা সেটাও লিখল। ল্যারিকে দিয়ে পাঠাতে পারলে ভাল, তা না হলে টম মার্টিন—এছাড়া বিশ্বাস করা যায় এরকম আর কারও কথা এ মুহূর্তে মনে করতে পারল না সে।

ক্যাপ্টেন আর গেইনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সীটে ফিরে এল কিশোর। একটু পরেই কেবিনের মেইন লাইট নিভে গেল। ঘুমানোর সুযোগ করে দেয়া হলো যাত্রীদের।

বাইরে অন্ধকার, কিছু দেখার নেই। তবু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রবিন। মুসা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিশোরেরও চোখ বন্ধ, বোঝা যায় সে ঘুমায়নি, ভাবছে। চমৎকার এক অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করছে সামনে।

অনেকক্ষণ পর আবার আলো জ্বলল। গলিপথে ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্টুয়ার্ডেস। নাস্তা দিচ্ছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর, 'এই দেখ দেখ, কি সাংঘাতিক!'

নিচে এক অদ্ভুত সাদা পৃথিবী। সাগর থেকে উঠে এসেছে গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারে ছাওয়া পর্বত।

'খাইছে! এটাও তো একটা ভূতুড়ে কাণ্ড! পর্বত আবার ওরকম হয় কি করে?'

পাখার নিচ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল চূড়াটা। গ্রীনল্যাণ্ড নিয়ে আলোচনা শুরু করল তিনজনে। জ্ঞান বিতরণ আরম্ভ করল রবিন, জায়গাটা ডেনমার্কের সম্পত্তি, এসকিমোরা বাস করে, ভাষার নাম আইসল্যাণ্ডিক, উপকূলে বেশ কয়েকটা এয়ার বেস আছে।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'জানি। ওরকম একটা এয়ার বেসের নাম নারসারসুয়াক।' সামনের সীট-পকেট থেকে একটা ম্যাপ টেনে বের করে কোলের ওপর ছড়াল সে, 'এই যে, দেখ।'

'ভাগ্যিস আমি এসকিমো হইনি,' মুসা বলল, 'নইলে এমন সব কঠিন নাম উচ্চারণ করতে করতেই মরে যেতাম।'

'তা মরতে না,' পাশ থেকে বলে উঠল স্টুয়ার্ডেস, নাস্তা নিয়ে এসেছে ওদের জন্যে, 'বলতে বলতেই অভ্যাস হয়ে যেত।'

খাওয়া শেষ করতে না করতেই লাউড স্পীকারে শোনা গেল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ, 'কেফ্লাভিকে নামতে যাচ্ছি আমরা। সীট-বেল্ট বেঁধে ফেলুন, প্লীজ।'

নিচে নামতে শুরু করল বিমান। নিচের দৃশ্য দেখার জন্যে রবিনের ওপর দিয়ে গলা লম্বা করে এল কিশোর আর মুসা। আগ্নেয়গিরির অভাব নেই। যেখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে জমাট লাভা আর অগ্ন্যুৎপাতের নানা চিহ্ন। হিমবাহগুলোর পাশে শুয়ে আছে গরম পানির ঝর্না, বাষ্প উঠছে ওগুলো থেকে। অসংখ্য প্রাকৃতিক ফোয়ারা থেকে পানি ছিটকে উঠছে অনেক ওপরে।

মাটি স্পর্শ করল মস্ত বিমানের চাকা। বার বার ঢোক গিলতে লাগল কিশোর, কানের ওপর প্রচণ্ড চাপ এড়ানোর জন্যে।

'সামনের দরজা দিয়ে বেরোও,' স্টুয়ার্ডেস বলল। 'আশা করি আইসল্যাণ্ডে বেড়াতে তোমাদের ভাল লাগবে।'

'আসলে, ঠিক বেড়াতে আসিনি আমরা,' নিজেদের দাম বাড়ানোর জন্যে মুসা বলল, 'এসেছি একটা জরুরী কাজে। তবু, ফাঁকে ফাঁকে যতটা বেড়াতে পারি বেড়াব।'

হাতে, কাঁধে ব্যাগের বোঝা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল তিন গোয়েন্দা। তাজা, ক্ষুরধার ঠাণ্ডা হাওয়া যেন নাক চিরে ঢুকে যাচ্ছে ফুসফুসে। তুষারে ঢেকে রয়েছে এয়ারফিল্ড।

'একেবারে নিরস জায়গা,' মন্তব্য করল রবিন। দ্রুত পা চালাল লম্বা, নিচু ছাতওয়ালা বিল্ডিংটার দিকে।

তাদের পাসপোর্টে সিল মেরে দিল এয়ারপোর্টের একজন কর্মচারী। বলল, বাড়িটার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই বাস আর ট্যাক্সি পাবে।

বাসের পাশে দাঁড়ানো ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রেকিয়াভিক ওখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে। বিশ মিনিটের মধ্যেই বাস ছাড়বে।

অফিস বাড়িটার পাশে ব্যাগগুলো রেখে জায়গাটা দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। অস্বাভাবিক দৃশ্য। চওড়া, কালো, নির্জন একটা মরু উপত্যকা ছড়িয়ে গেছে বহুদূর, তারপর হঠাৎ করেই যেন লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে মিশেছে একটা বরফে-ঢাকা টাক-মাথা পর্বতের গোড়ায়।

'পুরো উপত্যকাটাই বোধহয় লাভায় তৈরি,' রবিন বলল। আরও ভালমত দেখার জন্যে এগিয়ে গেল। খোলা ছাতওয়ালা একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে। বনেট তোলা। ওরই বয়েসী একটা ছেলে ঝুঁকে ইঞ্জিনের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছে।

পায়ে পায়ে কিশোর আর মুসাও এগোল।

কাছে গিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'গোলমালটা ধরতে পেরেছ?'

মুখ তুলে হাসল ছেলেটা। ইংরেজিতে বলল, 'মনে হয় কারবুরেটরে কিছু হয়েছে।' ভালই ইংরেজি বলে, তবে কথায় মৃদু আইসল্যাণ্ডিক টান।

'আমি দেখব?'

মুসার দিকে তাকিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করল ছেলেটা, কতটা ভাল মেকানিক। বনেটের কাছ থেকে সরে আসতে আসতে বলল, 'শিওর, দেখ না।'

ওর আমেরিকানদের মত কথাবার্তা আর সৌজন্যবোধ অবাক করল তিন গোয়েন্দাকে।

'আমেরিকায় ছিলে বুঝি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। দু'দিন আগে এসেছি। আমার নাম এমড়িমানজার কার্গহাবসন,' একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে বলল ছেলেটা। হাত মেলাল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। 'এত লম্বা নাম বলার দরকার নেই, এমি ডাকলেই চলবে।' জানাল ওকলাহোমার টুলসায় ফ্লাইং স্কুলে পড়ে সে, বিমানের মেকানিক হওয়ার ইচ্ছে। শেষে বলল, 'বসন্তের ছুটিতে বাড়ি এসেছি।'

ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকতে গেল মুসা, এই সময় গমগম করে উঠল লাউড স্পীকার, 'কিশোর পাশা, কিশোর পাশা, তোমাকে ডাকা হচ্ছে!'

অবাক হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। কে ডাকতে পারে?

আবার কথা বলল লোকটা, 'কিশোর পাশা, কিশোর পাশা, তোমাকে ডাকা হচ্ছে!'

'চলো তো, দেখি,' পা বাড়াতে গেল রবিন।

খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর, 'দাঁড়াও, বলা যায় না, চালাকি করে আমাদের চিনে নিতে চাইছে। হয়তো আরেকবার কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে।'

'ঠিক,' এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'একবার বোকামির খেসারতই তো দিতে দিতে সারা, আর না!'

ওদের এসব কথাবার্তা অস্বাভাবিক লাগল এমির কাছে। 'তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কেউ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাওয়া উচিত, নইলে বুঝতে পারব না কে ডাকে। এক কাজ করো, তুমি যাও।'

চলে গেল মুসা। ফিরে এল খানিক পরেই। 'গোঁফওলা, খাটো, গাট্টাগোট্টা এক লোক, লাল চুল…ওই যে, ওই লোকই।'

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল লোকটা। মেয়েদের মত লম্বা চুল রেখেছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগল। জীপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে একটা ছোট গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। কাছে গিয়ে আরেকবার তাকিয়ে তাতে উঠে পড়ল। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

ট্যাক্সির জন্যে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিশোর। একটাও নেই, এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনে যা ছিল সব চলে গেছে। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'ওর পিছু নিতে পারলে ভাল হত।'

ওদের কাণ্ড দেখে আরও অবাক হয়েছে এমি। 'এই, তোমরা আসলে কি বলো তো? স্পাইটাই নাকি?'

হাসল কিশোর, 'একেবারে ভুল বলোনি। আমরা গোয়েন্দা।'

'যাহ্, চাপা মারছ!'

'একটুও না।'

মুসা বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাই বলবে, না গাড়িটা মেরামত করতে হবে? দেখি, যন্ত্রপাতি দাও কিছু।'

টুল কিট বের করে নিয়ে গেল এমি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আর মুসা মিলে নামিয়ে ফেলল কারবুরেটরটা।

'এই যে তোমার গোলমাল,' কারবুরেটরে তেল ঢোকার ছিদ্র থেকে একটা ময়লার খুদে দলা বের করে ফেলে দিল মুসা।

হেসে বলল এমি, 'এখানে চাকরির দরকার হলে বোলো আমাকে। যে কোন সময় মোটর মেকানিকের চাকরি দিয়ে দিতে পারব।'

আবার কারবুরেটরটা লাগানো হলে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠল এমি। ইগনিশনে একবার মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। মুখ বের করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় উঠছ তোমরা?'

'রেকিয়াভিকের সাগা হোটেলে,' রবিন বলল।

'লিফট চাও?'

'কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।'

ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে জীপে চাপল তিন গোয়েন্দা। পথে এমিকে জানাল, রেক্স হলবিয়রনসন নামে একটা লোককে খুঁজতে এসেছে ওরা।

'খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা,' সামনের পথের দিকে তাকিয়ে অনেকটা আপনমনেই বলল এমি, 'দু' লাখ লোক আছে এই দ্বীপে, জানো?'

'দ্বীপটা কত বড়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পূর্ব থেকে পশ্চিমে তিনশো মাইল লম্বা; আয়ারল্যাণ্ডের চেয়ে বড়। তবে লোক ওখানকার চেয়ে কম।'

'এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা কি? কি কাজ করে?' রবিন জানতে চাইল।

'মাছ ধরা। বেশির ভাগই জেলে,' জবাব দিল এমি। পথের ওপর সতর্ক দৃষ্টি। উপকূল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তা। কোথাও একটা গাছ চোখে পড়ে না। শুধু কালো লাভা।

রাস্তার পাশে এক জায়গায় ছোট একটা পাথরের স্তূপ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ওটা কেন?'

'পুরানো ব্যবস্থা। শীতকালে বেড়াতে আসা মানুষকে সাবধান করার জন্যে তৈরি হয়েছিল।...ওই যে দেখো, একটা গ্রাম। বাঁয়ে। ওটার নাম হাফনারফিয়রডুর।'

'মাশাআল্লাহ, নাম বটে একখান। আরেকটু সহজ করে রাখতে পারে না?' মুসা বলল।

হাসল এমি। 'এসব নামই আমাদের পছন্দ। আমাদের কাছে কঠিন লাগে না।'

রেকিয়াভিকের কাছাকাছি এসে এমি বলল, 'আগে অন্য নাম ছিল শহরটার, তখনও কোন একটা *ভিকই* ছিল, মনে নেই। প্রথম যখন সেটেলাররা এল জাহাজে করে, বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে দেখতে পেল, মাটি থেকে বাষ্প উঠছে। ওরা মনে

করল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আইসল্যাণ্ডের ভাষায় ধোঁয়াকে বলে *রেকিয়া* । আগের নাম আর রইল না, বদলে হয়ে গেল রেকিয়াভিক।'

শহরে ঢুকল গাড়ি। চওড়া পথ ধরে এগিয়ে গেল এমি। দু'ধারে সারি সারি বাড়ি। সবুজ, সাদা, নীল কিংবা হলুদ রঙ করা টিনের চালা।

'বাহ্, বেশ ঝলমলে রঙ। মনে হচ্ছে গাঢ় রঙ খুব পছন্দ এখানকার মানুষের।' নিজের অজান্তেই গাড়ির দেয়ালে হাতের ধার দিয়ে কোপ মারল মুসা।

ব্যাপারটা লক্ষ করল এমি। 'কারাতে শিখছ বুঝি? আজকাল এটা ক্রেজ হয়ে গেছে। আমাদের ইস্কুলেও অনেকেই শেখে। আইসল্যাণ্ডের মানুষ অবশ্য কারাতের চেয়ে রেসলিংই বেশি পছন্দ করে।'

শহরের একেবারে মাঝখানে চলে এল ওরা। ছোট একটা চারকোণা চত্বরে ছোট ছোট লাল, নীল, সাদা নিশান দিয়ে সাজানো হয়েছে। সেখানে উড়ছে আমেরিকান পতাকা।

হেসে ফেলল রবিন, 'বাহ্, মনে হচ্ছে আমরা আসব জানত। স্বাগতম জানাচ্ছে।'

এমিও হাসল, 'কেন সাজিয়েছে না জানলে হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস করতাম। তিনজন আমেরিকান মহাকাশচারীর সৌজন্যে লাগানো হয়েছে ওগুলো। তাঁরা এসেছেন এখানকার লাভার স্তর পরীক্ষা করতে। চন্দ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে নাকি অনেক মিল আছে ওগুলোর।' মোড় ঘুরে সাদা রঙ করা বড় একটা আধুনিক বাড়ির সামনে এনে গাড়ি থামাল সে। বাড়িটার তিনদিক থেকে তিনটে পথ বেরিয়ে গেছে। 'এই যে তোমাদের হোটেল।'

জীপ থেকে নামল তিন গোয়েন্দা, নিজেদের মালপত্র বের করে নিয়ে ধন্যবাদ দিল এমিকে।

ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিল এমি, 'কোন কিছুর দরকার হলে ফোন কোরো।'

হোটেলে দুটো ঘর নিল ওরা। একটাতে মুসা একা, আরেকটাতে কিশোর আর রবিন। কাপড় বদলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিফটে করে উঠে এল নয় তলায়, লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে।

'জনাব কিশোর,' সেদ্ধ ট্রাউট মাছ চিবাতে চিবাতে মুসা বলল, 'এইবার তো কাজে লাগতে হয়। তোমার রেক্স সাহেবকে বের করবে কি করে?'

'সবার আগে টেলিফোন বুকে খুঁজব।'

খাওয়ার পর গিয়ে ডিরেকটরি নিয়ে বসল তিনজনে। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেই থেমে গেল, তাকাল একে অন্যের দিকে। রবিন বলল, 'মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সব নামের শেষেই একটা করে *সন* যোগ করে দিয়েছে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এমি হয়তো বলতে পারবে।' তাকে ফোন করল সে। 'কে, এমি?···আরে ভাই এক মুশকিলে পড়ে গেছি। ডিরেকটরির কিছুই তো বুঝি না। তোমাদের এই নামের ব্যাপারটা কি বলো তো? এইচ আদ্যাক্ষরের নিচে তো কোন হলবিয়রনসনকেই দেখছি না।'

হো হো করে হাসল এমি। 'এখানে ফার্স্ট নেমকে প্রাধান্য দেয়া হয়, নামের তালিকা করা হয় ওভাবেই।' এর কারণ আছে, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল সেটা।

প্রতি পুরুষে লাস্ট নেম বদল হয়ে যায়। যেমন ধর, আমার আব্বার নাম ফার্গহাব মারগারসন। তার ফার্স্ট নেমের সঙ্গে সন যোগ হয়ে আমার লাস্ট নেম হয়ে গেল ফার্গহাবসন। আমার ছেলে হলে তার লাস্ট নেম হবে এমডিমানজারসন। এই নিয়মটা এসেছে প্রাচীন স্ক্যানডিনেভিয়ানদের কাছ থেকে।'

'বুঝলাম। তারমানে আমাদের এখন রেক্স-এর নিচে খুঁজতে হবে?'

'হ্যা।'

আবার ডিরেকটরির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। পাতার পর পাতা উল্টে চলল, কোন রেক্স আর খুঁজে পেল না।

'মনে হচ্ছে হলবিয়রন্সন খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ডিরেকটরিটাই ঘেঁটে ফেলতে হবে,' রবিন বলল।

'তারপরেও পেলে হয়,' মুসা বলল।

'রেক্সটা ডাকনাম নয়তো?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কিশোর।

আবার শুরু হলো ডিরেকটরি ঘাঁটা। আধ ঘণ্টা পর বলে উঠল সে, 'এই যে একটা হলবিয়রন্সন আছে, ইনগ্রিড হলবিয়রন্সন। রেক্সের বোন হতে পারে।'

আবার এমিকে ফোন করতে হলো। দশ মিনিটের মধ্যেই হাজির হয়ে গেল সে। ওদেরকে নিয়ে চলল ইনগ্রিডের ঠিকানায়। মহিলাকে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, তাঁর কোন ভাই নেই, কোন রেক্স হলোবিয়রনসন্কেও চেনেন না।

'আবার সেই ফোন বুক,' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

এমি প্রস্তাব দিল, 'চলো, আমিও তোমাদের সাহায্য করব। যদি কোন ঠিকানা-টিকানা মেলে, তোমাদের হোটেল থেকে আমিই ফোন করে কথা বলব। তাতে সময়ও বাঁচবে, ঘোরাঘুরিও লাগবে না।'

'খুব ভাল হয় তাহলে,' খুশি হলো কিশোর। 'আমরা তো আইসল্যাণ্ডের ভাষা জানি না, প্রয়োজন হলে তুমি বলতে পারবে।'

হোটেলে ফিরে এল ছেলেরা। একসঙ্গে তিনটে ডিরেকটরি নিয়ে বসল। একেক জন একেক সেকশনে খুঁজতে লাগল। দুটো হলোবিয়রন্স্ডট্টিরস আর আরং একটা হলোবিয়রন্সন পাওয়া গেল। প্রথমে লোকটাকে ফোন করা হলো, সে রেক্সের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারল না। দুই মহিলাকে করেও একই ফল হলো।

দেরি হয়ে গেছে অনেক, যেতে চাইল এমি।

কিশোর অনুরোধ করল, 'কাল সকালে আমাদেরকে একবার এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে পারবে? আমেরিকা থেকে একটা জিনিস আসবে আমাদের।'

'নিশ্চয় পারব। চলে আসব সকাল সকালই।'

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে লবিতে চলে এল তিন গোয়েন্দা, ওখানে বসে অপেক্ষা করবে এমির জন্যে। বসতে আর হলো না, ওরা ঢুকেই দেখে সামনের রিভলভিং ডোর ঠেলে ঢুকছে এমি। 'গুড মরনিং' জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিসে আসছে জিনিসটা? এয়ার এক্সপ্রেস?'

কিশোর বলল, 'না। লোক দিয়ে পাঠাবে।'

বিমান বন্দরে এসে দেখল ওরা, প্লেন ল্যাণ্ড করেছে। তাড়াতাড়ি এসে ওয়েইটিং রুমে ঢুকল। তাকিয়ে রইল যাত্রীদের স্রোতের দিকে, পরিচিত মুখ দেখার

আশায়।

হঠাৎ কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, 'এই, এসেছে!'

হাত তুলে এগিয়ে গেল কিশোর, 'তাহলে তোমাকেই পাঠাল।'

চার

টম মার্টিনের চওড়া হাসি। এগিয়ে এসে হাত মেলাল তিন বন্ধুর সঙ্গে। ছোট একটা কালো বাক্স বের করে দিল কিশোরের হাতে।

'শান্তি পেলাম দেখে,' বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'থ্যাংকস, টম।'

'মিস্টার সাইমন আমাকে ফোন করে বললেন,' টম বলল, 'একটা জরুরী কথা শুনে আসতে। গেলাম। বললেন, একটা জিনিস পৌঁছে দিতে হবে তোমাদের কাছে। আমার কোন অসুবিধে হবে কিনা। অন্যের খরচে আইসল্যাণ্ড দেখতে পারব, এটাই তো একটা বিরাট ব্যাপার, আবার অসুবিধে! সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'তুমি নাকি আমার কথা বলেছিলে?'

'হ্যাঁ। তোমাকে কিংবা ল্যারিকে দিয়ে পাঠাতে।'

'ল্যারিকে মিস্টার সাইমনের দরকার।'

'কোন ঘাপলা হয়েছে নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তা তো বলতে পারব না। তবে তোমাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন। বিপদ-টিপদ বেশি দেখলে যেন ফিরে চলে যাও।'

'তারমানে নিশ্চয় কোন কিছু তাঁর কানে গেছে,' রবিন বলল।

'তা বলতে পারব না,' মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটা দেখতে লাগল টম।

পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এমি। একপাশে সরে তাকে দেখিয়ে টমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। হাত মেলাল দু'জনে। কুশল বিনিময় করল।

টমকে নিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা আর এমি। জীপে উঠল। ফিরে চলল রেকিয়াভিকে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল টমকে, 'তোমাকে কেউ ফলো করে আসেনি তো? খেয়াল করেছ?'

'না, কাউকে তো দেখিনি?'

মুসার ঘরে উঠল টম। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিল।

এমি প্রস্তাব দিল, 'চলো, বর্গ হোটেলে লাঞ্চ করি। হোটেলটা শহরের মাঝখানে, চত্বরটার কাছে। অবশ্য যদি সী-ফুড তোমাদের পছন্দ হয়...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা, বলল, 'হবে না মানে, খুব পছন্দ। চলো, চলো।'

'চলো।'

চত্বরে পৌঁছতে সময় লাগল না। গাড়িটা পার্ক করে রেখে রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। পুরানো ফ্যাশনের, আমেরিকান স্টাইলের রেস্টুরেন্টটা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। ওয়েইটাররা সব অল্পবয়েসী, সব কিশোরদের সমান।

আইল্যাণ্ডিকে খাবারের অর্ডার দিল এমি।

হেসে জবাব দিল ওয়েইটার, '*জা, জা।*'

'এই *জা জাটা* কি জিনিস?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিংবা আচ্ছা আচ্ছা,' বলল এমি।

'বাহ্, এই তো আইসল্যাণ্ডিক শিখে ফেলছি। *জা, জা, জা!*' হাত নাড়ল মুসা, যেন চলে যেতে বলছে

'আর না বোঝাতে বলতে হবে *নাই*।'

'*নাই, নাই, নাই,*' এবার এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা, মনে হলো কিছুই নাই কিছুই নাই।

শুকনো, হলদেটে, ছোট ছোট করে কাটা এক প্লেট মাছ নিয়ে এল ওয়েইটার।

'এই রান্নাটার নাম হার্ডফিস্ক,' এমি বলল, 'আইসল্যাণ্ডের সেরা খাবার। মাখন মাখিয়ে খেতে হয়। দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।'

একটা টুকরোতে মাখন মাখিয়ে মুখে পুরে জোরে জোরে চিবাতে লাগল সে।

দেখাদেখি মুসাও একটা টুকরো মুখে দিল। চিবিয়ে বলল, 'কাঠের টুকরো চিবাচ্ছি মনে হচ্ছে! স্বাদটা কোথায়?'

'চিবাতে থাকো। দেখবে।'

'আরি, তাই তো, মনে হচ্ছে মুখের মধ্যে গলে যাচ্ছে!'

অন্যেরাও হার্ডফিস্ক মুখের মধ্যে গলানোর চেষ্টা শুরু করল। ইতিমধ্যে আরও দশ রকমের সী-ফুড নিয়ে হাজির হলো ওয়েইটার। তার মধ্যে রয়েছে হেরিং, চিংড়ি; বাকিগুলো চিনতে পারল না মুসা, তবে চেহারা আর পরিবেশন দেখে ভালই লাগল। মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, গোয়েন্দাগিরির জন্যে আইসল্যাণ্ড জায়গাটা মন্দ নয়।'

জোরে হর্ন বাজল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ছেলেরা।

'মনে হয় মহাকাশচারীরা যাচ্ছে,' এমি বলল।

রাস্তার দিকে তাকাল সবাই। একটা গাড়ি যাচ্ছে, সামনের বাম্পারের দু'পাশে লাগানো দুটো আমেরিকান পতাকা।

'মহাকাশচারীরাই,' কিশোর বলল, 'চিনতে পেরেছি।'

তিনজন মানুষ বসে আছেন পেছনের সীটে। মাথা নুইয়ে রেখেছেন মাঝখানে যিনি বসেছেন। প্রায় চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন টুপিটা।

কিশোর বলল, 'ইনি নিশ্চয় মেজর রালফ পিটারকিন। চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখতে কেমন জানা হয়ে গেছে বোধহয়? বাড়ি ফিরছেন নাকি?'

'কে জানে,' হাত নাড়ল রবিন। 'তারপর হয়তো রওনা দেবেন চাঁদে।'

'দিলে সহজেই চলে যেতে পারবেন,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল এমি। 'সাংঘাতিক মানুষ, শুনেছি।'

সবার চেয়ে বেশি খেল মুসা, এটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

এমি বলল, 'একটা কাজ করতে পারো তোমরা, ফরেন অফিসের হামবার নিকবারসনের সঙ্গে দেখা করো। তোমাদের সমস্যাটার কথা বলো, তিনি হয়তো

তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

শহরের মধ্যেই ছোট একটা পাহাড়ের ওপর ফরেন অফিস। দোতলা বাড়ি। মুসা, টম ও এমিকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে রবিনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর। কার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলা হলে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো দোতলার একটা ঘরে। ছোটখাটো, হাসি হাসি মুখ, ধূসর-চুল একজন মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হলো। কি জন্যে এসেছে বলল তাঁকে কিশোর।

'রেক্স হলবিয়রনসন?' চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা মুহূর্ত মাথা কাত করে রইলেন হামবার, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, 'না, শুনিনি। এক কাজ করো, খবরের কাগজে ঘোষণা দাও, পাঁচটা দৈনিক আছে এখানে।'

রবিন আর কিশোর দু'জনেই অবাক।

না বলে পারল না রবিন, 'পঁচাত্তর হাজার মানুষের দেশে পাঁচটা দৈনিক!'

'হ্যাঁ। আইসল্যাণ্ডাররা পড়তে ভালবাসে। এখানে অশিক্ষিত একজন মানুষও খুঁজে পাবে না। কাগজ শুধু এখানেই নয়, আশপাশের দ্বীপগুলোতেও চলে। পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

'ভাল পরামর্শই দিয়েছেন আপনি, মিস্টার নিকবারসন,' কিশোর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'দরকার হলেই চলে এসো। কোন অসুবিধে হবে না।'

নিচ তলায় নেমে এল দুই গোয়েন্দা। সদর দরজায় দাঁড়াল শহরটাকে দেখার জন্যে। ছোট শহরটা ভালমতই দেখা যায় এখান থেকে। সরু সরু রাস্তার ডানপাশ ঘেঁষে গাড়ি চলে। বেশির ভাগই ইউরোপের তৈরি গাড়ি।

বাম থেকে ডানে নজর ঘোরাল কিশোর। সাগরের ধারে চলে গেছে একটা রাস্তা। আচমকা রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার এপাশে সরে চলে এল সে।

জার্মানির তৈরি একটা টনাস গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ড্রাইভারের বড় গোঁফ আছে, চুল মেয়েদের চুলের মত লম্বা। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে এমির জীপের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'ওই লোকই এয়ারপোর্টে বোকা বানাতে চেয়েছিল আমাদের,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'আমরা কোন হোটেলে উঠেছি নিশ্চয় বের করে ফেলেছে। পিছে পিছে চলে এসেছে এখানে।'

ফরেন অফিসের দরজার দিকে তাকাল লোকটা। ওদেরকে দেখেছে বলে মনে হলো না।

'আমাকে যারা কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল,' কিশোর বলল, 'শিওর, এ ব্যাটা তাদের লোক।'

'হতেও পারে। লোকটা কে জানা দরকার।'

আবার চলতে শুরু করল টনাস। নেমে গিয়ে মোড় নিয়ে উঠল অস্টার স্ট্রেইটি সড়কে, অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে জীপের কাছে চলে এল কিশোর আর রবিন।

এমিকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'লোকটাকে দেখলে?'

'দেখেছি। চলো, দেখি কোথায় যায়?'

যানবাহনের ভিড় বেশি, টনাসটাকে একবার চোখে পড়লেও আবার হারিয়ে গেল।

'মনে হচ্ছে বন্দরের দিকে চলেছে,' এমি বলল। দ্রুত কয়েকটা মোড় নিল সে। কিন্তু টনাসটাকে দেখা গেল না। 'নাহ্, পালালই ব্যাটা।' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

'খবরের কাগজের অফিসে। অস্টার স্ট্রেইটিতে একটা অফিস দেখলাম। চলো। এখানকার সবগুলো দৈনিকে ঘোষণা দেব।'

গাড়ি ঘোরাল এমি। 'যাই বলো, গোয়েন্দাগিরি কিন্তু খুব ভাল লাগছে আমার।'

খবরের কাগজের অফিসে অফিসে ঘুরেই বিকেল পার করে দিল ওরা। খুব ছোট করে বিজ্ঞপ্তি লিখেছে কিশোর ঃ*মিস্টার রেক্স হলবিয়রন্‌সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি; হোটেল সাগায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করে ইনশিওরেন্সের পাওনা টাকা নিয়ে যান।* কিশোর লিখেছে ইংরেজিতে, পত্রিকায় ছাপার জন্যে আইসল্যাণ্ডিকে সেটা অনুবাদ করে দিয়েছে এমি।

'টাকার কথাটা এভাবে সরাসরি বলা কি ঠিক হলো?' টম বলল।

হাত ওল্টাল কিশোর, 'আর কিভাবে বলতে পারতাম? টাকার কথা বলাতে গুরুত্ব দেবে।'

'গেলে আমাদের পকেট থেকে তো আর যাবে না,' রবিন বলল।

হোটেলে ফেরার পথে একটা পাহাড়ের ওপর মস্ত কতগুলো ট্যাংক দেখাল টম, 'এখানে গ্যাস ট্যাংক দিয়ে কি হয়?'

এমি বলল, 'ওগুলো গ্যাস ট্যাংক নয়। গরম পানি।'

'কি দরকার?'

বুঝিয়ে বলল এমি। মাটির নিচে যেখানে গরম পানি, সেখানেই বসানো হয় ওরকম ট্যাংক। মোটরের সাহায্যে তুলে জমা করা হয় ট্যাংকে, ঠাণ্ডা পানির মতই, তারপর সেগুলো সাপ্লাই করা হয় ঘরে ঘরে।

'ভাল ব্যবস্থা।'

'ঠিক। ঠাণ্ডার মধ্যে গোসল করতে মহা আরাম,' মুসা বলল। 'চাবি টিপলেই গরম পানি।'

এমির নিজের কিছু কাজ আছে। কিশোরদেরকে হোটেলে পৌছে দিয়ে আর দেরি করল না। বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারের পর রেডিও অন করে বসল কিশোর। যে কোন সময় এখন মেসেজ পাঠাতে পারেন মিস্টার সাইমন, সে রকমই কথা হয়েছে।

অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। *আজ আর হয়তো মেসেজ আসবেই না* যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে কিশোর, তখন জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। প্রায় বারোটা বাজে। রেডিওর সঙ্গে ডেসিবেল কাউন্টার যুক্ত করে রাখা হয়েছে। সাঙ্কেতিক মেসেজ পাঠাতে লাগলেন মিস্টার সাইমন।

পাঠানো শেষ করে এদিককার খবর জানতে চাইলেন তিনি। লম্বা চুলওয়ালা

লোকটার কথা এখনই কিছু বলবে না ঠিক করল কিশোর। লোকটা কে, কেন ওদের পিছু নিয়েছে, কিছুই না জেনে বলে লাভও নেই।

কয়েক মিনিট কথা বলে লাইন কেটে দিলেন সাইমন।

মেসেজ ডিকোড করতে বসল কিশোর। কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে তাকে সাহায্য করল রবিন। প্রথম লাইনটার মানে বের করেই হাঁ হয়ে গেল ওরা।

রবিন লিখেছে ঃ *মহাকাশচারী মেজর রালফ পিটারকিন আইসল্যাণ্ডে নিখোঁজ হয়েছেন।*

পাঁচ

খবরটা যেন মুগুরের মত আঘাত করল। বাকি মেসেজটা ডিকোড করতে গিয়ে দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। মিস্টার সাইমন বলছেন ঃ

চোখ খোলা রাখবে। কোন সূত্র পাও কিনা দেখো। খবরটা গোপন রাখবে, তোমাদের মুখ থেকে যেন কোনভাবেই ফাঁস না হয়। স্পেস প্রোগ্রাম হুমকির মুখে।

মিস্টার সাইমন আরও বলেছেন, বিশেষ বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন তিনি, তিন গোয়েন্দা যাতে তাঁর হয়ে আইসল্যাণ্ডে এই নিখোঁজের ব্যাপারে তদন্ত চালাতে পারে।

তোতলাতে শুরু করল মুসা, 'কি-কি-কিন্তু…তি-তিনজন মহাকাশচারীকেই তো দেখলাম যেতে…'

'একজন ভুয়াও হতে পারে,' কিশোর বলল, 'মাঝের লোকটার কথা মনে নেই? চোখের ওপর টুপি নামিয়ে রেখেছিল। সে পিটারকিন না-ও হতে পারে। তাঁর বদলে অন্য লোক বসে ছিল হয়তো।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো রবিন। 'সরকার চাইছে না খবরটা লিক-আউট হয়ে যাক। তাহলে মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে, নাসার প্রোগ্রামেই ভজঘট পাকিয়ে যেতে পারে।'

'জটিল রহস্য তো!' টম বলল।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমাদের এখানে পাঠানোর আগে থেকেই এ কেসে কাজ করছিলেন মিস্টার সাইমন। টেকসাসে গেছেন, হয়তো মেজর পিটারকিনের চেনা-পরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে।'

রবিন বলল, 'মেজরকে কিডন্যাপ করা হয়ে থাকলে তার কাছ থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করবে। তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হবে আমাদের।'

'এবং খুব সাবধানে। বোকার মত যে কারও সামনে মুখ খোলা চলবে না।'

'কার সামনে খুলব?' মুসার প্রশ্ন। 'এখানে তো আর পরিচিত কেউ নেই…'

আবার কড়কড় করে উঠল রেডিও। মিস্টার সাইমন মেসেজ দিলেন, রেকিয়াভিকের লাভায় ঢাকা উপত্যকায় নিখোঁজ হয়েছেন মেজর পিটারকিন।

মেসেজ পড়ে কিশোর বলল, 'কালই যাব ওখানে। সূত্র খুঁজতে।'

পরদিন সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিল গোয়েন্দারা।

এমিকে ফোন করল কিশোর, 'এমি, আজও তোমাকে দরকার। আসতে

পারবে?'

'জীপ নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'পারব। কোথায় যাবে?'

'লাভা উপত্যকায় নাকি গিয়েছিলেন মহাকাশচারীরা। শুনে জায়গাটা দেখার লোভ হচ্ছে।'

'বেশ। খোঁজখবর নিয়েই আসব আমি। কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন তাঁরা সব বেরিয়েছে পত্রিকায়।'

এক ঘন্টা পর এল এমি। হর্ন বাজাল। জীপের হর্ন চেনা হয়ে গেছে গোয়েন্দাদের। তাড়াহুড়া করে বেরোল। উঠে বসল গাড়িতে।

একটা মসৃণ মহাসড়ক শহর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে দক্ষিণে। সেটা ধরে কিছুদূর এগিয়ে মোড় নিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নামল এমি। জায়গাটা অস্বাভাবিক নির্জন, যেন লাভায় ঢাকা এক মরু-প্রান্তর। মনে হয় সব কিছু প্রাণহীন। দম আটকে আসতে চায়। জায়গাটা এই পৃথিবীর বলেই মনে হয় না। কিছুদূর এগোনোর পর শেষ হয়ে গেল সমতল, পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল পথ, দু'ধারে উঁচু উঁচু পর্বতমালার চূড়া থেকে শুরু করে নিচের বেশির ভাগটাই বরফে ঢাকা। বাকি অংশে শুধুই কালো লাভা।

ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে গাড়ি। মুসা বলল, এ রকম জায়গায় নেমে হেঁটে বেরিয়েছেন মহাকাশচারীরা!'

'হাঁটার জন্যেই তো তাঁরা এসেছিলেন, গাড়ি চালাতে চালাতে বলল এমি, 'চন্দ্রপৃষ্ঠের মত দেখতে তো। চাঁদে হাঁটতে কেমন লাগে আন্দাজ করতে চেয়েছিলেন হয়তো।'

'খুঁজলে লুকিয়ে থাকা চন্দ্রমানবও পাওয়া যাবে এখানে, হাহ্, হাহ্!' রসিকতা করল টম।

'আমাদের নিজেদেরই কত আছে লুকানো মানব।'

'লুকানো মানব?'

'লুকিয়ে থাকে বলেই এরকম নাম।'

স্টুয়ার্ডেস গেইনির কথা মনে পড়ে গেল মুসার। 'ভূতের কথা বলছ না তো?'

অবাক হলো এমি। 'ভূতের কথা জানো নাকি?'

'বেশি না।'

'ও! আমার নিজেরই একটা ভূত আছে। সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'তোমার সঙ্গে!' ভূতটা কোথায় আছে খুঁজতে শুরু করল মুসা।

'হ্যাঁ। আমার দাদার বাবা।'

'কুসংস্কার,' বিড়বিড় করল রবিন।

'না,' জোর দিয়ে বলল এমি, 'সত্যি।'

'কি জানি!'

'তুমি নিজেই ভূত না তো! ভাল ভূত? আমাদের সাহায্য করতে এসেছ?' মুসা

বলল। যে ভাবে হঠাৎ করে এমির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সেটা আর এখন স্বাভাবিক লাগছে না তার কাছে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল এমির দিকে।

হেসে ফেলল এমি। 'না, তা নই। মরিইনি এখনও, ভূত হব কি করে?'

পাথরের চাঁইয়ের মত করে কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে পড়ে আছে লাভা। সেগুলোকে এড়ানোর জন্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে এগিয়েছে পথ। মসৃণ হলেও এক কথা ছিল, ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়ি চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এমি।

'এ তো মনে হচ্ছে একই জায়গায় ঘুরে মরছি,' কিশোর বলল, 'কোন পরিবর্তন নেই।'

একটা সাংঘাতিক মোড় নেয়ার পর সামনে কিছুদূর মোটামুটি ভালই দেখা গেল।

'এই লুকানো মানুষদের ব্যাপারটা কি বলো তো?' আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল রবিন।

'আইসল্যাণ্ডের মানুষের বিশ্বাস,' এমি বলল, 'ছোট ছোট সবুজ পাহাড়ে বাস করে এই মানুষেরা। ঠিক নেই, তোমার চোখেও পড়ে যেতে পারে। মানুষের গন্ধ পেলেই আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখার স্বভাব তো। ঝলমলে রঙের কাপড় পরতে ভালবাসে, মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে মুখ...'

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ওই যে ওই যে, আমি একজনকে দেখেছি!' গাড়ি থামানোর জন্যে এমির কাঁধ খামচে ধরল সে।

'কই? কোথায়? কি দেখলে?'

'ওই পাথরগুলোর আড়ালে!'

ব্রেক কষল এমি।

গাড়ি থামতে না থামতেই টপাটপ লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ছেলেরা।

'মুসা,' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ভুল দেখোনি তো?'

'না না, সত্যিই দেখেছি। ভুল না।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। মুসা যখন বলছে দেখেছে, তখন সত্যিই কিছু দেখেছে। তবে লুকানো মানুষ হতেই পারে না, ওটা গল্প। হয়তো সেই লম্বা চুলওয়ালা লোকটাই ওদের পিছু নিয়েছে। নজর রাখছিল ওদের ওপর।

'চলো তো দেখি, কোথায় তোমার ভূত?' মুসাকে বলল কিশোর।

অসমান লাভার স্তরের ওপর দিয়ে বিশাল এক লাভার চাঁইয়ের দিকে এগোল মুসা। পিছে পিছে চলল অন্যেরা। চাঁইটাকে দেখতে ভূতুড়েই লাগে, যেন এক দৈত্যাকার মানুষ ঝুঁকে আছে নিচের দিকে।

ওটার কাছে এসে থমকাল মুসা। বন্ধুদের দিকে তাকাল। দিনের বেলা, তাছাড়া অনেকে রয়েছে একসঙ্গে, ভূতের ভয়টা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আগে বাড়ল সে। চাঁইয়ের চার পাশে ঘুরে এল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

'ওদিকে চলে গেছে বোধহয়!' সামনের আরেকটা লাভার স্তূপের দিকে হাত তুলল সে।

সেটার কাছেও গিয়ে খোঁজা হলো। এমনি করে আধডজন স্তূপ খোঁজার পর যখন হাল ছেড়ে দিতে বসেছে এই সময় একটা খাঁজের কাছ থেকে চিৎকার করে

উঠল রবিন। প্রচণ্ড ব্যথায় মুখচোখ বিকৃত করে ফাটল থেকে টেনে বের করছে তার ডান পা। 'উফ্, ভেঙেই ফেলেছি মনে হয়।'

'এখানে সাবধানে চলাফেরা করতে হয়,' এমি বলল। 'যেখানে সেখানে ফাঁদ, বিপদে পড়তে দেরি হয় না।'

গোড়ালি ডলতে ডলতে রাগ করে মুসাকে বলল রবিন, 'তোমার ভূত দেখা হলো তো? চলো এবার। মাঝখান থেকে আমার পা-টা…ওফ, বাবারে…!'

'কিন্তু সত্যি বলছি…'

'বললে গেল কোথায়? হাওয়া হয়ে গেল?'

পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যে হেসে বলল টম, 'ভূতেরা হাওয়াতেই মিলায়।'

কিশোর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার কি ভাবছ?'

'অ্যাঁ…না, কিছু না।'

'কিছু হলেই কি আর বলবে নাকি? সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তো আর মুখ খোল না।'

'তুমি খুব রেগে গেছ। চলো।'

জীপের দিকে এগোল সবাই। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল রবিন।

আবার চলল গাড়ি। আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওপর দিকে উঠতে থাকল। পথের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে ক্রমেই, কারণ মাত্র কয়েক দিন আগে বরফ গলেছে। সরু একটা গিরিপথ পেরিয়েই চোখে পড়ল বিরাট এক হ্রদ। তবে পাহাড়ী হ্রদ যেমন সুন্দর হয়, এটা তেমন নয় মোটেও। আশপাশের পাহাড়ের মতই প্রাণহীন, বিষণ্ন।

'আমার মোটেও ভাল্লাগছে না,' টম বলল। 'একটা গাছও কি থাকতে নেই!'

'এ জন্যেই ওকলাহোমা আমার ভাল লাগে,' এমি বলল। 'গাছপালায় ভরা। প্রকৃতির অলঙ্কারই হলো গাছ। না থাকলে এই যে দেখতে পাচ্ছ অবস্থা। আগে অবশ্য কিছু গাছ ছিল আইসল্যাণ্ডে। সেটেলাররা এসেই কোন মায়া নেই দয়া নেই, কেটে সাফ করেছে। উড়ে এসে যারা জুড়ে বসে তাদের মায়াদয়া থাকেও না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল সবাই।

এক জায়গায় রাস্তা থেকে নেমে চলে গেছে আরেকটা সরু পথ, তার ওপর বরফ জমে আছে। সেটাতে গাড়ি নামিয়ে আনল এমি। বলল, 'ব্যস, এসে গেছি। এটাই সেই জায়গা।'

'আমাদের আগে কেউ এসেছিল এখানে,' বরফের ওপর চাকার দাগ দেখিয়ে বলল কিশোর।

সরু পথটা ধরে এগোল ওরা। গাড়িটা কোথায় থেমেছিল পেয়ে গেল কিছুদূর এগিয়েই। পায়ের দাগ চলে গেছে একটা উঁচু জায়গার ওপর, বরফে ভালমতই পড়েছে ছাপগুলো। যাওয়ার চিহ্ন আছে, ফেরার নেই। জায়গাটার ওপাশ থেকে তীব্র গতিতে বাষ্প উঠছে। হিসহিস করছে যেন হাজারটা সাপ।

'ওই শব্দ আসছে গন্ধকের গর্ত থেকে,' এমি বলল। 'বাষ্পও ওখান থেকেই বেরোচ্ছে!'

পায়ের ব্যথা কমে গেছে রবিনের। সবার আগে গাড়ি থেকে নামল সে। পা-টা আগের মতই সচল আছে কিনা বোঝার জন্যে দৌড় দিল। উঠে যেতে লাগল উঁচু জায়গাটায়।

পেছন থেকে ডেকে তাকে সাবধান করল এমি, 'দেখে চলো! গন্ধকের গর্তে পড়লে কিন্তু শেষ।'

অন্যেরাও নামল জীপ থেকে। নেমেই সূত্র খুঁজতে শুরু করল কিশোর। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে। একজন মহাকাশচারী কি করে গায়েব হলেন? একা তো আসেননি, সঙ্গে লোক ছিল। কোন কারণে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন? ওই সময়ে কিছু ঘটেছে? কিডন্যাপ হয়েছেন? তাহলে কারও চোখে কিছু পড়ল না কেন? কে নিয়ে গেল? কেন নিল?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলেছে সে। কিছুই চোখে পড়ছে না। এত বিরাট অঞ্চলে পড়ার কথাও নয়। উঁচু জায়গাটার ওপরে উঠে নিচে তাকাল সে। ছয় ফুট মত হবে গর্তের মুখটা। নিচে টগবগ করে ফুটছে তরল পদার্থ।

বিরাট একটা পাইপের মুখ থেকে কানফাটা শব্দে তীব্র গতিতে বেরোচ্ছে বাষ্প। বাতাসে গন্ধকের কড়া গন্ধ, গর্ত থেকেও আসছে, বাষ্প থেকেও।

হঠাৎ লক্ষ করল কিশোর—মুসা, টম আর এমিকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু রবিন নেই। ওদের কাছে ছুটে এল সে। কথা বলে লাভ নেই, চিৎকার করলেও শোনা যাবে না, অহেতুক সে চেষ্টা করল না সে। এদিক ওদিকে তাকিয়ে রবিনকে খুঁজতে লাগল। ফুটন্ত গন্ধকের দিকে আরেকবার তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ল জিনিসটা। কালো একটা দস্তানা পড়ে আছে গর্তের একেবারে কিনারে।

ধড়াস করে উঠল তার বুক। মেরুদণ্ডে এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। সবার আগে চোখ পড়ল এমির। দস্তানাটা দেখে সে-ও চমকে গেল। তাড়াতাড়ি মুসা আর টমের নজর ফেরাল সেদিকে।

এদিকে খেয়াল ছিল না কারোই, অন্য জিনিস দেখছিল। দস্তানাটা দেখে ঘাবড়ে গেল সবাই। রবিন যে ওদের মাঝে নেই এতক্ষণে টনক নড়ল। সবার মনেই একটা ভাবনা, কোথায় গেল সে? গর্তে পড়ে গেল?

ছয়

পাগলের মত রবিনকে খুঁজতে শুরু করল ওরা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকল। কিন্তু বাষ্পের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে চাপা পড়ে গেল ওদের ডাক, কিছুই শোনা গেল না।

পাইপের দিকে চোখ পড়তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে রবিন। প্রায় দৌড়ে এল ওদের কাছে।

তুষারের ওপর পড়ে থাকা দস্তানাটা তুলে নিল মুসা।

সবাইকে আসতে ইশারা করে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। দূরে সরে যাবে যেখানে কথা বলা যায়।

'কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলে!' কিশোর বলল। অনেকখানি সরে এসেছে ওরা, বাষ্পের শব্দ এখানেও আসছে, তবে কম, কথা বললে শোনা যায়। 'আমরা তো ভাবলাম গর্তেই পড়ে গেছ।'

'সরি। পাইপটা দেখতে গিয়েছিলাম। গোড়ার বোল্টগুলোয় মরচে পড়ে গেছে। সব খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে গন্ধক। চাপ সইতে না পেরে একদিন পাইপটাই আকাশে উড়ে যাবে।'

'সাংঘাতিক এক জায়গা,' মুসা বলল, 'বাপরে বাপ! কি সব কাণ্ড! তরল সালফারের গর্ত!'

'অনেকের বিশ্বাস অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সাগরের নিচ থেকে উঠে এসেছে আইসল্যাণ্ড, সে জন্যেই এতসব কাণ্ড। অসম্ভব নয়। এই তো, কয়েক বছর আগে সাগরের নিচে ফুটতে শুরু করেছিল আগ্নেয়গিরি, তার ফলে দক্ষিণ উপকূলে ভেসে উঠেছে সার্টসি দ্বীপ,' এমি বলল, 'কিন্তু আমি ভাবছি, দস্তানাটা কার?'

'কিসের দস্তানা?' জানতে চাইল রবিন।

তাকে দেখানো হলো ওটা। কোথায় পাওয়া গেছে তা-ও বলা হলো।

'মেজর পিটারকিনের নয় তো?' রবিন বলল।

'হতে পারে, অসম্ভব কি?' এমি বলল, 'গন্ধকের গর্তে পড়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেউ পড়েনি তা নয়।'

'কিন্তু,' প্রশ্ন তুলল কিশোর, 'আমাদের আগেই এসে জায়গাটায় তদন্ত চালিয়ে গেছে সরকারী লোক, তাদের চোখে পড়ল না কেন দস্তানাটা?'

'তা-ও তো কথা! তাদের চোখে তো পড়া উচিত ছিল!'

'এর একটাই জবাব, এটা পড়েছে ওরা চলে যাওয়ার পর।'

'মেজর পিটারকিনের?'

'বুঝতে পারছি না। আমরা তো আর তাঁর দস্তানা দেখিনি।' এমির দিকে তাকাল কিশোর, 'এমি, শেষ কবে তুষার পড়েছে এখানে বলতে পারবে?'

'গতকাল সকালে।'

চট করে একবার রবিনের চোখে চোখে তাকাল কিশোর। দস্তানাটা মহাকাশচারীর হয়ে থাকলে তিনি গত রাতে এখানে এসেছিলেন, কারণ এটাতে তুষার লেগে নেই। কেন এসেছিলেন?

মুসার হাত থেকে দস্তানাটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল কিশোর। মূল্যবান সূত্র এটা।

পায়ের ছাপগুলো আরেকবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখা হয়নি এখনও।

গর্তের কাছে চলে গেল আবার মুসা, এমি ও টম। রবিন আর কিশোর পায়ের ছাপগুলো ধরে ধরে এগোল। কিছুদূর গিয়েই একটা ব্যাপার বুঝতে পারল, ওগুলো ডাবল প্রিন্ট, একজনের জুতোর ছাপের ওপর দিয়ে আরেকজন হেঁটে গেছে। রাস্তা থেকে ঘুরপথে চলে গেছে দু'শো গজ দূরে। গন্ধকের গর্তের কাছে একজন এগিয়ে যাওয়ার পর আরেকজন তার ফেলে যাওয়া ছাপের ওপর পা দিয়ে দিয়ে অনুসরণ করেছে।

'তাজ্জব কাণ্ড!' রবিন বলল, 'পুলিশকে বলা দরকার।'

'না। দস্তানাটা দিয়েই খোঁজখবর শুরু করব আমরা। জানার চেষ্টা করব, সরকার থেকে ইস্যু করা হয়েছিল কিনা এটা।'

'কি করে জিজ্ঞেস করব, না দেখিয়ে?'

'এটা দেখাব না। কেফ্লাভিকের আমেরিকান বেজে গিয়ে একটা দস্তানা চেয়ে নেব। মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে পরীক্ষা করব সেটা। চামড়াটা এক কিনা বোঝা যাবে।'

এখানে আর দেখার কিছু নেই। জীপে ফিরে এল দু'জনে। অন্যেরা আগেই এসে বসে আছে। ফিরে চলল ওরা।

অসমান পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে আবার গাড়ি। কিশোর চিন্তিত। ভাবছে, পরের বার আনা হলো কেন মহাকাশচারীকে? গন্ধকের গর্তে ফেলে দেয়ার জন্যে? নাকি বোঝানোর জন্যে, গর্তে পড়েই মারা গেছেন তিনি? নাকি নিজে নিজেই কোন কারণে ফিরে এসেছিলেন মেজর, অসাবধানে পা পিছলে গর্তে পড়েছেন?

গোয়েন্দাদেরকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল এমি।

লাঞ্চের পর সহকারীদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসল কিশোর। জুতোর ছাপ অনুসরণ করে গিয়ে কি দেখেছে, সন্দেহ করেছে, মুসা আর টমকে জানিয়ে বলল, 'শোনো, তোমরা দু'জন হোটেলেই থাকো, সন্দেহজনক কাউকে দেখা যায় কিনা দেখো। আমরা আছি জানলে ওই চুলওলা এখানেও আসতে পারে। যদি আসে, আটকে ফেলবে। আমি আর রবিন ট্যাক্সি নিয়ে কেফ্লাভিকে যাব। এমিকে পেলে ভাল হত, বললে আসবেও সে, কিন্তু সব কিছুতেই তাকে জড়ানো ঠিক হবে না।'

কেফ্লাভিকে পৌঁছে বেজে ঢোকার অনুমতি নিল কিশোর। জেনারেল ইস্যুর ইন-চার্জ একজন ক্যাপ্টেন। তাঁর কাছে একটা চামড়ার দস্তানা ধার চাইল। অনুরোধ শুনে অবাক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। দুটো চাইলেও এক কথা ছিল, একটা দিয়ে কি করবে ছেলেটা? প্রশ্ন করতে লাগল।

শেষে আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে পরিচয় দিতে বাধ্য হলো কিশোর, ওরা আমেরিকান, শখের গোয়েন্দা, এখানে এসেছে ইনশিওরেন্সের একটা কাজ নিয়ে।

একটা দস্তানা ওদেরকে দিয়ে দিলেন অফিসার।

'কাজ হয়ে গেলেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব,' কথা দিল কিশোর।

'দিতে হবে না আর। নিয়ে যাও।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

বাইরে বেরিয়ে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা, একটা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরির ঠিকানা দিতে পারেন?'

'কেউ অসুস্থ হয়েছে?' একবার কিশোর, একবার রবিনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল লোকটা।

'না,' জবাব দিল রবিন, 'অন্য দরকার।'

অবাক হয়ে একটা মুহূর্ত ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর নোটবুক বের করে পাতা ওল্টে ঠিকানা বলল, 'লিখে নাও।'

লিখে নিল রবিন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। গিয়ে আর খোলা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, তবু একবার টুঁ মেরে আসার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। রবিন পরামর্শ দিল, 'আগে ফোন করে দেখো। খোলা থাকলে যাব, না থাকলে কাল।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ।'

ওষুধের দোকান থেকেই ফোন করল কিশোর। খোলাই আছে ল্যাবরেটরি। সে বলল, 'আমাদের একটা মাইক্রোস্কোপ দরকার। কয়েক ঘণ্টার জন্যে পাওয়া যাবে?'

যে লোকটা ফোন ধরেছে সে জানাল, কোন যন্ত্র বের করে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। তবে ওখানে গেলে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করতে দেয়া হবে। পরিষ্কার ইংরেজিতেই কথা বলছে লোকটা, 'চলে আসতে পারো। ছ'টায় বন্ধ করি আমরা।'

'এখুনি আসছি,' বলে লাইন কেটে দিল কিশোর। কলের পয়সা মিটিয়ে, ওষুধের দোকানের লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল রবিনকে নিয়ে।

ট্যাক্সি নিয়ে ল্যাবরেটরিতে চলল ওরা। ফরেন অফিস থেকে বেশি দূরে নয়। ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই একজন টেকনিশিয়ানের সঙ্গে দেখা। কাটা কাটা কথা বলে লোকটা। ওদেরকে নিয়ে গেল একটা ছোট ঘরে। অণুবীক্ষণ দিয়ে কি করবে জিজ্ঞেস করল।

রবিন বলল, 'চামড়ার দস্তানা পরীক্ষা করব।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল টেকনিশিয়ান। তবে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বলল, 'ঠিক আছে, করো।'

কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগল না। প্রথমে দস্তানার বাইরের দিকটা পরীক্ষা করল কিশোর। তারপর ভেতরের দিক। চামড়া, উলের লাইনিং একই রকম, এমনকি সেলাইও করা হয়েছে এক জাতের মেশিন দিয়ে।

'হুঁ, বুঝলাম,' অণুবীক্ষণ থেকে চোখ সরিয়ে বলল কিশোর, 'দস্তানাটা হারিয়েছে সেনাবাহিনীর কোন লোক।'

'পুলিশকে জানাবে এখন?'

'না। মিস্টার সাইমন সব কথা গোপন রাখতে বলেছেন।'

টেকনিশিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। হোটেলে ফিরে দেখল ওদের জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে টম আর মুসা।

একটা চিঠি কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে টম বলল, 'ঘোষণার জবাব।'

শুনে কিশোরও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। খামটা হাতে নিয়ে দেখল, পাঠিয়েছে রেকিয়াভিকের একটা বড় পত্রিকা থেকে। একটানে ছিঁড়ে ফেলল মুখ। ভেতরে ছোট একটা চিঠি, এসেছে উত্তর উপকূলের শহর আকুরীরি থেকে।

লেখক সই করেছেন *রেক্স হলবিয়রনসন* নামে। অনুরোধ করেছেন ঘোষণাকারী যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে।

'সহজ হয়ে গেল,' মন্তব্য করল মুসা।

'বড় বেশি সহজ,' একমত হলো রবিন।

'সাবধানে এগোতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল।

মাথা চুলকাল টম, 'সব সময়েই কেবল সন্দেহ?'

'না করলে এতদিন আর গোয়েন্দাগিরি করা লাগত না। কবেই মরে যেতাম।'

'একটা কথা অবশ্য ঠিকই বলেছ, বড় বেশি সহজ। লোকটা এল না কেন? পত্রিকায় এরকম টাকা পাওয়ার কথা শুনলে চিঠি লিখে বসে থাকতাম না, নিজেই ছুটে যেতাম।'

ঠিক হলো, এবারও হোটেলে থেকে রেডিও আর ডিকোডিং ইক্যুইপমেন্টগুলো পাহারা দেবে মুসা আর টম, সন্দেহভাজন লোকটা আসে কিনা নজর রাখবে। কিশোর আর রবিন আগামী দিন প্লেনে করে চলে যাবে আকুরীরিতে।

পরদিন সকালে নাস্তার পর কিশোর ঘোষণা করল, 'ফ্লাগফেলাগ দ্বীপপুঞ্জে যাচ্ছি আমি।'

'কী দ্বীপ!' নাকমুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

টেবিল থেকে একটা ট্র্যাভেল ফোল্ডার তুলে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

'ফ্লাগফেলাগ আইল্যাণ্ডস,' পড়ল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'কোথায় ওটা?'

'বোকা বানিয়েছে তোমাকে,' মুসার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল টম, 'কোন দ্বীপপুঞ্জ নয়। ফ্লাগফেলাগ আইল্যাণ্ডস মানে হলো আইসল্যাণ্ড এয়ারলাইনস।'

'তাই নাকি,' হাসতে হাসতে বলল রবিন, 'আমিও তো জানতাম না। নাহ্, আইসল্যাণ্ডিক ভালই শিখে ফেলছ তুমি।'

হোটেলের লবিতেই একটা ফ্লাগফেলাগের অফিস আছে। আগের দিন ডেস্কের ওপাশে কালোচুল এক মহিলোকে বসে থাকতে দেখেছিল কিশোর, আজ তাকে দেখা গেল না। অফিসই খালি। কয়েক সেকেণ্ড পরেই একজন লোক এসে বসল চেয়ারে।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'আকুরীরিতে যেতে চাই। আজকের প্লেনে।'

'সরি,' লোকটা বলল, 'আজ শিডিউল নেই। কাল যাবে। বেশি জরুরী হলে প্রাইভেট প্লেন নিয়ে চলে যাও। ভাড়া বেশি লাগবে না।'

'আপনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'সরি,' আবার বলল লোকটা। 'আমাদের ওরকম ছোট প্লেন নেই। অসুবিধে হবে না। ভাড়ায় অনেক প্লেন পাবে। ফ্লাগফেলাগ টার্মিনালে চলে যাও, পেয়ে যাবে। হোটেল থেকে বেশি দূরে না। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে লিফটে করে ওপরে উঠে এল কিশোর আর রবিন। ঘরে ঢুকে দেখল, বিছানায় লম্বা হয়ে আছে মুসা।

কি ভাবে যেতে হবে ওদেরকে জানাল কিশোর।

জানালার কাছে বসে পা দোলাচ্ছে টম। বলল, 'আকুরীরি দেখার খুব শখ হচ্ছে আমার। প্লেন ভাড়া নিলে তো আর সীটের ঝামেল নেই, আমরাও যেতে পারি। এক কাজ করলেই হয়, জিনিস পাহারা দিতে আর ক'জন লাগে, মুসা একাই থাকুক।'

'কেন, আমি কি দোষ করলাম?' বিছানা থেকে একলাফে উঠে পড়ল মুসা। 'আর ওরা যদি আমাদের খতম করতে লোক পাঠায়, তাহলে? একলা বড়জোর

তিনজনকে ঠেকাতে পারব আমি। ওরা আরও অনেক বেশি পাঠাতে পারে। আমাকে ধরে কচুকাটা করবে।' হাত দিয়ে বাতাসে কয়েকবার কারাতের কোপ মারল সে।

অসহায় ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টম। আর কিছু বলল না।

ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল কিশোর। 'দেখো, আমরা তো আর বেড়াতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি একটা কাজে। কাজটা শেষ হোক, সবাই মিলে একদিন গিয়ে বেড়িয়ে আসব ওখান থেকে। অত মন খারাপের কি আছে?'

হাসি ফুটল টমের মুখে, 'না না, আমি তো আর আপত্তি করছি না, যাও না। আমরা থাকছি।'

'মুসা ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ,' কিশোর বলল, 'যদি বেশি লোক আসে? রিস্ক নেয়ার মানে হয় না। জিনিস নিরাপদ জায়গাতেই রেখে যাওয়া ভাল।'

কোডবুকটা নিয়ে ক্লার্কের আয়রন সেফে রাখতে চলল সে।

সাড়ে এগারোটায় ঘর থেকে বেরোল কিশোর আর রবিন। ফ্লাগফেলাগের অফিসের পাশ দিয়ে হোটেলের সদর দরজার দিকে এগোচ্ছে, এই সময় অফিস থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। থমকে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখল একবার, তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটা দিল গেটের দিকে। লোকটার আচরণ কেমন অদ্ভুত লাগল গোয়েন্দাদের কাছে।

ট্যাক্সি নিয়ে দশ মিনিটেইএয়ারফীল্ডে পৌঁছে গেল ওরা। টার্মিনাল বিল্ডিঙে ঢুকতে যাবে, যেচে এসে পরিচয় করল একজন লোক। এজেন্ট। কারও প্লেন ভাড়ার দরকার হলে ব্যবস্থা করে দেয়।

'আকুরীরি যাওয়ার প্লেন পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নিশ্চয়। দিচ্ছি ঠিক করে,' লোকটা বলল।

আরও তিন-চারজন লোক এসে ঘিরে ধরল ওদেরকে। জানা গেল, ওরা সবাই এজেন্ট।

প্রথম লোকটার সঙ্গেই কথা বলে প্লেন ভাড়া করল কিশোর।

ওদেরকে বসার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আসেই না। এত দেরি করছে কেন ভাবতে আরম্ভ করেছে কিশোর।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল লোকটা, বলল, 'এসো।'

গোয়েন্দাদেরকে ফীল্ডে বের করে নিয়ে এল লোকটা। ইঞ্জিন গরম করছে একটা ছোট টুইন-ইঞ্জিন বিমান।

এজেন্ট জানাল, 'ইংরেজি ভাল বলতে পারে না পাইলট।' টান দিয়ে বিমানের দরজা খুলল। 'তবে অসুবিধে হবে না। সব নির্দেশ দেয়া আছে। আকুরীরি যেতে এক ঘণ্টাও লাগবে না।'

উঠে পড়ল কিশোর আর রবিন। সীট বেল্ট বাঁধল। তাকিয়ে রয়েছে পাইলটের কেবিনের দিকে। দরজা বন্ধ। বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল এজেন্ট। চলতে শুরু করল বিমান। ঠিক এই সময় রবিন দেখল একজন লোক এসে দাঁড়াল এজেন্টের পাশে। সেই লোকটা, যাকে হোটেলে বিমানের অফিসে দেখেছিল।

কিশোরকে দেখাল।

'সন্দেহ করা যায়, আবার যায়ও না,' কিশোর বলল। 'এই লোকটাও নিশ্চয় এজেন্ট। দেখলে না, কত এজেন্ট আছে এখানে। আর ফ্লাগফেলাগের অফিসের সঙ্গে এজেন্টদের খাতির থাকবে, এটাও অস্বাভাবিক কিছু না। কাস্টোমার আছে কিনা খোঁজটোঁজ নিতে যেতেই পারে।'

'আমাদের দেখে তাহলে ওরকম করে তাকাল কেন?'

'ফ্লাগফেলাগ অফিসের লোকটা নিশ্চয় আমাদের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছে আমরা প্লেন ভাড়া করতে যাব। তাড়াতাড়ি গিয়ে একজন এজেন্টকে বলে রেখেছে আমরা যে যাচ্ছি।'

'তাহলে সে নিজে আমাদের সঙ্গে কথা বলল না কেন?'

'হয়তো এজেন্টের এজেন্ট।'

'অনেকগুলো হয়তো এসে যাচ্ছে না?'

'যাচ্ছে!'

'তুমি যা-ই বলো কিশোর, আমার ভাল লাগছে না। ওই লোকটাকে দিয়ে প্লেন ঠিক করানোই আমাদের উচিত হয়নি।'

'হয়তো!'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল।

আকাশে উঠে পড়ল বিমান। নিচে তাকাল ছেলেরা। রেকিয়াভিকের উজ্জ্বল রঙ করা ঘরের চালাগুলো চমৎকার লাগছে ওপর থেকে।

কিছুক্ষণ দেখার পর পকেট থেকে আইসল্যাণ্ডের ম্যাপ টেনে বের করতে করতে কিশোর বলল, 'আকুরীরি ঠিক কোনখানে দেখা যাক।'

হাঁটুর ওপর ম্যাপ বিছাল সে। রবিনও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে।

দেখেটেখে আবার ম্যাপটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। নিচে তখন বিচিত্র তরাই অঞ্চল চলছে। জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে।

সূর্যের দিকে নজর পড়তেই বলে উঠল, 'রবিন, উত্তরে যাওয়ার কথা না আমাদের?'

'তাই তো। আকুরীরি তো সেদিকেই।'

'তাহলে পুবে যাচ্ছে কেন? সূর্যটা কোন দিকে, দেখো।'

ম্যাপ ভুল হতেই পারে না, ওদেরকেই ভুল দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ উপকূলের রুক্ষ অঞ্চল চোখে পড়তে আরও নিশ্চিত হলো সে।

'পাইলট কি করছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'চলো, দেখি।'

সীট থেকে উঠে কেবিনের দিকে এগোল দু'জনে। দরজা খুলেই চিৎকার করে উঠল রবিন। পাইলট সেই লম্বা চুলওয়ালা লোকটা!

আর কোন সন্দেহ রইল না ওদের, কায়দা করে এই বিমানে তুলে দেয়া হয়েছে। এজেন্ট এবং সেই অপরিচিত লোকটার কারসাজি।

'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কথা বলল না লোকটা, চুপ থাকতে ইশারা করল।

'অত ভণিতা করছেন কেন?' রেগে উঠল কিশোর, 'ইংরেজি তো জানেনই।'

তা-ও জবাব দিল না লোকটা। চলে যেতে ইশারা করল।

কিশোরকে টেনে বের করে নিয়ে এল রবিন। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি করা যায়? কিডন্যাপ করা হচ্ছে আমাদের, কোন সন্দেহ নেই।'

'প্লেন দখল করতে হবে। আর তো কোন পথ দেখি না।'

'চালাতে পারবে?'

'কোনমতে পারব। তবে মুসা থাকলে ভাল হত। তখন কি আর জানি, এভাবে বোকার মত বিপদে পড়ব! প্লেন আকাশে ওঠার আগেই কেবিনের দরজা খুলে দেখে নিলে আর এই বিপদে পড়তে হত না।'

দুই ইঞ্জিনের ছোট বিমান, রবিনও চালাতে জানে, মিস্টার সাইমনের বিমানটা চালিয়েছে। বলল, 'নামব কোথায়?'

'প্লেন দখল করে রেকিয়াভিকের সঙ্গে কথা বলব রেডিওতে, ইন্সট্রাকশন চাইব।' জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল কিশোর। বিশাল এক হিমবাহ নজরে এল। ম্যাপ বের করে দেখে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে। 'সম্ভবত ওটা ভ্যাটনাইয়োকুল, আইসল্যাণ্ডের সব চেয়ে বড় হিমবাহ। খুব খারাপ জায়গা। কেউ আসতে চায় না এদিকে।' নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কেটে বলল, 'চলো, পাইলটের সীট থেকে টেনে নামাব ব্যাটাকে। আমি ওকে ধরলেই কো-পাইলটের জয়-স্টিকটা চেপে ধরবে তুমি।'

'চলো।'

পা টিপে টিপে পাইলটের পেছনে চলে এল কিশোর। ঘাড়ে কারাতের কোপ মারার জন্যে হাত তুলতেই ঝট করে ঘুরে গেল লোকটা। নিচ থেকে সোজা মুঠি ছুঁড়ে দিল কিশোরের চিবুক সই করে। ঘুষি খেয়ে টলে উঠল কিশোর। উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলাল। ঠিক এই সময় ফুটফুট শুরু করল বাঁ পাশের ইঞ্জিন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বন্ধ হয়ে গেল ডান পাশেরটা। বাঁ পাশেরটার দমও ফুরিয়ে এসেছে।

পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলে উঠল পাইলট, 'গোলমাল থামাও! কেউই বাঁচবে না তাহলে! হিমবাহের ওপরই নামতে হবে আমাদের!'

সাত

ঘুসি খেয়ে মাথার ভেতরটা ঘোলা হয়ে আছে এখনও কিশোরের। চোয়াল ডলতে ডলতে কো-পাইলটের সীটে বসে পড়ল সে। জয় স্টিকটা চেপে ধরল। রবিনের চোখ রাগে জ্বলছে। পাইলট এখন কিছুটা অন্যমনস্ক, সুযোগটা কাজে লাগাল রবিন, দিল তার কানের নিচে কারাতের কোপ মেরে। এক আঘাতেই বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়ল লোকটা।

ডানায় শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। চিলের মত ভেসে ভেসে তীব্র গতিতে নিচের বিশাল সাদা বরফের দিকে ধেয়ে চলেছে বিমান।

ভ্যাটনাইয়োকুলের দিকে নাক নিচু করে ফেলল। হিমবাহের সারা গা চোখা

চোখা ধারাল দানবীয় ফলায় ভরা। ছোট ছোট বরফের পাহাড় আর পাহাড়ের এখানে সেখানে ফাটল নজরে আসছে।

'কিশোর,' ককিয়ে উঠল রবিন, 'বাঁচানো অসম্ভব!'

গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। জবাব দিল না। অবরোহনের সময় ফ্লাইং স্পীড যাতে কমে না যায় সে চেষ্টা করছে। রাডার বারের ওপর চেপে রয়েছে পা। আধ মাইল-দূরের খানিকটা সমতল ঢালের দিকে নিয়ে চলেছে বিমানটাকে।

দক্ষ পাইলটের জন্যেও ওখানে ল্যাণ্ড করা কষ্টকর। পৌঁছে গেল জায়গাটার ওপর। বিমানের চাকা বরফ ছুঁই ছুঁই করছে। ঠিকমত নামতে পারবে কিনা জানে না কিশোর, যা থাকে কপালে ভেবে দিল জয়-স্টিক ধরে টান।

ওদের দিকে যেন তেড়ে আসতে লাগল সাদা বরফ। বরফে চাকা লেগে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে যেন বলের মত ড্রপ খেয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল বিমান, আবার নামল, আবার ওপরে উঠল, নামল আবার। থরথর করে কাঁপছে ওটার সারা শরীর, চারপাশে ঝনঝন শব্দ, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করছে চাকা।

ঢালের গায়ে পিছলে নেমে গেল কিছুদূর। তারপর যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়াল। অবস হয়ে গেছে যেন রবিনের দেহ। কোনমতে কাঁপা গলায় বলল, 'দারুণ, দারুণ দেখিয়েছ!'

এভাবে ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করেও বেঁচে থাকায় দু'জনেই খুব খুশি, তবে রাগ হচ্ছে পাইলটের ওপর। যত নষ্টের মূল ওই লোকটা। জ্ঞান ফিরছে ওর। আস্তে মাথা তুলে ঘোলাটে চোখে তাকাল।

'জাগলেন তাহলে,' ব্যঙ্গ করে বলল রবিন। 'কে আপনি? কি কাজ করেন?'

'সাহায্য···সাহায্য দরকার এখন আমাদের,' দুর্বল কণ্ঠে বলল লোকটা।

'তা তো দরকারই,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিশোর, 'কোথায় করতে হবে আপনিই ভাল জানেন। নিন, শুরু করুন,' ইঙ্গিতে রেডিওটা দেখিয়ে কো-পাইলটের সীট থেকে নেমে এল সে। প্লেনের কি ক্ষতি হয়েছে দেখতে লাগল।

মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করল পাইলট। কোথায় রয়েছে অবস্থান জানাল। মিনিট দুই পরে মাইক্রোফোন রেখে দিয়ে বলল, 'সাহায্য আসছে।'

'তা তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু আপনি কে, তা এখনও বলেননি।'

চুপ করে রইল লোকটা। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে, শুনতেই পায়নি তার কথা।

'মুশকিলেই পড়া গেল,' বিড়বিড় করল রবিন। 'এমন এক উদ্ভট জায়গায় নামলাম···সাহায্য কিভাবে পাব, জানি না···লোকটাও কিছু বলছে না!'

লোকটাকে টেনে তুলল কিশোর। তার কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা চেক করে নিল। তারপর ঠেলা দিয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে। টুলবক্স থেকে একটা ছোট হাতুড়ি নিয়ে তৈরি আছে রবিন, গোলমালের চেষ্টা করলেই মারবে বাড়ি। কি বিপদে রয়েছে লোকটাও বুঝতে পারছে। অহেতুক বাধাটাধা দিয়ে ঝামেলা করতে চাইল না। যা করতে বলা হলো, করল।

পিচ্ছিল বরফের ওপর নামতেই বরফ-শীতল বাতাস যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল

ওদের ওপর, যেন বালতি দিয়ে বরফ গোলা পানি ঢেলে দেয়া হলো শরীরে। বিমানের দুটো প্রপেলারই বাঁকা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনেরও ক্ষতি হয়েছে, মেরামত না করলে আর চলবে না।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল গোয়েন্দারা। চুপ করে রইল পাইলট। একটা জবাবও দিল না। হাল ছেড়ে শেষে চুপ করে রইল ওরাও।

দূরে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

'হেলিকপ্টার,' রবিন বলল। 'বড় বেশি তাড়াতাড়ি চলে এল!' কপালের ওপর হাত নিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করল সে।

'হায় হায়!' বলে উঠল কিশোর, 'এ তো টু-সিটার! তিনজন যাব কি করে?'

'একজনই যাবে আগে।'

মুখ গোমড়া করে কপ্টারটার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। তাকে বলল কিশোর, 'আমাদের কথার জবাব তো দিলেন না। দেখি রেকিয়াভিকের পুলিশের কাছে কতক্ষণ মুখ বন্ধ রাখতে পারেন। ওরা অত সহজে ছেড়ে দেবে না।'

বিমানের কাছে নামল কপ্টার। মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ লাফিয়ে নামল। কালো চুল, রুক্ষ চেহারা, লম্বা নাক, সব মিলিয়ে মোটেও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মনে হয় না। এসেই বিদেশী ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

'আপনি ইংরেজি বলতে পারেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অল্প অল্প।'

'এই লোকটা আমাদের কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল। ইঞ্জিন বিগড়ে গেল বলে পারেনি। হাতকড়া তো নিশ্চয় নেই?'

'না। তবে দড়ি আছে।'

হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে দড়ি বের করে নিয়ে এল পাইলট। সেটা দিয়ে আগের পাইলটের হাত শক্ত করে বাঁধল কিশোর। 'রেকিয়াভিকে গিয়ে আমরা থানায় নালিশ করব। একে পুলিশের হাতে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন ফিরে আসবেন, প্লীজ।'

ধরে ধরে বন্দিকে নিয়ে গিয়ে কপ্টারে তুলল পাইলট। নিজেও উঠল।

আকাশে উঠে পড়ল কপ্টার। সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'শয়তানটার হাত থেকে বাঁচা গেল। ওটাকে দেখলেই শুঁয়াপোকার কথা মনে পড়ে যায় আমার।'

'হুঁ, চেহারাটা বড়ই বদ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'রবিন, কেমন যেন খচখচ করছে মনের মধ্যে। কপ্টারের পাইলটের আচরণও ভাল লাগেনি আমার। দাঁড়াও, রেকিয়াভিকের সঙ্গে কথা বলে আসি। ওদেরকে বলি যত তাড়াতাড়ি পারে যেন কপ্টারটা ফেরত পাঠায়।'

বিমানে এসে উঠল দু'জনে। দরজা লাগিয়ে দিল যাতে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে না পারে।

রেডিওটা অন করতে গেল কিশোর। হলো না। আবারও চেষ্টা করল, এবারেও একই অবস্থা। 'এই রবিন, দেখে যাও!'

'কি হলো?' কেবিনে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রেডিওটা কাজ করছে না!'

'নষ্ট করে দেয়নি তো?'

'তাই দিয়েছে!'

মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের শীতল শিহরণ খেলে গেল রবিনের। স্যাবোটাজ করে দিয়ে গেছে রেডিও।

দ্রুতহাতে যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। ভেতরের ফ্রিকোয়্যান্সি ক্রিস্টালটা গায়েব। সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'গাধা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে আমাদের, রবিন!'

'তুমি বলতে চাইছ আমাদেরকে সারাক্ষণ অনুসরণ করে এসেছে কপ্টারটা?'

'তাই করেছে। এইবার সত্যি সত্যি বিপদে পড়লাম!'

এত ঠাণ্ডায়ও ঘাম দেখা দিল রবিনের কপালে। 'কি করব এখন, কিশোর?'

'আর যা-ই করি, ভেঙে পড়লে চলবে না। ক্রিস্টালটা হয়তো বরফের মধ্যেই কোথাও ফেলেছে। খুঁজে বের করতে হবে ওটা।'

তাড়াহুড়া করে আবার প্লেন থেকে নেমে পড়ল দু'জনে। খুঁজতে আরম্ভ করল। বৃথা চেষ্টা। পাওয়া গেল না যন্ত্রাংশটা।

দক্ষিণ থেকে উড়ে এল কালো মেঘ। নিচে নামছে ক্রমেই। সেদিকে চোখ পড়তেই চমকে গেল রবিন, 'বাহ্, ষোলোকলা পূর্ণ হচ্ছে এতক্ষণে!'

তুষার পড়া শুরু হলো।

'সাংঘাতিক ঝড় আসবে মনে হয়,' গম্ভীর মুখে বলল কিশোর।

আবার বিমানে উঠে পড়ল দু'জনে।

বাড়ছে তুষার পড়া। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এমন ঘন হয়ে পড়তে লাগল, তিন ফুট দূরেও আর দৃষ্টি চলে না। বাতাসের গতি বাড়ছে। গর্জন করে ফিরতে লাগল যেন হাজার নেকড়ে। বিপদ কি একটা? তুষারপাতের কারণে তাপমাত্রাও নেমে যাচ্ছে বিপজ্জনক পর্যায়ে।

শীতের কাপড় পড়ে আসেনি ওরা। হি-হি করে কাঁপ উঠে গেল। গায়ে জড়ানোর মত বাড়তি কোন কিছুর আশায় বিমানের ভেতরে খুঁজতে শুরু করল দু'জনে। রিপেয়ার লকারে একটা তেল চিটচিটে ওভারঅল পেল রবিন।

'পরে ফেল,' কিশোর বলল।

'তুমি?'

'আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে ওটা পরেও বাঁচতে পারবে না।'

'জ্বালাতে গিয়ে শেষে প্লেনেই আগুন ধরে যাক!'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? আর তো কোন উপায়ও নেই।'

তেলের ট্যাংকে তেল আছে, কিন্তু সেটা জ্বালানোর চেষ্টা করা সাংঘাতিক ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে। শেষে আর কিছু না পেয়ে দরজার ভেতরের দিকের হালকা কাঠ টেনে টেনে তুলে নিতে লাগল দু'জনে। ছোট করে ভেঙে জমা করল বিমানের মেঝেতে। ভালই জ্বলবে। দরজা সামান্য ফাঁক করে রাখা হলো, কারণ বদ্ধ জায়গায় আগুন জ্বললে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে।

আগুন জ্বলল। হাত-পা গরম করতে করতে মলিন হাসি হেসে বলল রবিন,

'শীতে জমে আর মরব না।'

'সতর্ক থাকতে হবে। মাঝে মাঝেই উলটে-পালটে দিতে হবে কাঠ। নিচে ধরে গেল কিনা খেয়াল রাখতে হবে।' জানালার বাইরে তাকাল কিশোর। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। প্রচণ্ড গর্জন তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস।

দু'জনে সারারাত জেগে থাকার কোন মানে হয় না। কতটা ঘুমাতে পারবে সন্দেহ আছে, তবু কিছুটা বিশ্রাম তো হবে, ভেবে, পালা করে জেগে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

ভোরের দিকে কমে এল ঝড়। কাঠ শেষ। আর কি পোড়াবে আগুনে? ভাবতে ভাবতে একটা প্যাসেঞ্জার সীটের দিকে তাকাল। দ্বিধা করল না এক বিন্দু। উঠে গিয়ে টান দিয়ে ছিঁড়তে শুরু করল সীটটা।

চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, 'কিশোর, পেয়ে গেছি!'

আট

ঢুলছিল কিশোর, চমকে জেগে গেল। চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল, 'চেঁচাচ্ছ কেন?'

'এই দেখো কি পেয়েছি!' চারকোণা ছোট একটা ধাতব জিনিস দেখাল রবিন। 'রেডিওর ফ্রিকোয়্যান্সি ক্রিস্টাল। সীটের ফাঁকে ঢুকিয়ে রেখেছিল।'

খবরটা যেন বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিল কিশোরের শরীরে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। রবিনের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে আগুন ডিঙিয়ে ছুটল বিমানের কেবিনে। ক্রিস্টালটা লাগানো কোন ব্যাপারই না তার জন্যে। পুরোপুরি সচল হয়ে গেল রেডিও, শুধু ওই একটা পার্টসের অভাবেই বিকল হয়ে ছিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রেকিয়াভিকের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলল।

ডিসপ্যাচারকে আসল কথা জানাল না কিশোর, শুধু বলল, ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় হিমবাহের ওপর বিমান নামাতে বাধ্য হয়েছে ওরা, বড় বিপদের মধ্যে আছে। তাড়াতাড়ি সাহায্য না পেলে মরবে। ডিসপ্যাচার বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আইসল্যাণ্ডিক কোস্টগার্ডের একটা হেলিকপ্টার পৌঁছে যাবে ওদের কাছে।

সাগা হোটেলে মুসা আর টমকে আরেকটা মেসেজ পাঠাল কিশোর। জানাল, ওরা কি অবস্থায় রয়েছে। দুশ্চিন্তা করতে মানা করল।

তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে বিমান থেকে নেমে পড়ল দু'জনে। পুরু হয়ে তুষার জমেছে। এর মধ্যে হেলিকপ্টার নামার অসুবিধে হতে পারে মনে করে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে যতটা পারল সমান করতে শুরু করল।

ঘণ্টাখানেক পর শোনা গেল হেলিকপ্টারের শব্দ। এগিয়ে এল ওটা। দেখা গেল একটু পরেই। চেঁচিয়ে, হাত নেড়ে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল দু'জনে।

কপ্টার নামল। কেবিন থেকে লাফিয়ে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এল পাইলট। 'জখম-টখম হয়েছে কোথাও?'

'না, আমরা ঠিক আছি,' জবাব দিল কিশোর।

'আশ্চর্য! সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট করেছ কিন্তু। কপাল খুব ভাল, সে জন্যে

বেঁচেছ। রেকিয়াভিক থেকে প্লেন ভাড়া করেছিলে নাকি?'

কিভাবে কি করেছিল, সংক্ষেপে জানাল কিশোর। কিডন্যাপাররা যে পালিয়েছে সে কথাও বলল।

'ওটা আমাদের রেসকিউ কপ্টার ছিল না,' পাইলট জানাল। 'এসো, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

কপ্টারের দিকে এগোল সে। পেছনে চলল দুই গোয়েন্দা।

'আমাদের একটা উপকার করবেন?' আকাশে ওঠার পর পাইলটকে অনুরোধ করল কিশোর।

'কি?'

'আমাদেরকে আকুরীরিতে পৌঁছে দেবেন?'

ভুরু কোঁচকাল লোকটা, 'আকুরীরিতে কেন?'

না বলে আর উপায় নেই। ওরা যে শখের গোয়েন্দা একথা জানাল কিশোর। বলল, ইনশিওরেন্স কোম্পানির হয়ে কাজ করছে। রেক্স হলবিয়রন্সন নামে একটা লোককে খুঁজতে যাচ্ছিল, এই সময়ই পড়ে কিডন্যাপারের খপ্পরে।

হাসল পাইলট। 'এত অল্প বয়েসে গোয়েন্দা হয়েছ, অবাকই লাগছে। যাকগে, একটা কোম্পানি যখন কাজ দিয়েছে, নিশ্চয় পারবে বুঝেই দিয়েছে।...ঠিক আছে, চলো, পৌঁছে দিচ্ছি আকুরীরিতে।'

উত্তরে ঘুরে গেল হেলিকপ্টারের নাক।

পেছনে দ্রুত মুছে যেতে থাকল হিমবাহ। একসময় দেখা গেল না আর। নিচে এখন তৃণভূমি, সাদা তুষারের মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে সবুজ ঘাস।

'দেখো ভাল করে, চোখ রাখো,' পাইলট বলল। 'মেরু ভালুক দেখতে পেলেই জানাবে।'

'মেরু ভালুক?' অবাক হলো রবিন, 'আইসল্যাণ্ডে মেরুভালুক আছে বলে তো জানতাম না?'

'সাধারণত থাকে না,' জবাব দিল পাইলট। 'কিন্তু এবার সাংঘাতিক শীত পড়েছে। গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে বরফ জমে জমে সাগরের ভেতরে অনেক লম্বা একটা জিভ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেটাতে উঠেছিল কয়েকটা ভালুক। জিভটা ভেঙে গিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে আইসল্যাণ্ডের উপকূলে। তীরে উঠে পড়েছে ভালুকগুলো। একটা ধরাও পড়েছে, বাকিগুলো এখনও ছাড়া। চাষীর খামারে চড়াও হয়ে ভেড়া মারছে, ঘোড়াকে হামলা করছে। একজন মানুষকেও তাড়া করেছিল, কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে লোকটা।'

খুব কৌতূহলী হয়ে নিচে তাকিয়ে ভালুক খুঁজতে লাগল কিশোর আর রবিন। চোখে পড়ল কেবল সাধারণ কয়েকটা বাড়িঘর আর সবুজ তৃণভূমিতে ভেড়ার পাল।

মাঝে মাঝে ছোট টাট্টু ঘোড়া চোখে পড়ছে। এত ঘোড়া দিয়ে কি হয় পাইলটকে জিজ্ঞেস করে জবাব পেল, 'ঘোড়াই এখানকার লোকের প্রধান বাহন। ছোট হলে কি হবে, প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে টাট্টু। উঁচুনিচু পথে চলায় জুড়ি নেই ওগুলোর।'

উত্তর উপকূল দেখা যাচ্ছে। ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে একট চওড়া সামুদ্রিক

খাল। সেদিকে দেখিয়ে পাইলট বলল, 'ওটাই আকুরীরি।'

শহরের বাইরে একটা মাঠে নামল কপ্টার।

'যাও। গুড লাক,' পাইলট বলল। 'রেকিয়াভিকের কোস্ট গার্ডকে বলব তোমাদের কথা।'

নামল দুই গোয়েন্দা।

ওদের দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে কপ্টার নিয়ে আবার উড়ে গেল পাইলট।

শহরে ঢুকে ছোট একটা হোটেলে ঘর ভাড়া নিল ওরা। খাবার পাঠিয়ে দিতে বলে চলে এল ঘরে। হাতমুখ ধুতে ধুতে খাবার এসে গেল।

সাংঘাতিক ধকল গেছে। খাওয়ার পর ঘণ্টা দুয়েক ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল, দেখে অন্ধকার হয়ে গেছে।

'এহ্হে, ক্লার্ককে বলে রাখলেই পারতাম,' কিশোর বলল, 'আমাদের জাগিয়ে দিত।'

হাত টান টান করে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে রবিন বলল, 'এখনও অত দেরি হয়নি। রেক্স হলবিয়রন্সন নিশ্চয় চাকরি-বাকরি করে। তাহলে বাড়ি ফেরার সময় হয়নি এখনও।'

হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে ডিনার খেল ওরা। তারপর বেরোল হলবিয়রন্সনকে খুঁজতে। ঠিকানা মত গিয়ে দেখল সরু গলিতে একটা মাছের কারখানার কাছে একটা ছোট বাড়ি, বয়েসের ভারে প্লাস্টার খসে গিয়ে ইট বেরিয়ে পড়েছে। টিনের চালার রঙ চটা।

সেদিকে এগোতে এগোতে নাক কুঁচকাল কিশোর, 'উঁহ্, কি গন্ধরে বাবা! নাক জ্বলে গেল!'

বাড়ির দরজায় টোকা দিল রবিন। খুলে দিলেন একজন মাঝবয়েসী মহিলা। ভাল ইংরেজি বলতে পারেন। জানা গেল তিনিই বাড়ির মালিক। জানালেন, হলবিয়রন্সন এখানেই থাকেন। আরও একজন আমেরিকান খুঁজতে এসেছিল তাঁকে, সে কথাও বললেন।

'আরেকজন?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'হ্যাঁ। এসো।' ছেলেদের পথ দেখিয়ে হল পার করে নিয়ে এল একটা ছোট ঘরে। ছোট একটা বিছানার পাশে জীর্ণ মলিন একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে একজন মানুষ। মাথা জুড়ে টাক। নীল চোখ। মিটমিট করে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে।

'আমি কিশোর পাশা, ও রবিন মিলফোর্ড। আপনিই রেক্স হলবিয়রন্সন?'

'জা।' ভাঙা ইংরেজিতে থেমে থেমে বলল হলবিয়রন্সন, ছেলেদের দেখে খুব খুশি হয়েছে। তার বিছানাতেই বসতে ইশারা করল ওদেরকে। তারপর জরুরী একটা ফোন করার জন্যে উঠে চলে গেল।

ফিরে আসার পর কিশোর বলল, 'আপনি তো নাবিক, তাই না?'

'শুনেছি, জাহাজ ডুবি হয়ে নাকি মরতে মরতে বেঁচে এসেছেন,' রবিন বলল। 'ভাগ্য সত্যি ভাল আপনার।'

মাথা ঝাঁকাল হলবিয়রন্‌সন। ইউরোপে ঘুরে বেড়ানোর এক লম্বা গল্প শুরু করল। মিস্টার সাইমনের কথার সঙ্গে এসব কিছুই মিলল না। চেহারাও রোদে পোড়া নয় তার, নাবিকদের মত নয়।

'স্পেনের উপকূলে ডুবে গেল আমাদের জাহাজ,' বলে চলেছে হলবিয়রন্‌সন। 'মাথায় বাড়ি লাগল, কিসের সঙ্গে, মনে করতে পারি না। তারপর···ওই কি বলে যেন···হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অ্যামনেশিয়ায় ভুগতে লাগলাম। পাঁচ বছর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, শেষে একদিন তুরস্কে···'

'···একটা গ্রীক শিপিং কোম্পানিতে চাকরি পান,' কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। লোকটা যে মিথ্যে বলছে বুঝতে পারছে।

তার ফাঁদে পা দিল হলবিয়রন্‌সন। মাথা ঝাঁকাল, *'জা।* তোমরা শুনেছ তাহলে?'

কিশোরের চালাকি রবিনও ধরে ফেলেছে, বলল, 'তারপর সিরিয়ায় গেলেন। সেখান থেকে এসেছেন আইসল্যাণ্ডে, তাই তো?'

'সবই তো জানো দেখি,' খুশি হলো যেন হলবিয়রন্‌সন। 'ভাল। এরকম লোকের সঙ্গে কথা বলে আরাম। মনে হচ্ছে টাকা পেতে ঝামেলা হবে না। কত টাকা?'

'তিন লাখ ডলার,' কিশোর জানাল।

লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ। 'নিয়ে এসেছ?'

'না, ইনশিওরেন্সের টাকা তো আর ওভাবে আনা হয় না। আমরা গিয়ে রিপোর্ট করব। কোম্পানি যাকে খুঁজছে আপনি সেই হলবিয়রন্‌সন হয়ে থাকলে টাকা অবশ্যই পাবেন।'

'জা। জা।' বিড়বিড় করল লোকটা। 'তাড়াতাড়ি করবে। দেখছ তো, কি কষ্ট করে আছি এই ঘরটার মধ্যে। বুড়ো হয়ে গেছি, কোন কাজ করারও সামর্থ্য নেই।'

লোকটাকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। হলের ভেতর দিয়ে এগোল সামনের দরজার দিকে। বাড়িওয়ালিকে খুঁজল কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা গেল না।

রাস্তায় বেরোল ওরা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎই যেন আলোর বিস্ফোরণ ঘটল। তারপর আবার অন্ধকার। মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল দু'জনেই।

মাছের তীব্র আঁশটে গন্ধ এসে লাগল নাকে। ধীরে ধীরে চোখ মেলল রবিন। কতক্ষণ বেহুঁশ হয়ে ছিল বলতে পারবে না। ঘোলাটে চোখে দেখল, তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে টম মার্টিন।

'ভয় নেই,' বলল টম, 'তেমন কিছু হয়নি। একটা করে বাড়ি লেগেছে কেবল মাথায়। দু'জনেরই।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে গিয়েই নাকমুখ কুঁচকে ফেলল রবিন। দপদপ করছে মাথার মধ্যে, যেন ছিঁড়ে যাবে। কোথায় রয়েছে দেখল। সে আর কিশোর দু'জনেই রয়েছে কনভেয়র বেল্টের মধ্যে।

'কোথায় রয়েছি?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'একটা মাছের কারখানায়। কেন গন্ধে বুঝতে পারছ না? রেক্স হলবিয়রন্সনের বাড়ির উল্টো দিকে।'

'ও হলবিয়রন্সন নয়, একটা চীট! ধাপ্পা দিয়েছে আমাদের!' উঠে বসল রবিন। মাথা ডলছে। নেমে পড়ল কনভেয়র বেল্ট থেকে।

কিশোরের জ্ঞানও ফিরেছে। টমকে বলল, 'খুলে বলো তো আমাদের সব। আমরা এখানে কি করে এলাম, তোমরাই বা কি করে এলে?'

'চলো, আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাই, তারপর সব বলছি।'

হোটেলে ফেরার সময় সব জানাল টম, 'তোমাদের জন্যে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মুসার সঙ্গে পরামর্শ করে সকালের প্লেনে চলে এসেছি।'

'তারমানে আমাদের মেসেজ পাওনি,' কিশোর বলল। 'তার আগেই বেরিয়ে গেছ। এখানে এসে যখন আমাদের খুঁজে পেলে না তারপর কি করলে?'

'হলবিয়রন্সনের ঠিকানায় খোঁজ নিলাম। বাড়িওয়ালি বলল, সবেমাত্র এসেছে লোকটা। তার মনে হয়েছে, আইসল্যাণ্ডের লোক মোটেও নয় সে, বিদেশী।' তারপর সারা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে টম। মাছধরা জাহাজ দেখেছে, আমেরিকান টুরিস্টদের সঙ্গে কথা বলেছে। তারপর আবার ফিরে গেছে হলবিয়রন্সনের ওখানে।

'আমরা তাহলে তোমার আগে ঢুকেছি ওখানে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। ওখানে গিয়ে দেখি দু'জন লোক ঘোরাফেরা করছে বাড়ির সামনে। সন্দেহ হলো। একটা বারান্দায় লুকিয়ে পড়ে দেখতে লাগলাম কি করে। কয়েক মিনিট পর তোমরা বেরোলে। লোকগুলো কি দিয়ে যেন পেছন থেকে বাড়ি মারল তোমাদেরকে।'

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'এখন বুঝতে পারছি আমরা ঢোকার পর পরই কাকে ফোন করতে গিয়েছিল হলবিয়রন্সন।'

'তারপর,' টম বলল, 'সাইরেন শোনা গেল। লোকগুলোর কাণ্ডটা যদি তখন দেখতে, কি যে তাড়াহুড়া শুরু করে দিল। তোমাদেরকে টেনে নিয়ে গেল মাছের কারখানার ভেতর। আমিও ভেবেছি পুলিশ, পরে দেখি একটা অ্যামবুলেন্স।'

'তুমি তখন মাছের কারখানায় ঢুকলে?' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকাল টম। জানাল, লোকগুলোর বেরোনোর অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু ওরা আর বেরোয় না। দেরি দেখে শেষে ওদের চোখে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও ঢুকে পড়ল। কনভেয়র বেল্টের ওপর পড়ে থাকতে দেখল কিশোরদের। 'পাশের কোন দরজা দিয়ে বোধহয় বেরিয়েছে ব্যাটারা,' শেষে বলল সে। দম নিল। তারপর বলল, 'এবার তোমাদের কথা বলো।'

রেকিয়াভিক থেকে বেরোনোর পর কি কি ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল কিশোর। হোটেলে ফিরে বরফের টুকরো জোগাড় করে এনে মাথার ফুলে যাওয়া জায়গায় ঘষতে লাগল। বয়কে ডেকে টমের জন্যে ওদের ঘরেই আরেকটা বিছানার বন্দোবস্ত করে দিতে বলল।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। প্লেনে

করে ফিরে এল রেকিয়াভিকে। ট্যাক্সিতে করে সাগা হোটেলে ফিরে দেখল, হোটেলের সামনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পায়চারি করছে মুসা।

ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল কিশোরের। ডাক দিল, 'এই, মুসা!'

ঘুরে তাকাল মুসা। কোন ভাবান্তর হলো না চেহারায়। কথা বলল না।

'অদ্ভুত তো! এমন করছে কেন?' হাত নেড়ে ডাকল, 'এদিকে এসো। শোনো।'

এগিয়ে এল মুসা, অনেকটা রোবটের মত।

খুব কাছে থেকে ওর চোখের দিকে তাকাল কিশোর। মাথা দোলাল, 'হুঁ, যা ভেবেছি। ড্রাগ দেয়া হয়েছে ওকে!'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রবিন। 'মুসাকে আউট করে দিয়ে আমাদের রেডিও আর ডিকোডারগুলো…'

'টম,' কিশোর বলল, 'জলদি ওকে হোটেলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। আমরা ওপরে যাচ্ছি। রবিন, এসো।'

ছুটে হোটেলে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। লিফটে করে উঠে এল ওপরে। কার্পেট ঢাকা করিডর দিয়ে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল ওদের ঘরের সামনে।

দরজায় কান রাখল কিশোর।

ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে।

দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে আস্তে মোচড় দিয়ে খুলে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা।

পাঁই করে ঘুরল দু'জন লোক। দু'জনই গোয়েন্দাদের পরিচিত। সোনালি চুলওয়ালা লোকটা আর তার দোস্ত, হেলিকপ্টারের পাইলট।

নয়

লুকিয়ে ঘরে ঢুকেছে, হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে প্রথমে বিমূঢ় হয়ে গেল লোকগুলো। তারপর দৌড় দিল দরজার দিকে।

পথ ছাড়ল না গোয়েন্দারা। রুখে দাঁড়াল। লোকগুলোও বেরোবেই। বেধে গেল হাতাহাতি।

চুলওয়ালা লোকটার চুল চেপে ধরল রবিন। টান লেগে খসে চলে এল পরচুলা। হাঁ করে লোকটার মাথার দিকে তাকিয়ে রইল সে। মাথা জুড়ে টাক। লোকটাকে চিনতে পেরেছে। আকুরীরিতে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে যাকে দেখে এসেছে সেই *রেক্স হলবিয়রন্‌সন!*

'ধর, ধর ওকে কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। নিজেও দৌড় দিল লোকটার পেছনে। 'পালাল তো ব্যাটা!'

ওদের আগেই লিফটে পৌঁছে গেল লোকগুলো।

চিৎকার করে কিশোর বলল, 'সিঁড়ি, সিঁড়ি!'

একেক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে লাগল ছেলেরা, লিফটের আগে নিচে নামার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। একতলায় এসে খুলে গেল লিফটের দরজা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল লোকগুলো। ছুটল করিডরের লাগোয়া বলরুমের

দিকে, অনেক চেয়ার-টেবিল আছে ঘরটায়।

বলরুমে ঢুকে পড়ল দু'জনে। গোয়েন্দারাও পিছু ছাড়ল না। ছোটার সময় হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে চেয়ার তুলে নিয়ে পেছনে ছুঁড়তে লাগল লোকগুলো, বাধা সৃষ্টি করার জন্যে।

এড়াতে পারল না কিশোর। একটা চেয়ারে পা বেধে দড়াম করে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল। কোনমতে তাকে ডিঙিয়ে লোকগুলোকে তাড়া করে গেল রবিন। বেশিদূর যেতে পারল না, তার আগেই পেছনের সিঁড়িতে নেমে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো।

নেমেও আর ওদেরকে দেখতে পেল না রবিন। হতাশ হয়ে ফিরে এল বলরুমে। একটা চেয়ারে উঠে বসেছে কিশোর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে আর হাঁটু ডলছে।

'বেশি ব্যথা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'প্রথমে ভেবেছিলাম ভেঙেই গেছে বুঝি···ভাঙেনি। বেঁচেছি। শয়তানগুলো তাহলে পালালই?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

বলরুমে তখন কেউ নেই, কাজেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো না।

হতাশ হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাক্তারের ঘরে চলল কিশোর। রবিন চলল তার সঙ্গে। দু'জনেই হতাশ। ঘরটা কোথায় ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল। সেখানে এসে দেখল ডাক্তার পরীক্ষা করছেন মুসাকে। এক কানের স্টেথোস্কোপের মাথা সরিয়ে বলছেন, 'কফি খাচ্ছিলে দু'জন অপরিচিত লোকের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। ওষুধের ঘোর অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে।

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর আর রবিন।

ডাক্তার বললেন, 'তেমন কোন ক্ষতি হয়নি তোমাদের বন্ধুর, কাটিয়ে উঠেছে। কে ড্রাগ খাওয়াল বলো তো? শত্রু-টত্রু আছে?'

'মনে হয়,' ডাক্তারকে সব কথা জানানোর ইচ্ছে নেই কিশোরের।

'হুঁ। আমাদের দেশে এসে এমন একটা কাণ্ড হলো, বড় লজ্জা লাগছে। যাই হোক, সাবধানে থাকবে।'

'থ্যাংক ইউ,' টম বলল। 'ডাক্তার সাহেব, আপনার ফিস···'

হেসে হাত নাড়লেন ডাক্তার। 'লাগবে না। মেহমানদের খুশি হয়েই চিকিৎসা করি আমরা, ফিস নিই না তাদের কাছ থেকে।' কান থেকে স্টেথোস্কোপ খুলে ভাঁজ করে হাতে নিলেন, ব্যাগটা তুলে নিতে নিতে মুসাকে বললেন, 'তোমাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, গরম পানির সুইমিং পুলে গিয়ে সাঁতার কেটে এসো।'

'তাহলে তো ভালই হয়,' খুশি হয়ে বলল মুসা। 'পুল কোনখানে?'

'সাওহলে চলে যাও। কাছেই।'

ডাক্তারকে আরেক বার ধন্যবাদ দিল ছেলেরা। বেরিয়ে এসে সেফ থেকে কোডবুকটা বের করে আনল কিশোর। তারপর সবাইকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

'টর্নেডো হয়েছিল নাকি এখানে!' টম বলল। 'সেই লোকটাই ছিল? ঠিক

চিনেছ?'

'চিনব না কেন?' জবাব দিল রবিন। 'কবারই তো দেখলাম। কেফ্লাভিক এয়ারপোর্টে, রেকিয়াভিকে—আমাদের পিছু নিয়েছিল, তারপর প্লেনের পাইলট সেজে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এল হিমবাহর মধ্যে।'

'ভাল ছদ্মবেশ নিয়েছিল,' বলল কিশোর। 'সোনালি চুলের উইগ, ইয়াবড় গোঁফ···ভাল বোকাই বানিয়েছিল আমাদের।'

রেডিওটা ঠিকই আছে, নষ্ট হয়নি, দেখে হাঁপ ছাড়ল গোয়েন্দারা। ওয়ারড্রোবের কোণে লুকিয়ে রেখে যাওয়া কালো বাক্সটাও খুঁজে পায়নি কিডন্যাপাররা।

দুটো দোমড়ানো শার্ট বের করে ডলে ডলে সমান করছে কিশোর, এই সময় বাজল টেলিফোন।

'এই, চুপ! মনে হয় ওই ব্যাটারাই,' বলতে বলতে ফোনের দিকে এগোল কিশোর। দ্রুতহাতে রেকর্ডিং ডিভাইসটা টেলিফোনের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে রিসিভার তুলল। 'হ্যালো?' ওপাশের কণ্ঠ শুনে মুখ বাঁকাল। তারপর, 'থ্যাংক ইউ' বলে রেখে দিল।

'কে?' জানতে চাইল রবিন।

'হোটেল ম্যানেজার,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

হেসে উঠল সবাই। মুসা বলল, 'ডিভাইস-ফিভাইস নিয়ে খামোকাই···'

আবার বাজল ফোন। সেদিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল কিশোর।

রবিন গিয়ে রিসিভার তুলল। ওপাশ থেকে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠ, 'ভাল চাইলে আইসল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে যাও!' ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে এল, তারপরেই নীরব হয়ে গেল। লাইন কেটে দিয়েছে লোকটা।

'শয়তান!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। 'ধরতে পারলে···এহ্, আইসল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে যাব! তোদের ভয়ে! মামাবাড়ির আবদার!'

'যাব না,' টম বলল।

'গলা চিনতে পেরেছ?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওই টেকোটাই!'

ঘরটাকে আবার গোছগাছ করে রেখে লাঞ্চ খেতে চলল চারজনেই। খেয়েদেয়ে ফিরে এসে কেউ গড়িয়ে পড়ল বিছানায়, কেউ বসল চেয়ারে। যা যা ঘটেছে সেসব নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

অনেক প্রশ্ন। কিশোর আর রবিনকে কেন কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল? হলবিয়রনসন সাজল কেন? লোকটা আসলে কে?

কোন প্রশ্নেরই জবাব না পেয়ে শেষে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল মুসা। কিশোরকে বলল, 'বসে বসে চিন্তা করো, আমি চললাম গরম পানিতে সাঁতার কাটতে।···এই, তোমরা কেউ যাবে?'

রবিন মাথা নাড়ল। টম উঠে দাঁড়াল, 'চলো। কিন্তু চিনব কি করে?'

'ডেস্কে জিজ্ঞেস করলেই হবে।'

কয়েক মিনিট পর দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দিল কিশোর। 'আরে, এমি,

এসো। তোমার তো আর কোন খবরই নেই।'

'অনেক খবর আছে,' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল এমি। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। ধপ করে এমন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল, মনে হলো অনেক পরিশ্রম করে এসেছে। 'খুব ব্যস্ত ছিলাম। তোমাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করেছি।'

'লাভ কিছু হলো?'

'তা হয়েছে বলতে পারো। কাল তোমার খোঁজ করেছিলাম, শুনলাম তুমি আর রবিন আকুরীরি গেছ।'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তো, কি জেনে এলে?'

'একজন রেক্সকে খুঁজে পেয়েছি।'

'সত্যি!' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর রবিন।

সামনে ঝুঁকল এমি। হাত নাড়ল, 'তবে লোকটা আসল কিনা জানি না, মানে যাকে তোমরা খুঁজছ আরকি। সে একজন নাবিক, একটা মাছধরা জাহাজ আছে, জাহাজটার নাম স্‌ভারট্‌ফিউগেল, এর মানে হলো কালোপাখি।'

'দেখা করব কি করে?' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। 'জাহাজে যেতে হবে?'

এমি জানাল, 'জাহাজটা পাবে না, ওটা এখন সাগরে। তবে ওটার ক্যাপ্টেনের বাসা চিনে এসেছে। 'লোকটার নাম গুরুনসন। ভাবছি, মিসেস গুরুনসনের সঙ্গে কথা বলব কিনা। কিছু জানাও যেতে পারে।'

'বসে আছি কেন তাহলে?' একলাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রবিন। 'চলো চলো!'

বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এমির জীপে এসে উঠল।

সাগরের তীরে একটা হলুদ রঙ করা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল এমি। নেমে গিয়ে দরজায় টোকা দিল।

এক মহিলা দরজা খুলল, মাথায় লাল চুল। আইসল্যাণ্ডিকে তার সঙ্গে কথা বলল এমি।

মাথা দোলাল মহিলা, '*জা জা! রেক্স মার।*'

'*ট্যাক ট্যাক,*' এমি বলল।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে উঠল সে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি বলল?'

'বলল, লোকটার নাম রেক্স মার।'

'সাগর ভালবাসে?' রবিনের প্রশ্ন।

'নাবিক যেহেতু, জাহাজও কিনেছে, ভাল তো নিশ্চয় বাসে। তবু মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছি। বলল, বাসে।'

'নিশ্চয় সাগরের অনেক গল্প জানে?'

'জানে।'

'কোথায় এখন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'উত্তর-পশ্চিম উপকূলের কোথাও আছে।'

'কোন সম্ভাবনাকেই হেলাফেলা করা এখন উচিত হবে না আমাদের,' রবিন

বলল। 'এমনও হতে পারে, বেশি লম্বা বলেই শেষ নামটা বদলে ফেলেছে।'

আপাতত আর কিছু করার নেই। দুই গোয়েন্দাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে, 'আবার দেখা হবে' বলে, চলে গেল এমি।

কোন মেসেজ আছে কিনা, ডেস্কে খোঁজ নিল কিশোর। নেই। ঘরে ফিরে এল দু'জনে।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'মিস্টার সাইমনকে সব জানানো দরকার। দেখি, কোন পরামর্শ দিতে পারেন কিনা।'

রেডিও নিয়ে বসল সে। সিগন্যাল পাঠাতে আরম্ভ করল।

ঘনঘন থাবা পড়ল দরজায়।

সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'আবার কে এল?' উঠে গিয়ে খুলে দিল দরজা।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে মুসা। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কার সঙ্গে দেখা হয়েছে জানো?'

'কি করে জানব?' কিশোর বলল।

'এসো আমার সাথে···নিচে···এসো এসো!'

'কার সঙ্গে, বলতে পারছ না?' রবিন বলল।

'গেলেই দেখবে।···দেরি করছ কেন? এই কিশোর, এসো না!'

রেডিও অফ করে দিল কিশোর। মুসার সঙ্গে রওনা দিল।

লিফটে উঠে ঘুরে তাকাল কিশোর, কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মুসার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করল, 'নকল হলবিয়রন্সনের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?'

'গেলেই দেখবে।'

কয়েক সেকেণ্ডেই পৌঁছে গেল নিচে। লিফট থেকে বেরিয়ে লবিতে পা দিতেই মেয়েটার ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। টমের সঙ্গে কথা বলছে। প্লেনের সেই স্টুয়ার্ডেস, গেইনি।

দশ

'আরে, গেইনি, কেমন আছেন?' হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর।

লবিতে ঘুরছে রবিনের চোখ। 'মুসা, আমি ভেবেছিলাম হলবিয়রন্সনকে খুঁজে পেয়েছ তুমি।'

'না, গেইনিকে পেয়েছি। সুইমিং পুলে।'

'আজ আমার ছুটি,' গেইনি বলল। মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তারপর? তোমার এসকিমো পেয়েছ?'

'নাহ্। তবে অনেক ঘটনা ঘটেছে···' কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেল মুসা। চেপে গেল। কথা ঘুরিয়ে আরেক কথায় চলে গেল।

একধারে সরে এসে কফি টেবিল ঘিরে বসল সবাই।

কিশোরের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল টম, 'গেইনি কি কোন সাহায্য করতে পারবে? আইসল্যাণ্ডের অনেককেই নিশ্চয় চেনে।'

'ভাল বলেছ। পারতেও পারে।' স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকাল কিশোর। 'গেইনি,

একটা লোককে আমাদের খুব দরকার। তার নাম রেক্স মার, স্ভারট্‌ফিউগেল্ নামে একটা জাহাজের মালিক। আপনি চেনেন লোকটাকে? নামটাম শুনেছেন?'

'শুনেছি,' সহজ কণ্ঠে বলল গেইনি।

বিশ্বাস করতে পারল না রবিন। 'শুনেছেন?'

'আমার চাচার সঙ্গে পরিচয় আছে। তাকে বললেই দেখা করিয়ে দিতে পারবে।'

'আপনার চাচা?' টেবিলে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল মুসা।

'হ্যাঁ। আমার চাচা হুরন। আইসল্যাণ্ডিক কোস্ট গার্ডের হেড।'

'দারুণ! চমৎকার!' হাততালি দিয়ে উঠল রবিন। 'দিন না তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়েন প্লীজ!'

উঠে দাঁড়াল গেইনি। এগিয়ে গেল দেয়ালে লাগানো একটা টেলিফোনের কাছে। ডায়াল করে, কিছুক্ষণ আইল্যাণ্ডিকে কথা বলে ফিরে এসে বসল। 'পেয়েছি। অফিসেই আছে। গেলে যেতে পারো এখন।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, গেইনি,' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল কিশোর। 'আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে যাব। ততক্ষণ থাকবেন আপনার চাচা?'

'থাকবে। আমারও যাওয়া দরকার। একটা কাজ আছে।' কফি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল গেইনি। ছেলেদেরকে গুডবাই জানিয়ে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। হোটেলের সামনেই পার্ক করা আছে তার গাড়ি।

আবার ঘরে ফিরে এল ছেলেরা। এমি যে এসেছিল, তার সঙ্গে গিয়েছিল ক্যাপ্টেন গুরুনসনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, সে কথা মুসা আর টমকে জানানো হলো। রেডিও অন করল আবার কিশোর। মেসেজ পাঠাতে শুরু করল মিস্টার সাইমনকে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই যোগাযোগ হয়ে গেল, সাড়া দিলেন তিনি। একজন নকল হলোবিয়রন্‌সনকে খুঁজে পেয়েছে সে কথা জানাল কিশোর।

মিস্টার সাইমনও ওদিককার খবর জানালেন। আইসল্যাণ্ডের কিছু সরকারী কর্মকর্তা এখন জেনে গেছেন, মহাকাশচারী নিখোঁজের কেসে কাজ করছে তিন গোয়েন্দা। জনৈক হামফ্রে ডেভিডের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন ছেলেদের। লোকটার বাড়ি রুমানিয়ায়, কয়েকটা দেশের জাল পাসপোর্ট আছে তার কাছে। মহাকাশচারী নিখোঁজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। নকল হলবিয়রন্‌সনের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মেলে মিস্টার এক্স নামে এক লোকের সঙ্গে। নানা কুকাজে জড়িত থাকার বদনাম আছে তার।

দেয়াল আলমারিতে রেডিওটা ভরে রাখল কিশোর।

রবিন বলল, 'যা বোঝা যাচ্ছে, ডেভিড একজন স্পাই। আমাদের নকল হলবিয়রনসন ওরফে মিস্টার এক্সও তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকতে পারে। মহাকাশচারী মেজর পিটারকিনকে হয়তো সে-ই কিডন্যাপ করেছে।'

'করতে পারে,' কিশোর বলল। 'মেজরকে কিডন্যাপ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল হয়তো প্রথমে। তারপর আমরা এলে আমাদেরকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ পেয়েছে। কোনভাবে আন্দাজ করে ফেলেছে, আমরা মেজরের কেসের তদন্ত করছি।'

'এখন কি করা?' জিজ্ঞেস করল টম।

'যা করতে যাচ্ছিলাম। গেইনির চাচার সাথে দেখা করব। তুমি আর মুসা হোটেলে থাকো, যন্ত্রগুলো পাহারা দাও। আমি আর রবিন যাচ্ছি।'

ট্যাক্সি নিয়ে মিস্টার হুরনের অফিসে চলে এল দুই গোয়েন্দা। সাগরের ধারে সেলিয়াভেগ এলাকায় অফিসটা। কোস্টগার্ড হেডকোয়ার্টারের আইসল্যাণ্ডিক নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রায় দাঁত ভাঙার জোগাড় হলো রবিনের। বিড়বিড় করে পড়ল, 'ল্যাণ্ডহেলজিসগেইজলান। বাপরে বাপ! রোজ এই নাম বলতে হলে অর্ধেক আয়ু ফুরিয়ে যাবে।'

ভেতরে ঢুকতেই একটা ডেস্ক পড়ল সামনে। ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল, 'তিন গোয়েন্দা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু রবিন মিলফোর্ড। আমেরিকা থেকে এসেছি।'

'ক্যাপ্টেন হুরন অপেক্ষা করছেন।' চেয়ার থেকে উঠে এল ক্লার্ক। 'এসো, এদিক দিয়ে।'

একটা ঘরে ওদেরকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল সে। জাহাজের কেবিন যেভাবে সাজানো হয়, অনেকটা সেভাবে সাজানো ঘরটা। দেয়ালে ঝোলানো সাগরের ছবি, টেবিলের এক কোণে শোভা পাচ্ছে জাহাজের একটা মডেল। বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে ছিলেন ধূসর-চুল, লম্বা, সুদর্শন একজন মানুষ, ওদেরকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদেরকে চেয়ার দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমরাই তাহলে তিন গোয়েন্দা। আরেকজন কোথায়? এত অল্প বয়েস ভাবিনি।'

'হোটেলে রেখে এসেছি,' জানাল কিশোর।

রবিন বলল, 'আমাদেরকে কি ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে আপনার...'

'না না, তোমাদের বয়েসী বেশ কিছু গার্ড আছে আমাদের। পনেরো বছর বয়েসে ভর্তি হয়। আঠারো-উনিশ হতে হতে ওস্তাদ নাবিককেও ছাড়িয়ে যায়। ওরা এই বয়েসে নাবিক হতে পারলে তোমরা গোয়েন্দা হতে পারবে না কেন? বুদ্ধিটাই আসল, বয়েসটা কোন ফ্যাক্টর না।'

ভদ্রলোককে পছন্দ হয়ে গেল কিশোর আর রবিনের। অপরিচিত জায়গায় একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসার দ্বিধা দ্বিধা ভাব একটু ছিল, তাঁর কথায় আর বিন্দুমাত্র রইল না সেটা, সহজ হয়ে গেল।

হেসে বলল রবিন, 'খুব ভাল একজন ভাস্তি পেয়েছেন আপনি।'

'অনেকেই বলে সেকথা,' রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন হুরন, 'বিশেষ করে ছেলেরা।...হ্যাঁ, কি জন্যে এসেছ বলো এখন।'

'রেক্স হলবিয়রনসন নামে একজন লোকের খোঁজ জানতে,' কিশোর বলল। 'একজন রেক্সকে পেয়েছি, স্ভারট্ফিউগেল নামে একটা জাহাজের মালিক।'

'দাঁড়াও, দেখি,' চেয়ার থেকে উঠে দেয়ালে ঝোলানো একটা ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হুরন। 'জাহাজটা এখন সম্ভবত স্নেইফেলইয়োকুলের কাছে মাছ

ধরছে।'

'ওই নামের তো একটা হিমবাহ আছে শুনেছি,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, ওটাই। পড়াশুনা ভালই করো মনে হয়।'

হাসল শুধু রবিন।

'তীর থেকে বেশি দূরে না,' হুরন বললেন। 'ওখানে তোমাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারব।'

এতটা আশা করেনি ছেলেরা। অনেক বেশি পেয়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল কিশোরের। 'কি ভাবে যাব?'

'মেটিঅরল্যাগানে করে। নাবিক হয়েছ কখনও?'

'হয়েছি।'

'গুড।' টেবিলে রাখা জাহাজের মডেলটা দেখিয়ে বললেন হুরন, 'এটা মেটিঅরল্যাগানের খুদে সংস্করণ। কাল পেট্রলে বেরোবে জাহাজটা।'

'আর্কটিক পেট্রল, তাই না?'

একটা মুহূর্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন হুরন। তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ।'

'ফিরব কি করে?' জানতে চাইল রবিন, 'ওই জাহাজেই?'

'ওটার ফিরতে অনেক সময় লাগতে পারে। তবে তোমাদের অসুবিধে হবে না। ডগলাসবারকে পেয়ে যেতে পারো। ছোট আরেকটা জাহাজ। দুই হপ্তার ট্যুর শেষ করে কেফ্লাভিকে ফেরত আসছে।' আবার চেয়ারে বসে ছেলেদের দিকে তাকালেন হুরন। 'ভাল কথা, তোমরা মেজর রালফ পিটারকিনের কেসে কাজ করছ, তাই না?'

কিশোর বলল, 'আপনি জানেন!'

'জানব না কেন, কোস্ট গার্ডের লোক যখন। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। টপ সিক্রেট ব্যাপার। সিভিলিয়ানদের জানার কথা নয়। তারপরেও তোমাদের যখন জানানো হয়েছে, নিশ্চয় তোমরা কাজের লোক।' কিশোর আর রবিনের দিকে তাকালেন তিনি, 'কিছু বের করতে পেরেছ?'

'একটা সূত্র পেয়েছি।' সালফারের গর্তের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া চামড়ার দস্তানাটার কথা জানাল কিশোর। কেফ্লাভিকের আমেরিকান বেজ থেকে আরেকটা দস্তানা জোগাড় করে যে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষা করে এসেছে সে কথাও বলল।

'নাহ্, সত্যিই তোমরা অভিজ্ঞ লোক, বিশ্বাস বাড়ছে আমার। অবশ্য, মিস্টার সাইমন ফালতু কাউকে পাঠাবেন না, সে তো জানা কথাই। সালফারের গর্তের কাছে তদন্ত করে এসেছে পুলিশ। তোমরা পেয়েছ তার পরে। এর কি জবাব?'

'একটাই জবাব, মিস্টার পিটারকিন আবার ওখানে গিয়েছিলেন, পুলিশ তদন্ত করে আসার পর। তখন দস্তানাটা পড়েছে। হয়তো এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন ওখানে, যা জানার জন্যে ফেরত নিয়ে গিয়েছিল কিডন্যাপাররা। ভয় দেখিয়েছে, গোপন তথ্য না বললে গর্তে ফেলে দেবে। তখন ধস্তাধস্তি হয়, খুলে পড়ে যায় দস্তানাটা।'

'তা হতে পারে। সম্ভাবনাটা ফেলনা নয়। পুলিশকে জানাব।'

পরদিন বেলা দুটোয় ওদেরকে অফিসে যেতে বললেন হুরন। মেটিঅরলুগানের ক্যাপ্টেন হুগুরাডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

হুরনকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে।

হোটেলে ফিরে দেখল, উত্তেজনায় ফুটছে মুসা আর টম।

'এই যে,' একটা খাম বাড়িয়ে দিল মুসা, 'বিজ্ঞপ্তির আরেকটা জবাব।'

খামটা খুলল কিশোর। চিঠি পড়ে জানা গেল, হাফনারফিয়রডুরে বাস করে আরেক হলবিয়রনসন। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সে, 'দুজনের কথা জানলাম। কোন দিকে যাব?'

'মিস্টার হুরন কি বললেন?' জানতে চাইল টম।

'কাল কোস্ট গার্ডের একটা জাহাজে তুলে দেবেন, রেক্স মারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়ার জন্যে,' রবিন জানাল।

'বাহ্, ভাল এগিয়েছে! গুড। তুমি আর কিশোর যাচ্ছ?'

'এখনও ঠিক করিনি,' কিশোর বলল।

'এক কাজ করতে পারি,' মুসা বলল। 'তোমরা স্নেইফেলে যাও, আমি আর টম হাফনারে যাই।'

'চমৎকার প্রস্তাব!' নিজের উরুতেই চাপড় মারল কিশোর। 'দুই দল দু'দিকে গেলে খুব ভাল হয়। তবে জাহাজ আর সাগরের ব্যাপারটা যেহেতু তুমি সব চেয়ে ভাল বোঝ, তুমিই আমার সঙ্গে চলো।'

কারও আপত্তি নেই।

পরদিন সকালে উঠেই রওনা হয়ে গেল রবিন আর টম। কিশোর আর মুসা বেরোল দুপুরে। ঘুমিয়ে, বিশ্রাম নিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। ঠিক সময়ে এসে হাজির হলো ক্যাপ্টেন হুরনের অফিসে। মুসার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর।

লম্বা সুদর্শন আরেকজন মানুষের সঙ্গে তাদের পরিচয় হলো সেখানে। মেটিঅরলুগানের ক্যাপ্টেন হুগুরাড। দুই গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলানোর পর কয়েকটা জরুরী কথা বললেন হুরনের সঙ্গে। তারপর গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে বললেন, 'চলো, যাই।'

ওদেরকে বন্দরে নিয়ে এলেন হুগুরাড। ধবধবে সাদা একটা কাটার জাতের জাহাজ মেটিঅরলুগান।

'আরিব্বাবা,' কিশোর বলল, 'অনেক বড় তো!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, 'বড়ই। দুশো ষাট ফুট লম্বা, নয়শো বিশ টন।'

ডক থেকে মইয়ে করে জাহাজে উঠল ওরা। ডেকের সামনের অংশের ৫৭ এম এম কামানটার ওপর চোখ পড়ল। গান ডেকের পেছনে আরেকটু নিচুতে রাখা হয়েছে বড় একটা রবারের ভেলা, ওটার দু'পাশে দুটো বুলেট আকৃতির পনটুন।

ভেলাটার দিকে ছেলেদেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হুগুরাড বললেন, 'খারাপ আবহাওয়ায় এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে যেতে ওটা ব্যবহার করি আমরা।'

অনেকগুলো কম্প্যানিয়নওয়েতে ওঠানামা করে করে ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু একটা কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। এটা ওদের থাকার জায়গা। সামনে সুন্দর করে সাজানো ওয়ার্ডরুম, বাঁয়ে ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টার।

'এই তোমাদের ঘর, আরাম করে থাকো,' বললেন তিনি। 'সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।'

'সঙ্কোচ করছিও না আমরা,' হেসে বলল মুসা। 'আচ্ছা, স্ভারট্‌ফিউগেলকে খুঁজে পাওয়া যাবে তো?'

'তা যাবে, বিদেশী পোচারদের পাল্লায় যদি না পড়ি।'

'বিদেশী পোচার মানে?'

বুঝিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। উপকূলের বারো মাইল সীমানার মধ্যে ইদানীং কিছু কিছু বিদেশী মাছধরা জাহাজ বেআইনীভাবে ঢুকে পড়ছে। রাডারে ধরা পড়ে ওগুলোর অস্তিত্ব।

'তারপর কি করেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বন্দরে ধরে নিয়ে যাই। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অবশ্য করে। কিন্তু আমাদের কডফিশের সঙ্গে পারে না।'

কাটারটারই ডাকনাম রাখা হয়েছে কডফিশ অর্থাৎ কডমাছ, বুঝতে পারল কিশোর।

জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখল গোয়েন্দারা। ওদেরই বয়েসী কয়েকজন নাবিককে দেখল হোসপাইপ দিয়ে জাহাজের ডেক ধুচ্ছে। কয়েকজন ইংরেজী বলতে পারে। ওদের সঙ্গে কথা বলল ওরা। কিভাবে ট্রেনিং নিয়েছে, ভবিষ্যতে কি করবে এসব কথা।

জাহাজ ছাড়ল। রেলিঙে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর আর মুসা। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে তীর থেকে, ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে ঝলমলে রঙিন বাড়িঘরগুলো।

'আমার খুব ভাল লাগছে,' মুসা বলল।

হাসল কিশোর। 'আমারও। আরও ভাল লাগবে যদি রেক্স হলবিয়রন্‌সনকে খুঁজে পাই।'

সূর্য ডোবে ডোবে সময়ে দিগন্তে দেখা দিল স্নেইফেল হিমবাহ। নগ্ন, রুক্ষ, চোখা ফলাওয়ালা উঁচুনিচু হিমবাহটাকে যেন ধুয়ে দিচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের কমলা আলো। এত সুন্দর দৃশ্য, চোখ ফেরানো যায় না।

মুগ্ধ হয়ে দেখছে ওরা, ডাক দিলেন হুগুরাড। ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন। ওরা তাকাতেই হাতের ইশারায় কাছে যেতে বললেন। দ্রুত একটা মই বেয়ে তাঁর কাছে উঠে গেল ওরা।

'ওই দেখো!' দূরবীনে চোখ রেখে তিক্ত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'একটা পোচার!' কিশোরের হাতে যন্ত্রটা দিলেন তিনি।

যন্ত্রটা এত শক্তিশালী, মনে হলো লাফ দিয়ে একেবারে সামনে চলে এল ফিশিং ট্রলারটা, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা, নাম পিটার।

জাহাজটার এমাথা ওমাথা ভাল করে দেখল কিশোর। ডেকে পাঁচজন নাবিক।

একজনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'মুসা, সেই লোক!'

'কোন লোক?'

'হামফ্রে ডেভিড! বাজি ধরে বলতে পারি!'

এগারো

কিশোরের হাত থেকে দূরবীনটা প্রায় ছিনিয়ে নিল মুসা। ঠিকই বলেছে কিশোর। সেই লোকটাই, নকল হলবিয়রনসন।

'লোকটাকে চেনো মনে হয়?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'ওকে আমরা খুঁজছি। *ওয়ানটেড!*'

কঠিন এক চিলতে হাসি ফুটল হুগুরাডের ঠোঁটে। 'পুরো জাহাজটাই ওয়ানটেড। বেআইনী ভাবে ঢুকেছে আমাদের সীমানায়।'

রেডিওতে মেসেজ পাঠানো হলো পিটারের কাছে, থামার নির্দেশ। দূরবীন এখন হুগুরাডের হাতে।

'পালাচ্ছে, পালাচ্ছে!' চিৎকার করে বলল কিশোর। থামেনি পিটার, নাক ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করেছে খোলা সাগরের দিকে।

পোচারটার এভাবে ছুটে পালানো দেখে অবাক হলেন না হুগুরাড। এটাই করবে, জানা আছে তাঁর, কোন পোচারই সহজে ধরা দিতে চায় না। শান্তকণ্ঠে 'ফুল স্পীড' দেয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

জাহাজকে তাড়া করেছে জাহাজ, ভীষণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। ওরকম একটা ট্রলারের অতটা গতি আশা করেনি। পেছনে সবজে-সাদা বড় বড় ঢেউ তুলে ছুটে যাচ্ছে পশ্চিমে। কিন্তু যত জোরেই ছুটুক, মেটিঅরলুগানের মত একটা কাটারের সঙ্গে পেরে ওঠার শক্তি ওটার নেই। দূরত্ব কমতে লাগল।

অবশেষে পাশাপাশি হলো দুটো জাহাজ। একটা লাউড-হেইলার মুখে লাগিয়ে ট্রলারটাকে থামার নির্দেশ দিলেন হুগুরাড, যাতে ওটাতে উঠতে পারেন। বললেন, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট!'

আর কিছু করার নেই, নির্দেশ মানতে বাধ্য হলো ট্রলারটা। দু'জন সী-ম্যান আর কিশোর ও মুসাকে নিয়ে ওটাতে উঠে গেলেন হুগুরাড।

ভাঙা ইংরেজিতে ট্রলারের ক্যাপ্টেন বলল, 'আমাদের ওভাবে থামাতে পারেন না আপনি। বেআইনী কাজ করেছেন।'

'আপনারা আইসল্যাণ্ডের সীমানায় ঢুকে মাছ ধরছেন,' জবাব দিলেন হুগুরাড, 'বেআইনী কাজটা কে করল? আমরা, না আপনারা?'

'আপনাদের উপকূল থেকে তেরো মাইল দূরে ছিলাম আমরা।'

'মিথ্যে কথা বলছেন কেন? বড়জোর দশ মাইল।' কঠোর গলায় প্রশ্ন করলেন হুগুরাড, 'আর আপনারা অত সাধুই যদি হবেন তো পালাচ্ছিলেন কেন? থামতে বলা হয়েছিল তো?'

'আপনার মেসেজ পাইনি।'

'তাহলে রেডিও মেরামত করিয়ে নিন। আরেকটু হলেই কামান দাগার অর্ডার দিতাম আমি।'

পোচারের ব্রিজে চলে এলেন হুগুরাড। জাহাজের রেজিস্ট্রেশন আর অন্যান্য কাগজপত্র দেখাতে বললেন।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল পোচারের ক্যাপ্টেন। 'দেখুন, কাজটা ঠিক করছেন না...'

'কাগজপত্র দেখান!' বরফের মত শীতল হয়ে উঠল হুগুরাডের কণ্ঠ। দুই সহকারী আর দুই গোয়েন্দাকে বললেন 'ওয়ানটেড' লোকটা অর্থাৎ ডেভিডকে খুঁজে বের করতে।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। কিশোররা আশা করেছিল যে কোন মুহূর্তে যে কোন আলমারি কিংবা লকার থেকে বেরিয়ে পড়বে লোকটা। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে বেরোল না। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন টাকমাথা স্পাই।

'কোন কিছুতে ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?' নিচু গলায় মুসাকে বলল কিশোর।

'জাহাজের তলায়?'

'অসম্ভব না।'

মানুষ ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখা যায় নিচে সে রকম কোন জিনিস আছে কিনা রেলিঙে ঝুঁকে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখল গোয়েন্দারা। কিছুই চোখে পড়ল না। শেষে কিশোর বলল, 'চলো, আরেকবার ক্রুদের কেবিনে খুঁজে দেখি।'

প্রতিটি বাংকের ম্যাট্রেস ভালমত উলটে-পালটে দেখা হলো নিচে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। দেয়ালের কাছ ঘেঁষে রাখা একটা কম্বলের ফাঁকে এক টুকরো কাগজের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের। দুই আঙুল ঢুকিয়ে ওটা ধরে টেনে বের করে আনল। আইসল্যাণ্ডের একটা খবরের কাগজের কাটা টুকরো। লেখার দিকে একবার তাকিয়েই বলে উঠল 'আরে, দেখো দেখো!'

'খাইছে! এ তো আমাদের বিজ্ঞপ্তি!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিল মুসা। নিচু গলায় বলল, 'এটার জবাবই দিয়েছিল ডেভিড।'

'তার মানে ওকেই দেখেছি আমরা, ভুল করিনি,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় জাহাজটায় করে রেক্স মারকে খুঁজতে এসেছে।'

'কিন্তু গেল কোথায়? আশ্চর্য!'

কাগজটার কথা গোপন রাখতে বলে দিল কিশোর। মাথা কাত করল মুসা।

ব্রিজে ফিরে এল ওরা।

হুগুরাড জিজ্ঞেস করলেন, 'পেয়েছ?'

'না। পেলাম না,' জবাব দিল কিশোর। তাকিয়ে রয়েছে পোচারের ক্যাপ্টেনের দিকে।

মুখের একটা পেশীও নাড়ছে না লোকটা। চোখে শীতল দৃষ্টি, ভীষণ রেগে আছে। ডেভিডের কথা যে আলোচনা হচ্ছে, শুনছেই না যেন। না চেনার ভান করছে।

কাটারের রেলিঙে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে হুগুরাডের ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। তাকে বললেন, 'মেরানসন, বোটটা রেকিয়াভিকে নিয়ে যাও। আমরা পিছে পিছে আসছি।'

কোন রকম চালাকি করলে বিপদ হবে, বন্দিদেরকে সতর্ক করে দিয়ে কিশোরদের নিয়ে কাটারে ফিরে এলেন হুগুরাড।

ট্রলারের মুখ ঘোরানো হলো। আইসল্যাণ্ডের রাজধানীর দিকে চালানো হলো ওটাকে। অনুসরণ করে চলল মেটিঅরলুগান।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে দুই গোয়েন্দা। কিশোর বলল, 'এখন ওদের কি করা হবে?'

'জরিমানা। মাছ যা ধরেছে সব বাজেয়াপ্ত।'

'রেক্স মারকে খোঁজার কি হবে?'

চওড়া হাসি ফুটল হুগুরাডের ঠোঁটে। 'হবে।'

'কি ভাবে?'

'রাত দুটোয় ডগলাসবার পাশ কাটাবে আমাদের। তোমাদেরকে ওটাতে তুলে দেব।'

'ও,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'থ্যাংক ইউ, স্যার।'

'কিন্তু পোচারে যত সহজে চড়েছ ওটাতে চড়া অত সহজ হবে না। সাগর দেখছ কেমন অশান্ত হয়ে উঠছে? ভেলায় করে তোমাদের পার করে দিতে হবে।'

ঢেউ বাড়ছে। যতই বাড়ছে ততই দুলছে মেটিঅরলুগান। ওদিকে রাত বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের বেগ।

'অবস্থা ভাল না,' ক্যাপ্টেন বললেন 'তবে তোমাদের নিশ্চয় অসুবিধে হবে না?'

'না,' জবাব দিল মুসা। 'এর চেয়ে অনেক বেশি ঝড়ের মধ্যে পড়েছি আমরা দক্ষিণ সাগরে। এখন তো আধুনিক জাহাজে রয়েছি। তখন স্কুইডের শুঁড় দিয়ে বাঁধা নারকেল গাছের ভেলায় চড়ে পাড়ি দিচ্ছিলাম প্রশান্ত মহাসাগর।'

অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন হুগুরাড।

অথৈ সাগর পাড়ি দিয়ে মরুদ্বীপে মুক্তো খুঁজতে যাওয়ার গল্প শোনাল মুসা। মুগ্ধ হয়ে শুনলেন ক্যাপ্টেন। নতুন দৃষ্টিতে তাকালেন গোয়েন্দাদের দিকে। সাধারণ ছেলে নয় ওরা! ভাবলেন, এমন ছেলে জন্ম দিতে পারা যে কোন দেশের ভাগ্য।

সাংঘাতিক দুলছে এখন জাহাজ। ঢেউয়ের তালে তালে কাত হয়ে যাচ্ছে একবার এপাশে একবার ওপাশে। পেটের মধ্যে মোচড় দিতে আরম্ভ করল মুসার। শঙ্কিত হলো, বড় বড় গল্প তো করেছে, এখন সী-সিক হয়ে পড়লে ক্যাপ্টেনের কাছে আর মান-ইজ্জত থাকবে না।

ডিনারের ঘণ্টা বাজল। ক্রুদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে ডিনার খেলো দুই গোয়েন্দা, ভেড়ার মাংসের রোস্ট আর সেদ্ধ আলু। কফি এল। দুধ-চিনি ছাড়া কালো ফুটন্ত কফি। খাওয়ার পর বমি বমি ভাবটা চলে গেল মুসার। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আবার ডেকে ফিরে এল সে আর কিশোর। বাতাস যেমন

বেড়েছে, ঢেউও বেড়েছে। উথালপাতাল অবস্থা। অত বড় জাহাজটা যেন একটা বাদামের খোসা, সেটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলার জন্যে তৈরি হচ্ছে সাগর।

হুগুরাড বললেন, 'শুয়ে পড়োগে। সময় মত ডেকে দেয়া হবে।'

নিজেদের কেবিনে চলে এল দুই গোয়েন্দা। শুয়ে পড়ল যার যার ডেকে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। কিশোরের মনে হলো, সে কেবল শুয়েছিল, পরক্ষণেই তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে তাকে সজাগ করে দেয়া হয়েছে।

'এসো,' ডাকলেন ক্যাপ্টেন, 'সময় হয়েছে। ব্যাগ-ট্যাগগুলো গুছিয়ে নাও।'

'গোছানোই আছে,' বলে বাংক থেকে লাফ দিয়ে নামল কিশোর। 'কিছুই খোলা হয়নি।'

খোলা ডেকে বেরোতেই যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল বাতাস। হিমবাহের বরফের ওপর দিয়ে বয়ে আসা হাড়কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা নাক দিয়ে যেন ধারাল ছুরির ফলার মত চিরে ঢুকল। একটু ঝিমুনি ভাব যা ছিল কিশোরের, একেবারে দূর হয়ে গেল।

দূরে একটা জাহাজের আলো উঠছে-নামছে। মনে হচ্ছে যেন ঢেউয়ের মধ্যে ডুবছে আর ভাসছে। ওটা যে ডগলাসবারের আলো সে কথা আর বলে দিতে হলো না ছেলেদেরকে।

আলো জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

মাস্তুলের মাথায় বসানো একটা সার্চলাইট জ্বলে উঠল, উজ্জ্বল হলদে আলো ছড়িয়ে দিল উত্তাল সাগরের পানিতে।

'ওই যে ভেলা আসছে,' আঙুল তুলে দেখালেন হুগুরাড।

কিশোররা দেখল, মেটিঅরলুগানের ডেকে যেমন দেখেছে অবিকল সে রকমই একটা ভেলা ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। হাবুডুবু খাচ্ছে যেন পানিতে। তিনজন নাবিক দাঁড় বেয়ে নিয়ে আসছে কাটারের দিকে।

মেটিঅরলুগানের এক জায়গার রেলিঙ তুলে দিয়েছে একজন নাবিক, ওটা সরানো যায়, পোচারে নামার সময়ই দেখেছে ছেলেরা। একটা লম্বা দড়ির একমাথা রেলিঙে বেঁধে আরেক মাথা হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে আছে আরেকজন নাবিক। ভেলাটা কাছে আসতেই ছুঁড়ে মারল।

'সব ঠিক আছে,' ছেলেদের সাহস জোগালেন ক্যাপ্টেন, 'কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

অবাক হয়ে ভেলাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সব ঠিক আছে কি ভাবে বুঝতে পারল না। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে উঠে আসছে ভেলা, প্রায় জাহাজের ডেকের সমান্তরালে, পরক্ষণেই ঝপ করে নেমে যাচ্ছে দশ ফুট নিচে।

ব্যাগ আঁকড়ে ধরে অপেক্ষা করছে দুই গোয়েন্দা। আবার উঠল ভেলা। তাতে পা দিল মুসা। সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা লিফটের মত তাকে নিয়ে নিচে নেমে গেল ভেলাটা। আবার যখন উঠল, কিশোর পা রাখল।

দড়ি ধরে রেখেছিল ভেলার একজন নাবিক। কিশোররা নামতেই ছেড়ে দিল। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দোল খেতে খেতে এগোল ভেলা।

বিশাল সাগরে নগণ্য একটা ভেলা। পাহাড়ের মত ঢেউগুলোর কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র মনে হলো কিশোরের। ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেল চাঁদ উঠেছে ডাঙার তুষারে ঢাকা পর্বতের মাথায়। এক ধরনের পানসে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে।

ভেলার নাবিকেরা সবাই অল্প বয়েসী। শক্ত হাতে দাঁড় টানছে। প্রতিবার তুলে আবার পানিতে ফেলার আগে চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠছে ভেজা দাঁড়।

সাগরে চোখ বোলাল কিশোর। ডগলাসবার জাহাজটাকে খুঁজছে। চোখে পড়ল। কালো এক ভয়ঙ্কর জলদানব যেন উদয় হলো দৃষ্টিপথে।

পাশে চলে এল ভেলা। কাটারের মতই ডগলাসবারেরও ডেকের রেলিঙের একটা অংশ সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সার্চলাইট জ্বলল। ওপর থেকে দড়ি ছুঁড়ে দেয়া হলো। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল একজন নাবিক। উঠে যেতে বলা হলো ছেলেদেরকে।

জাহাজের গায়ে যাতে বাড়ি না লাগে ভেলাটা তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নাবিকেরা। এমন ভাবে দড়ি আঁকড়ে ধরে রেখেছে, যেন এটা ধরে রাখার ওপরই তাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে।

হঠাৎ করেই ঘটে গেল ঘটনাটা। বিরাট এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল ভেলার ওপর। এমন সময় ভেঙেছে ঢেউটা যখন ভেলাটা রয়েছে দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের উপত্যকায়।

ভেলার ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঢেউটা। সরে যাওয়ার পর দেখা গেল কিশোর পাশা নেই।

বারো

সার্চ লাইটের আলোয় জাহাজের পাশে একটা মাথা ডুবতে-ভাসতে দেখা গেল। পরক্ষণেই ডুবে গেল আবার। সঙ্গে সঙ্গে ওই জায়গাটায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জন নাবিক। আরেকজন ধরে রাখল মুসাকে, যাতে ঢেউ তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, কিংবা মাথা গরম করে কিশোরকে বাঁচানোর জন্যে ঝাঁপ দেয়ার বোকামি না করে বসে।

সার্চ লাইট তো জ্বলছেই, শক্তিশালী টর্চের আলোও ফেলা হলো উত্তাল পানিতে। স্তব্ধ হয়ে গেছে মুসা, চিৎকার করার কথাও যেন ভুলে গেছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল, দু'পাশ থেকে কিশোরকে ভাসিয়ে রেখেছে দু'জন নাবিক। ভাগ্যিস কি করে যেন পড়ার আগে দড়িটা ধরে ফেলেছিল কিশোর, বেঁচে গেছে। চেহারা ফ্যাকাসে, চোখ বন্ধ।

প্রথমে ভেলায় তোলা হলো তাকে, তারপর দ্রুত টেনে তোলা হলো জাহাজের ডেকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই তার পাশে এসে দাঁড়াল মুসা।

ডগলাসবারের ক্যাপ্টেন অসকারের চেহারার মধ্যে চৌকো চোয়ালই সব চেয়ে আগে চোখে পড়ে। কিশোরকে ডেকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করলেন।

কয়েকবার মিটমিট করেই চোখ মেলল কিশোর। তুলে বসালেন ক্যাপ্টেন।

হেসে রসিকতা করলেন, 'ব্যাপার কি, উত্তর আটলান্টিকের সব পানি খেয়ে ফেলার ইচ্ছে হয়েছিল নাকি?'

'কি যে হয়েছিল কিছুই মনে নেই,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, শীতে কাঁটা দিল গায়ে। 'কেবল মনে আছে, ভারি পাথরের মত তলিয়ে যাচ্ছি।'

'চলো, নিচে চলো। জলদি কাপড় না বদলালে শীতেই মরে যাবে।'

মাথাটা তখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি কিশোরের। কাঁপতে কাঁপতে রওনা হলো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। ওদেরকে গরম কেবিনে নিয়ে এলেন তিনি। নাবিকদের পোশাক ছাড়া বাড়তি আর কিছু পাওয়া গেল না, সেটাই দেয়া হলো কিশোরকে। ভেজা কাপড় বদলে নিল সে। ওগুলোকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো শুকানোর জন্যে। তারপর তিনজনে এসে বসল ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে।

স্ডারট্ফিউগেলকে নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'বের করতে পারবেন?' এখনও দুর্বল তার কণ্ঠ।

'করে ফেলেছি। আমাদের চার্টে পাওয়া গেছে। সকাল বেলা তোমার নাস্তার টেবিলে হাজির করে দেয়া হবে ট্রলারটাকে,' রসিকতার সুরে বললেন ক্যাপ্টেন। হাসিখুশি বেশ আমুদে লোক।

কিশোর আর মুসাও হাসল। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ দিল তাঁকে। তারপর নিজেদের বাংকে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলে কানে এল নানা রকম শব্দ। প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে ডগলাসবার। গ্যাঙওয়েতে হাঁটাচলা, কথা, মাংস ভাজা আর কফির গন্ধ, এসবের সঙ্গে তুলনা করলে রাতের ঘটনাগুলোকে কেমন অবাস্তব লাগে।

ইতিমধ্যে কিশোরের কাপড়-চোপড় শুকিয়ে গেছে। দ্রুত পরে নিয়ে মুসাকে সহ বাইরে বেরোল। একজন নাবিককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল নাস্তা কোথায় দেয়া হয়েছে। চলে এল সেখানে।

রাতে পানিতে পড়া নিয়ে কিশোরকে ঠাট্টা করল একজন তরুণ নাবিক, যে দু'জন তাকে উদ্ধার করেছিল তাদের একজন, 'একেবারে সীলমাছ হয়ে গিয়েছিল, ধরে আর রাখতে পারি না, পিছলে নেমে যেতে যায়।'

তার কথায় হাসল কয়েকজন।

কিশোরও হাসিতে যোগ দিল। মানুষগুলো খুব ভাল, হাসিখুশি, আন্তরিক। চারকোণা একটা টেবিলে বসেছেন ক্যাপ্টেন অসকার, সেটাতে বসল সে আর মুসা।

দ্রুত আলাপ জমিয়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন। ওদের বাড়িঘরের খবর নিতে লাগলেন, কে কে আছে, গোয়েন্দাগিরি ছাড়া আর কিছু করে কিনা, ভবিষ্যতে কি হওয়ার ইচ্ছে, এসব।

ছেলেদের দেয়া হলো অল্প সেদ্ধ ডিম, সিরিয়াল আর দুধ। টেবিলে বড় একটা জগে রয়েছে কডলিভার অয়েল। নাবিকদেরকে সেটা খেতে দেখে দুই গোয়েন্দাও বড় এক চামচ করে গিলে নিয়ে দুধ খেয়ে তীব্র গন্ধটা দূর করল। গন্ধে আরেকটু হলেই বমি করে ফেলেছিল কিশোর। অথচ কি স্বাভাবিক ভাবে খেয়ে যাচ্ছে

নাবিকেরা। অভ্যাস, সব অভ্যাস, ভাবল সে। কিন্তু মুসার তো অভ্যাস নেই, তার কিছু হয় না কেন!

'এইবার ইচ্ছে করলে স্ভারট্‌ফিউগেলকে দেখতে যেতে পারো,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'জাহাজটা আমাদের নাকের ডগাতেই রয়েছে।'

তাড়াহুড়া করে ডেকে বেরিয়ে এল ছেলেরা।

অতি সাধারণ ছোট একটা ট্রলার, তেমন কোন বিশেষত্ব নেই, গোসলের অনেক বড় একটা গামলা যেন পানিতে ভেসে আছে। লাউড-হেইলার দিয়ে চেঁচিয়ে রেক্স মার আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'জা, জা,' জবাব এল।

অনেক শান্ত হয়ে পড়েছে সাগর। রাতের ঢেউয়ের কোন চিহ্নই নেই। ভেলার প্রয়োজন হলো না, পাশাপাশি রেখেই এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে চলে যাওয়া যায়।

স্ভারট্‌ফিউগেলের ডেকে নামল দুই গোয়েন্দা।

ডগলাসবারের ডেক থেকে ক্যাপ্টেন অসকার বললেন, 'যতক্ষণ ইচ্ছে কথা বলো। তাড়াহুড়া নেই, আমরা অপেক্ষা করছি।'

ছোট্ট বোটটায় মাত্র পাঁচজন নাবিক। নিচে রয়েছেন রেক্স মার, তাঁকে ডাকল ট্রলারের ক্যাপ্টেন।

উঠে এলেন জাহাজের মালিক, গায়ে গলাবন্ধ বাদামী সোয়েটার। দীর্ঘদিন সাগরের রোদ-বাতাসে কাটানোর ছাপ পড়ে গেছে চৌকো মুখের চামড়ায়। নাবিকের ক্যাপের নিচে ধূসর ঘন চুল।

হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। ওর হাতের তুলনায় রেক্সের হাতটা যেন ভালুকের থাবা।

'আমি কিশোর পাশা। আপনি ইংরেজি বলতে পারেন, মিস্টার মার?'

'পারি।'

মুসাও নিজের পরিচয় দিয়ে হাত মেলাল। 'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে...'

'কোন কথাটতা নেই, আমি পারব না!' বলেই চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরলেন মার।

'এক মিনিট, মিস্টার মার!' ডাকল কিশোর। 'কি পারবেন না?'

ঘুরে আবার তাকালেন বৃদ্ধ। ঘোলাটে নীল চোখে তাকালেন কিশোরের দিকে। 'পারব না যেটা তোমরা আমাকে করতে বলবে। আগেও আমাকে এই কাজ করতে বলা হয়েছে। তখন যেমন মানা করে দিয়েছি, এখনও দিচ্ছি।'

'মিস্টার মার, আপনাকে কিছু করতে বলব না আমরা। কিন্তু নিজের পরিচয় দিতে তো অসুবিধে নেই?'

একটা চোখ বন্ধ করে আবার খুললেন রেক্স। সন্দেহ ফুটল দৃষ্টিতে। 'আমার নাম রেক্স মার, ব্যাস। এই আমার পরিচয়।'

ডগলাসবারের রেলিঙে ঝুঁকে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ক্যাপ্টেন অসকার। মুখে মৃদু হাসি। আইসল্যাণ্ডিকে দ্রুত কিছুক্ষণ কথা বললেন রেক্স মারের সঙ্গে।

আস্তে আস্তে বদলে গেল বৃদ্ধের মুখের ভাব, 'কি জানতে চাও?'

'আমরা একজন রেক্স হলোবিয়রন্‌সনকে খুঁজছি,' কিশোর জানাল।

'কেন?'

'তাঁর জন্যে ইনশুরেন্সের টাকা রেখে যাওয়া হয়েছে।'

'কত টাকা?'

'তিন লাখ ডলার।'

'ও!' বিস্ময় দেখা দিল রেক্সের চোখে। 'আমার আসল নাম রেক্স হলোবিয়রন্‌সন। কিন্তু আমাকে কে অত টাকা দিয়ে যাবে?'

'হয়তো আপনার কোন বন্ধু,' নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর। 'আপনার নাম বদলালেন কেন? কবে, কেন বদলালেন?'

একটা বালতি তুলে নিয়ে উল্টো করে বসিয়ে তার ওপর বসলেন রেক্স। তারপর শুরু করলেন নাম বদলানোর ইতিহাস। ক্যাপস্ট্যানের গায়ে হেলান দিল কিশোর। শুনতে লাগল বৃদ্ধের গল্প।

রেক্স বললেন, ফ্রান্সের উপকূলে জাহাজডুবিতে প্রায় মরতে বসেছিলেন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করা হলো। বিদেশীরা অত লম্বা আর শক্ত নাম ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না, খালি বিকৃত করে ফেলে।

'স্পেনে গেলাম আমি,' বলে যাচ্ছেন রেক্স, 'ওখানে নাম বিকৃত হয়ে, হয়ে গেল আরেক রকম। আসলটার সঙ্গে কোন মিলই রইল না। একজন মানুষও ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারল না।'

মুচকি হাসল মুসা, 'তারপরই বদলে দিয়ে সহজ করে রেহাই পেলেন?'

'হ্যা। মার নামটা পছন্দ করার কারণ, এর মানে সাগর। নাম বদলের আরও কারণ আছে। আমার কাগজপত্রে উল্টোপাল্টা নাম দেখে কেউ কেউ আমাকে স্পাই সন্দেহ করে বসল,' নাকের একপাশ ঘষলেন রেক্স। 'এখনও আমাকে স্পাই ভাবে কিছু লোক।'

'কে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দু'জন। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'কেন?'

'একটা কাজ করে দেয়ার জন্যে। ওদের ধারণা, আমি আইসল্যাণ্ডের লোক হলেও বিদেশী সংস্থার টাকা খেয়ে দেশের সঙ্গে বেঈমানী করছি।' কি কাজ করাতে চেয়েছে, খুলে বললেন রেক্স। 'ওরা এমন একজনকে খুঁজছে, আইসল্যাণ্ডের উপকূল যার মুখস্থ। অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু কাজটা আমি নিইনি।'

কথাটা শুনে অবাক লাগল কিশোরের। এরকম লোক কার দরকার হলো, কি কাজের জন্যে? অনুরোধ করল, 'আবার যদি আসে, দয়া করে আমাদেরকে কি একটা খবর দিতে পারবেন?'

মুখ তুলে আবার ক্যাপ্টেন অসকারের দিকে তাকালেন রেক্স। ছেলেদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন। 'বেশ, জানাব। হ্যাঁ, টাকাটা কে রেখে গেছে বললে না?'

বৃদ্ধের কথায় তাঁকে সন্দেহ করার কিছু পেল না কিশোর। কে রেখে গেছে,

বলল।

নাম শুনে বদলে গেল বৃদ্ধের দৃষ্টি, যেন বহুদূরে কোথাও হারিয়ে গেছেন। বিড়বিড় করলেন, 'আমি উদ্ধার করলাম পানি থেকে, আর বাকি জীবনের জন্যে আমাকে উদ্ধার করে রেখে গেল সে···বুড়ো বয়েসে আর খেটে মরতে হবে না···'

ওদের সঙ্গে রেক্সকে যাওয়ার প্রস্তাব দিল কিশোর। বলল, 'কিছু কাগজপত্র সই করতে হবে আপনাকে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটা আপনাকে পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

নাবিকদেরকে ট্রলার নিয়ে তীরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন রেক্স। তারপর ছেলেদের সঙ্গে এসে উঠলেন ডগলাসবারে।

বিকেল শেষ তখন, সন্ধ্যা হয় হয়, এই সময় রেকিয়াভিক বন্দরে এসে ভিড়ল জাহাজটা। ক্যাপ্টেন অসকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রেক্সকে নিয়ে তীরে নামল দুই গোয়েন্দা। ট্যাক্সি নিয়ে শহরে চলে এল। রেক্সকে তাঁর বাসায় নামিয়ে দেয়া হলো। বাসায়ই তাকে থাকতে বলল কিশোর। যে কোন সময় দরকার হতে পারে।

হোটেলে ফিরে এল দু'জনে।

ওপর তলায় উঠে এসে ঘরের দরজায় থাবা দিল কিশোর। সাড়া নেই। তবে কি আসেনি? নিজেদের ঘরে এসে ডেস্কে ফোন করল রবিন বা টম কোন মেসেজ দিয়েছে কিনা জানার জন্যে।

জবাব শুনে তো ভিড়মি খাবার জোগাড় কিশোরের। আগের দিন নাকি বিলটিল সব মিটিয়ে দিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে ওরা।

'কিছু বলে গেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না।' একটা কথাই শুধু জানাতে পারল ক্লার্ক, ওরা চলে যাওয়ার খানিক আগে এমির সঙ্গে কথা বলেছিল।

এমিকে ফোন করল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'এমি, রবিনরা কোথায় গেছে?'

অবাক হলো এমি। 'সেটা তো তোমার জানার কথা! তোমার মেসেজ পেয়েই তো গেল!'

তেরো

'কই, আমরা তো কোন মেসেজ পাঠাইনি!' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। কিশোরের হাতে ধরা রিসিভারের কাছে কান নিয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছে সে-ও।

এমি জানাল, হাফনারফিয়রডুর থেকে বিফল হয়ে ফিরেছে রবিনরা। তারপর কিশোরের নাম লেখা একটা মেসেজ পেয়েছে, কোথাও দেখা করতে বলা হয়েছে ওদেরকে।

'ধাপ্পা দিয়েছে! পুরাপুরি ধাপ্পা! কোথায় দেখা করতে বলেছে জানো?'

'বলেনি। রবিন বলেছে, এটা নাকি গোপন ব্যাপার, বলা যাবে না।'

চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর। ডেভিডের চালাকি না তো? কায়দা করে ওদেরকে নিয়ে গেল, যাতে কিশোর আর মুসাকেও ধরতে পারে? বলল, 'এমি, ভাবো, ভাল করে ভেবে বলো। কোন কিছুই কি মনে করতে পারছ না? কোন সূত্রই নেই?

কোথায় যাচ্ছে ওরা কোন ইঙ্গিতই দেয়নি?'

ওপাশে নীরবতা। হঠাৎ বলে উঠল এমি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছে, দিয়েছে! টম বলছিল, সী-সিকনেসে ধরলে খাওয়ার জন্যে বড়ি নিয়ে যেতে হবে।'

'আর কিছু না?'

'আর?...আর, আর...নাহ্!'

'ঠিক আছে। মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে। ও-কে?'

'করব।'

লাইন কেটে দিল কিশোর।

'একটা ব্যাপার বোঝা গেল, জাহাজে করে কোথাও গেছে ওরা,' রবিন বলল।

'শিওর করে বলা যায় না।'

'যদি ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে উপকূলের কোথাও...এই কিশোর,' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন, 'স্লেইফেল হিমবাহের কাছে সেই রহস্যময় ডেলা, যেটা তুমি দেখেছিলে...'

ঝট করে মুসার দিকে ঘুরল কিশোর। 'আর দেরি করা যায় না! এখনই পুলিশ আর কোস্ট গার্ডকে জানাতে হবে।' আবার রিসিভার তুলে নিল সে।

পুলিশকে রিপোর্ট করার পর ক্যাপ্টেন হুরনকে ফোন করল কিশোর। তিনি জানালেন, পোচারদেরকে মোটা টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পিটার জাহাজটায় আবার ভালমত তল্লাশি চালানো হয়েছে। পাওয়া গেছে এক বাণ্ডিল নাইলনের দড়ি আর মাথায় বাঁধা একটা হুক। কেন ওটা জাহাজে রাখা হয়েছিল তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি পিটারের ক্যাপ্টেন। ডেভিডের সঙ্গে মেলে এরকম কোন লোক ছিল না জাহাজে।

রবিন আর টমের রহস্যময় নিরুদ্দেশের খবরটা হুরনকে দিল কিশোর।

'আজ রাতে আবার টহলে বেরোচ্ছে মেটিঅরলুগান,' ক্যাপ্টেন জানালেন। 'আইসল্যাণ্ডের সীমানায় যতটা সম্ভব তল্লাশি চালানোর ব্যবস্থা করব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন।'

লাইন কেটে দিয়ে মুসাকে খবরটা জানাল কিশোর। 'দড়ি এবং হুক...নিশ্চয় কিছু টেনে নিতে ব্যবহার করেছে।'

'কিন্তু পিটারের পেছনে কোন নৌকা ছিল না।'

'সেটাই তো রহস্য!'

'এখন কি করা যায়?'

'আগে খেয়ে নিই চলো। তারপর মিস্টার সাইমনের সঙ্গে কথা বলব।'

খেয়ে এসে রেডিও নিয়ে বসল কিশোর। সাইমন রয়েছেন টেকসাসে। যোগাযোগ করতে অসুবিধে হলো না।

রেক্স হলোবিয়রনসনকে পাওয়া গেছে শুনে খুশি হলেন সাইমন। একটা দলিলে সই করাতে হবে রেক্সকে, কি লিখতে হবে বলে দিলেন তিনি। একটা সাদা কাগজে সেগুলো পরিষ্কার করে লিখে রেক্সকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেই হবে। সব শেষে রবিন ও টমের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদটা দিল কিশোর।

শুনে সাইমনও চিন্তিত হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মহাকাশচারীর নিরুদ্দেশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে; ডেভিডকে পেলেই রবিনদেরকেও পাওয়া যাবে।

সাইমনের সঙ্গে কথা শেষ করে মুসাকে নিয়ে আলোচনায় বসল কিশোর। কিন্তু রবিনদেরকে খুঁজে বের করার কোন উপায়ই দেখতে পেল না।

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে মুসা বলল। 'সী-সিক পিলের কথা যখন বলেছে রবিন, জলপথেই কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদেরকে। কোন জাহাজে-টাহাজে থাকতে পারে। কিন্তু কোন জাহাজ না জানলে খুঁজব কি করে? সাগরের সমস্ত জাহাজকে তো আর তাড়া করে বেড়ানো যাবে না।'

'ডেভিডকে পেলে রবিনদেরও পাওয়া যাবে, এ ব্যাপারে আমিও একমত। কিন্তু কোথায় আছে লোকটা?'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'কি আর করা, হাতে যে কাজটা আছে সেটাই আগে সারি। চলো, দলিলে রেক্স মারের সই নিয়ে আসি।'

হোটেল থেকে নাবিকের বাসা বেশি দূরে না। হেঁটেই চলে এল ছেলেরা।

দোতলার একটা বড় ঘর নিয়ে থাকেন তিনি। ছেলেদের দেখে খুশি হলেন। ওদেরই অপেক্ষা করছিলেন। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা নিয়ে টেবিলে নামিয়ে রেখে হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে নিজে আবার গিয়ে বসলেন তাঁর সোফায়, ধোঁয়ার রিঙ ওড়াতে থাকলেন।

'সুখী লোক আপনি, মিস্টার মার,' হেসে বলল কিশোর।

'তাই মনে হচ্ছে? হবই তো, এখন আমি বড়লোক।'

'হননি এখনও,' মুসা বলল, 'তবে হবেন। কিছু কাগজ সই করার পর।' দলিলটা বের করে দিল সে।

কাগজটা নিয়ে প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে পড়লেন রেক্স। তারপর কলম বের করে সই করে দিলেন লেখার নিচে।

'আমেরিকায় বীমা কোম্পানির কাছে যাবে এটা,' কিশোর বলল। 'কয়েকটা ফর্মালিটি শেষ করেই টাকাটা দিয়ে দেবে আপনাকে।'

'ফাইন,' জবাব দিলেন রেক্স। সরাসরি তাকালেন কিশোরের দিকে। 'ও, একটা জরুরী কথা, ওরা আবার এসেছিল।'

'কারা?'

'ওই যে, যারা আমাকে স্পাই সন্দেহ করে। তোমরা জানাতে বলেছিলে না, তাই বললাম।'

সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'কি বলল?'

'বোটে করে একটা জিনিস পার করে দিয়ে আসতে হবে এদেশ থেকে। কি জিনিস বলেনি। আমার ধারণা, বেআইনী কিছু।'

'আপনি কি বললেন?'

'বললাম, ভেবে দেখব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসবে ওরা জবাব জানতে। আমি তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় তোমরাই চলে এলে।'

'লোকগুলো দেখতে কেমন?'

'একজন খাটো, টাকমাথা। আরেকজনের কালো চুল, নাকটা বেশি লম্বা। আসার সময় হয়ে গেছে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ডেভিড আর তার দোস্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে চেহারার বর্ণনা।

'বলো তো কি জবাব দিই?' পরামর্শ চাইলেন রেক্স।

'রাজি হয়ে যান,' কিশোর বলল।

'বেআইনী কাজ করতে বলছ!'

'বলছি এই জন্যে, আপনার সাহায্যে হয়তো জঘন্য একটা অপরাধের কিনারা করতে পারব আমরা।'

'বেশ, তোমরা যখন বলছ, করব। যাও এখন। আমি তোমাদের ফোন করব।'

এদিক ওদিক তাকাল মুসা। 'আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা।' বড় একটা আলমারি দেখাল সে, 'ওটাতে ঢুকে থাকতে পারি। লোকগুলো কি বলে শোনা যাবে। কি বলেন?'

পাইপে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়ার রিঙ ছাড়লেন রেক্স। মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মন্দ হয় না।'

উঠে গিয়ে টান দিয়ে আলমারির পাল্লা খুললেন তিনি। পুরানো কাপড়ের পুরানো গন্ধ বেরোতে লাগল। এক কোণে রাখা কয়েকটা স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লায়ার্স, এসব যন্ত্রপাতি। ভেতরে অনেক জায়গা। ঢুকে পড়ল দুই গোয়েন্দা। দরজার নিচে সরু ফাঁক আছে, সেটা দিয়ে বাতাস আসবে, শ্বাস নিতে অসুবিধে হবে না।

রেক্স বললেন, 'বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হবে না। ওরা এলে যত জলদি জলদি পারি বিদেয় করে দেব।'

ভেতরে প্রচুর ধুলো। তার ওপর ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে পাইপের ধোঁয়ায়। কাশতে শুরু করল কিশোর। মুসারও গলা জ্বলছে।

দরজার ঘণ্টা বাজল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই লোকগুলোকে নিয়ে রেক্সের ফিরে আসার শব্দ হলো। কথা বলল একটা লোক, হামফ্রে ডেভিডের গলা, কোন সন্দেহ নেই।

দম প্রায় বন্ধ করে রেখেছে কিশোর আর মুসা। ভয় যেন নিঃশ্বাসের শব্দও চলে যাবে শত্রুদের কানে।

'অনেক ভেবে দেখলাম,' রেক্স বললেন, 'আপনাদের কথায় রাজি হয়ে যাওয়াই উচিত। কি করতে হবে বলুন?'

'এক কথা কতবার বলব?' অধৈর্য হয়ে উঠল ডেভিড। 'ছোট একটা ফিশিং বোট ভাড়া করতে হবে তোমাকে।'

'তারপর?'

'কানে কম শোনে নাকি বুড়োটা! নাকি কিছুই মনে থাকে না!' খেঁকিয়ে উঠল ডেভিড। 'বোট নিয়ে স্নেইকফেলসইয়োকুলের কাছে চলে যাবে, আমি থাকব সেখানে।...এই যে, এই জায়গাটায়।'

নিশ্চয় কোন ম্যাপ দেখাল সে, আন্দাজ করল কিশোর।

'বুঝলাম,' রেক্স বললেন। 'কিন্তু যে ধরনের বোটের কথা বলছেন, একা তো চালাতে পারব না।'

'তাহলে লোক নেবে। টাকার জন্যে ভেবো না।'

'কত টাকা দেবেন? আরও অন্তত দু'তিনজন লোক লাগবে...'

'বললাম তো টাকা যা লাগে দেব। কাজ পেলেই আমি খুশি।'

কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলার লোভটা সামলাতে পারল না মুসা, বলল, 'আমরা চলে যেতে পারি রেক্সের সঙ্গে...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই চেয়ার ঠেলে সরানোর শব্দ হলো। মনে হচ্ছে যাওয়ার জন্যে উঠল লোকগুলো।

'কাল সকালেই আমি রেকিয়াভিক থেকে চলে যাব,' ডেভিড বলল। 'তোমাকে বিশ্বাস করা যায় তো? নিশ্চিন্ত থাকতে পারব?'

'জ্বা।'

'এই নাও অ্যাডভান্স। ভাল দেখে বোট নেবে। টাকা বাঁচানোর জন্যে পচা বোট নিয়ে দেরি করে ফেলো না আবার।'

অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা, লোকগুলো যায় না কেন এখনও! পারলে ঠেলে বের করে দিয়ে আসে। একে তো বদ্ধ আলমারি, তার ওপর কড়া তামাকের ধোঁয়া, সহ্য করতে পারছে না আর সে। তাজা বাতাসে দম নেয়ার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস।

আলমারির সামনে এসে দাঁড়ালেন রেক্স। সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল আলমারির দরজা, চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। ছেলেরা কিছু করার আগেই কিট করে লেগে গেল তালা। হাসি হাসি গলায় বললেন তিনি, 'থাক ওখানে। আমি গেলাম।'

তাড়াতাড়ি নব ধরে মোচড় দিল কিশোর।

লাভ হলো না। ঘুরল না নব। আলমারিতে আটকা পড়েছে ওরা।

চোদ্দ

'খাইছে! তালা লাগিয়ে দিয়ে গেল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'আমিও একটা গাধা! শুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার, তা-ও গুরুত্ব দিইনি। আগাগোড়াই আমাদের ঠকিয়ে গেছে রেক্স মার!'

'কি করব এখন?'

'প্রথমত, ভয় পাওয়া চলবে না। বেরোনোর চেষ্টা করতে হবে। সেটা এমন কোন কঠিন কাজ হবে না।'

'কিন্তু বাইরে যদি ওরা বসে থাকে? বেরোলেই আবার ধরে?'

'ঝুঁকি তো নিতেই হবে,' আলমারির মধ্যে হাতড়াতে শুরু করেছে কিশোর।

'কি খুঁজছ?'

এককোণে ফেলে রাখা যন্ত্রপাতিগুলোর কথা বলল কিশোর। তালা খোলার চেষ্টা করবে, না পারলে ভাঙবে। প্রচণ্ড গরম লাগছে। কপাল থেকে ঘাম ঝরতে

আরম্ভ করেছে।

'একটা টর্চ পেলে এখন ভাল হত!' মুসা বলল। আলমারির দরজায় কান চেপে ধরেছে। বাইরে কোন শব্দ নেই।

'মুসা, একটা জিনিস পেয়েছি।'

'কি?'

'জ্যাক।'

'গুড। এখন একটা দুই-বাই-চার ইঞ্চি...' আলমারির মেঝে হাতড়াচ্ছে মুসা। 'এই যে পেয়ে গেছি...'

'কি?' কিশোর জানতে চাইল।

'এক টুকরো কাঠ।'

'কত বড়?'

'বেশি বড় না।'

একটা হাতুড়ি হাতে ঠেকল কিশোরের। 'আসল জিনিসটা পেলাম।'

পুরানো কাপড় একধারে ঠেলে সরিয়ে জ্যাকের একমাথা ঠেকাল আলমারির পেছনের দেয়ালে। আরেক মাথা দরজা পর্যন্ত পৌঁছে না, মাঝখানে মুসার পাওয়া কাঠের টুকরোটা ঢোকালেও ফাঁক থেকে যায়।

পুরানো একটা স্প্যানার খুঁজে বের করল কিশোর। ঘোরাতে লাগল জ্যাকটাকে, ধীরে লম্বা হচ্ছে ওটার মাথা, ভরে যাচ্ছে ফাঁক, চাপ দিতে শুরু করল দরজায়।

ঘুরিয়েই চলেছে কিশোর। মড়মড় করে উঠল দরজা। তালা কি ছুটবে?

ঘোরাতে থাকল কিশোর। দরজার প্রতিবাদ বাড়ছে।

তালা ভাঙল না, তবে ছুটে গেল, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

ঘরটা খালি নয়। হাসি মুখে বসে বসে পাইপ টানছেন রেক্স মার।

বোকা হয়ে গেল যেন দুই গোয়েন্দা। তোতলাতে শুরু করল কিশোর, 'আ-আপনি...মা-মানে...একাজটা কেন করলেন?'

রেগে গেল মুসা, 'আরেকটু হলেই দম আটকে মরেছিলাম আমরা! এটা কোন ধরনের রসিকতা হলো?'

ছেলেদেরকে শান্ত হয়ে বসার ইঙ্গিত করলেন রেক্স। বললেন, 'তোমরা যে কাজের লোক, এটা প্রমাণ করেছ। কঠিন বিপদে পড়লে মাথা কতটা ঠাণ্ডা রাখতে পারো দেখলাম।'

আরেকবার নিজেকে গাধা মনে হলো কিশোরের, তবে এবার আর বলল না সেটা। 'তারমানে আলমারিতে জ্যাকটা যে আছে জানতেন?'

মাথা ঝাঁকালেন রেক্স। 'জানব না কেন? আমারই তো জিনিস।' উঠে গিয়ে আলমারি থেকে এক বোতল ঠাণ্ডা পানি বের করে এনে দিলেন।

গেলাসে ঢেলে ঢকঢক করে গিলে ফেলল দুই গোয়েন্দা।

পানি খেয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে বসে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'লাল চুলওলা লোকটার সঙ্গেই কথা বলছিলেন?'

'হ্যাঁ। ফাঁক দিয়ে দেখেছ নাকি?'

'না, দেখা যায় না,' জবাব দিল মুসা। 'তালার ফুটোতেও চাবি ঢোকানো ছিল, সেখান দিয়েও দেখার উপায় ছিল না।'

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'কি নাম বলল?'

'বলেনি।'

'লোক তো লাগবে বললেন। কাদের নেবেন? ঠিক করা আছে?'

'আছে।'

'আছে!' হতাশ মনে হলো মুসাকে।

'তোমরা। তোমাদের নেব। এইমাত্র তো বললাম, তোমরা তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছ, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?'

হাসি ফুটল আবার মুসার মুখে।

'আমাদের তো ছদ্মবেশ লাগবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কেন?' অবাক হলেন বৃদ্ধ নাবিক।

'লোকটার গলা আমাদের চেনা। যে দলটার পিছে লেগেছি আমরা, সে তাদেরই লোক। আপনার আপত্তি না থাকলে আরও একজনকে সাথে নিতে চাই আমরা, আইসল্যাণ্ডেরই ছেলে, এমি। চোখ বুজে তার ওপর নির্ভর করতে পারেন, গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'নিয়ে নাও,' এমির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করলেন না রেক্স। 'একটা বোট খুঁজতে বেরোতে হবে আমাকে। হোটেলে থেকো, পেলেই ফোন করব।'

সায় জানিয়ে রেক্সকে গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে এল তাঁর বাসা থেকে। হোটেলে যাওয়ার আগে থানায় একবার ঢুঁ মেরে যাওয়ার কথা চিন্তা করল কিশোর। মুসা আর টমের কোন খোঁজ মিলল কিনা জানা দরকার। কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি পুলিশ।

আশাও অবশ্য করেনি কিশোর আর মুসা। তবু হতাশ লাগল। মন খারাপ করে হোটেলে ফিরল ওরা।

ঘরে ঢুকেই একটা ইজি চেয়ারে এলিয়ে পড়ল কিশোর। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল, তার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা দেখেই সেটা বোঝা যায়।

কথা বলল না মুসা, প্রশ্ন করল না, জানে করে লাভ নেই। জবাব দেবে না এখন গোয়েন্দাপ্রধান। জানালার কাছে গিয়ে বসে রাতের রেকিয়াভিক দেখতে লাগল সে চুপচাপ।

এক সময় চোখ মেলল কিশোর। 'মুসা, আমার এখনও সন্দেহ আছে। রেক্স মারকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কেন?'

'কেন করব? কতটুকু চিনি আমরা তাঁকে?'

'তা বটে। তাঁর হাতে নিজেদেরকে তুলে দিতে যাচ্ছি আমরা। শত্রুপক্ষের লোক হয়ে থাকলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে দিতে

পারেন।'

'হ্যাঁ। তবে শত্রুপক্ষের লোক হলে একটা ব্যাপার ভাল হবে, আমরা তাঁর সঙ্গে গিয়ে রবিনদের খোঁজ বের করতে পারব।'

'হয়তো। কিন্তু কথা হলো, শত্রুপক্ষেরই যদি হবেন, আমাদেরকে এত কথা বলতে গেলেন কেন? বেআইনী মাল পাচার, ডেভিড আর তার সহকারীর চেহারার বর্ণনা, আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে ওদের কথা শোনার সুযোগ করে দেয়া...'

'এসব কারণেই তো আমার সন্দেহ যাচ্ছে না। বড় বেশি সহযোগিতা করছেন। আমাদেরকে পটানোর জন্যে করে থাকতে পারেন। পটিয়ে-পাটিয়ে একবার নিয়ে গিয়ে নিজেদের আস্তানায় তুলতে পারলেই তো ব্যস...' বাক্যটা শেষ না করে হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল কিশোর কি করা হবে।

'খামোকাই হয়তো সন্দেহ করছি আমরা। এতগুলো টাকা পাওয়ার খবর দিলাম কষ্ট করে গিয়ে, কৃতজ্ঞতা বোধ বলেও তো একটা জিনিস আছে।'

'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না!' কান চুলকাল কিশোর। 'যাই হোক, বোটে উঠলেই হয়তো বুঝে যাব। তখন যা করার করা যাবে। আমরা তিনজন। তিনজনের বিরুদ্ধে একা রেক্স সুবিধে করতে পারবেন না।'

পরদিন সকালে উঠেই আগে এমিকে ফোন করল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি পারে হোটেলে চলে আসতে বলল।

চলে এল এমি। দরজায় থেকেই জিজ্ঞেস করল, 'রবিনদের খোঁজ পেয়েছ?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন।

'হুঁ, ভাবনারই কথা,' ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল এমি। 'কি করবে এখন, ভেবেছ কিছু?'

'মনে হয় আসল হলোবিয়রনসনকেই খুঁজে পেয়েছি আমরা। কিন্তু একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। নকল বিয়রনসন আসল জনকে একটা চোরাচালানের কাজ করতে বলছে...'

বাধা দিল এমি, 'দেখো, একটা কথা সোজাসুজি বলা দরকার! তোমরা আমাকে বলেছ, তোমরা গোয়েন্দা, বিশ্বাস করেছি। বলেছ, ইনশিওরেন্সের কাজ করছ, বিশ্বাস করেছি। এখন আবার আরেক কথা বলছ। আসলে কি করছ তোমরা, বলো তো? কিছুই বুঝতে পারব না, এতটা বোকা আমাকে ভেবো না।'

'ভাবি না,' এতক্ষণে মুখ খুলল কিশোর। 'আর ভাবি না বলেই ডেকেছি। এতদিন যা বলেছি, সব সত্যি, একটাও মিথ্যে বলিনি। সত্যিই আমরা গোয়েন্দা, ইনশুরেন্সের কাজ নিয়েই এসেছিলাম রেক্সকে খুঁজতে। এখানে আসার পর কি সব কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ করল। কি যে হচ্ছে এখন আমরাই শিওর না।'

এমির দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল সন্দেহ এখনও যায়নি। 'আমাকে ডেকেছ কেন?'

'বলছি। তবে কথা দিতে হবে কাউকে কিছু বলতে পারবে না, মুখ একেবারে বন্ধ রাখবে। আমেরিকা আর আইসল্যাণ্ড সরকারের একটা টপ সিক্রেট ব্যাপার এটা।'

'বলো। আমার মুখ থেকে কেউ কিছু বের করতে পারবে না।'

সব কথা এমিকে খুলে বলল কিশোর আর মুসা।

শুনে সামান্যতম দ্বিধা না করে রেক্সের বোটের নাবিক হতে রাজি হয়ে গেল এমি। বলল, 'যে কোন ব্যাপারেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া আমি। আর এখন তো নিজের দেশই জড়িয়ে গেল। এসব কথা কোস্ট গার্ডকে জানাবে নাকি?'

'জানাব,' কিশোর বলল। 'ক্যাপ্টেন হুরনকে। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন, অবশ্যই দায়িত্বশীল কারও জানা থাকা উচিত।'

'কখন রওনা হচ্ছি?'

'বোট জোগাড় করেই আমাদের খবর দেবেন রেক্স,' মুসা বলল। 'তিনিই বলবেন কখন রওনা হতে হবে।'

'জরুরী কিছু কাজ সারতে হবে এখন আমাদের,' কিশোর বলল। 'ডেভিড আর তার চামচাটা আমাদের চেনে। ছদ্মবেশ নিতে হবে। নাপিতের দোকানে গিয়ে চুলে রঙ করাব। কিছু নাবিকের পোশাক দরকার, পুরানো, জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'পারব। আমাদের বাড়িতেই আছে। তোমরা চুলে রঙ করাও, আমি ততক্ষণে নিয়ে আসিগে।'

ঘর থেকে বেরোল তিন কিশোর। নিচে নেমে হোটেলের নাপিতের দোকানের দিকে চলল কিশোর আর মুসা, এমি এগোল সদর দরজার দিকে।

চুলে লাল রঙ করাল কিশোর। এলোমেলো রুক্ষ লাল চুল, যেন অনেকদিন সাগরের রোদ-বাতাসে ওরকম হয়েছে। আলগা ভুরু লাগাল। গালের ভেতর এখন চিক প্যাড ভরে নিলেই অন্য মানুষ হয়ে যাবে, চেনা যাবে না। কিশোরের মত লাল চুল লাগালে হবে না মুসার, তাই লম্বা কালো চুলের পরচুলা পরে কোঁকড়া চুল ঢেকে নিয়ে সে সাজল পলিনেশিয়ান। ভুরু লাগাল মোটা করে।

ছদ্মবেশ নেয়া শেষ করে ওরা বেরিয়েই দেখল হোটেলের সামনে জীপ রেখে এমি নামছে। হাতে একটা পোঁটলা। ওদের দিকে একবার তাকিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, মুসা তার নাম ধরে ডাকতে থমকে দাঁড়াল। চোখ উঠে গেল কপালে, 'আরি, এ কি কাণ্ড! চিনতেই পারিনি! খুব ভাল হয়েছে।'

'এক কাজ করি চলো,' কিশোর প্রস্তাব দিল, 'নাবিক সেজে বন্দরে চলে যাই। দেখি, কেউ কিছু বুঝতে পারে কিনা। রেক্সের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তিনি চিনতে না পারলে বুঝব, ছদ্মবেশ বেশ ভাল হয়েছে।'

'উত্তম প্রস্তাব,' লাফিয়ে উঠল মুসা। 'চলো।'

ঘরে এসে পোশাক পাল্টে নিল তিনজনেই। বেরোল আবার। এমির জীপে করে চলল রেক্সের বাসায়।

এমি একটা ভাল কথা মনে করিয়ে দিল, 'অপরিচিত কারও সামনে এখন ইংরেজি বলবে না। ধরা পড়ে যাবে।' কয়েকটা আইসল্যাণ্ডিক শব্দ ওদেরকে শিখিয়ে দিল সে, বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলে যে কাউকে বোকা বানিয়ে দিতে পারবে।

ব্যস্ত বন্দর এলাকায় ঢুকে গাড়ি পার্ক করল এমি। তিনজনে নেমে অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল পানির কিনারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেক্স মারের দেখা পেয়ে গেল। মুসার চোখে পড়ল আগে। একটা ট্রলার দেখছেন তিনি, বোধহয় ওটা পছন্দ হয়েছে। মাছধরা জাহাজ, পঁয়তিরিশ ফুট লম্বা। দেখা শেষ করে একটা লোকের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বললেন কিছুক্ষণ। তারপর হেসে নেমে এলেন বোটের ডেক থেকে।

'চলো এবার,' বলে তাঁর দিকে এগোল কিশোর।

একেবারে সামনে চলে আসার পরও ওদেরকে চিনতে পারার কোন লক্ষণ দেখালেন না রেক্স। পাশ কাটানোর সময় ইচ্ছে করেই হোঁচট খেয়ে তাঁর গায়ে পড়ল কিশোর। পিছিয়ে গেলেন রেক্স। বিড়বিড় করে কয়েকটা আইসল্যাণ্ডিক শব্দ উচ্চারণ করল কিশোর। তারপর আবার এগোল।

দূরে সরে এসে হেসে ফেলল মুসা। 'কিশোর, কেল্লা ফতে! হয়ে গেল কাজ। চিনতে পারেনি।'

ছোট একটা অফিসে ঢুকতে দেখা গেল রেক্সকে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন।

'মনে হয় কাজ সেরে বেরোলেন,' কিশোর বলল। 'চলো, আবার যাই। এবার বলে দেব।'

চিনতে পেরে হাঁ হয়ে গেলেন রেক্স। এমির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। হাত মেলালেন দু'জনে।

'জাহাজ তো মনে হলো পছন্দ করেছেন,' কিশোর বলল, 'রওনা হচ্ছি কখন?'

'আজ বিকেলেই, যদি তোমরা তৈরি হয়ে আসতে পারো।'

'পারব। এমি, তুমি?'

'আমিও পারব।'

'তাহলে বিকেল পাঁচটায়,' রেক্স বললেন, 'এখানে চলে আসবে। জাহাজটা তো চিনলেই। উঠে পড়বে।'

সেদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় নোমারিক নামের ছোট জাহাজটা রেকিয়াভিক বন্দর থেকে ছেড়ে গেল। উপকূল বরাবর এগিয়ে চলল স্নেইফেলসইয়োকুলের দিকে। খোলা সাগরে বেরিয়ে আর ছদ্মবেশে থাকার দরকার মনে করল না কিশোর। চুলের রঙ তো বদল করতে পারবে না, প্রয়োজনও নেই। ভুরু আর চিক প্যাড খুলে রাখল। ডেকের কাজে সাহায্য করতে গেল রেক্স মারকে।

আটটার দিকে জোরালো হাওয়া ঢেউয়ের বুকে সাদা ফেনার মুকুট সৃষ্টি করল। দুলতে লাগল জাহাজ। ব্রিজে দাঁড়িয়ে কিশোর আর মুসাকে আইসল্যাণ্ডের গল্প শোনাচ্ছেন রেক্স।

হুইলের পেছনের দেয়ালে একটা বর্ম আঁকা, আইসল্যাণ্ডের মুদ্রায় এই মনোগ্রাম দেখেছে কিশোর। বর্মটার ডানে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক দানব। বাঁ পাশে একটা ষাঁড়। ওগুলোর মাথার ওপরে উড়ছে ড্রাগন আর একটা অতিকায় পাখি।

'মানে কি এগুলোর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একটা কাহিনী আছে এগুলোর,' বলে এমির দিকে তাকালেন রেক্স, সায়

জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। বাতাস বাড়ছে আস্তে আস্তে, ঝড় আসবে মনে হয়। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সাগরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন রেক্স, তারপর শোনালেন এক দুষ্ট ভাইকিঙের গল্প। লোকটার নাম ছিল হ্যারাল্ডুর গর্মসন। আইসল্যাণ্ড জয় করতে চেয়েছিল সে।

'আক্রমণ করার আগে জায়গাটা সম্পর্কে ভালমত জানা থাকা দরকার,' রেক্স বলছেন, 'তাই একজন লোক পাঠাল গর্মসন। তিমির রূপ নিয়ে দ্বীপের চারপাশে সাঁতার দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল লোকটা।'

'স্পাই সাবমেরিনের মত,' শব্দ করে হাসল মুসা।

কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে এমিও হাসল। 'সেকালে জাদুবিদ্যা আর ভূতপ্রেতের অভাব ছিল না এদেশে। এখনও কমতি নেই।'

'আমাদের বিশ্বাস করতে বলো এসব?' কিশোর বলল।

'করলে করবে না করলে নেই, তোমাদের ইচ্ছে,' রেক্স বললেন, 'তবে গল্পগুলো এভাবেই চালু আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দ্বীপের পুব ধারে যেতেই ভয়ঙ্কর এক ড্রাগন এসে হাজির, সঙ্গে অনেক সাপ আর বিরাট বিরাট কেঁচো। কেঁচোগুলো হিংস্র, মাংসাশী। এতগুলো দানবকে দেখে আর লড়াই করতে সাহস করল না তিমিটা, পালিয়ে গেল।'

রেক্স দম নেয়ার জন্যে থামতেই গল্পটা চালিয়ে গেল এমি, 'তারপর তিমিটা গেল উত্তর ধারে। বিশাল এক বাজপাখি এসে হাজির, ওটার ডানাগুলো এত বড়, ছড়ালে ফিয়র্ডের দুই ধারে দুটো পর্বতের মাথা ছুঁয়ে যায়। ওটার সঙ্গে ছিল ছোটবড় আরও অনেক পাখি।'

'ওগুলোও নিশ্চয় তিমিটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল?' মুসার প্রশ্ন।

'আর কি করবে?' হাসলেন রেক্স। 'পশ্চিম ধারে গিয়ে তিমিটা পড়ল পাহাড়ের মত বড় এক ষাঁড়ের সামনে। তিমিটাকে দেখেই ফোঁস ফোঁস করতে করতে শিং বাগিয়ে তেড়ে এল।'

'একা?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, একা আসবে কেন?' এমি বলল। 'ওটার সঙ্গে এল দ্বীপের অন্য বাসিন্দা, ট্রোল আর গুপ্তমানবেরা। দেখে পালানোর পথ পেল না তিমি বাছাধন।'

মাথা চুলকালেন রেক্স। তাঁর চেয়ে অনেক ভাল ইংরেজি বলে এমি, নানা ঢঙে কথা বলতে না পারলে গল্প আর গল্প হয় না, তাই চুপ করে থেকে ছেলেটাকেই বলতে দিলেন।

এমি বলছে, 'দক্ষিণ ধারে গিয়ে তিমিটা দেখতে পেল এক দানবকে, এই যে এটা,' ছবি দেখাল সে। 'হাতে লাঠি। পর্বতের চেয়ে উঁচু। তার সঙ্গে ছিল আরও দানব। সেদিক দিয়ে ওঠারও সাহস করতে পারল না তিমি। মানে মানে সরে গিয়ে তার রাজা গর্মসনকে জানাল কি কি দেখে এসেছে।'

'লড়াই করতে গিয়েছিল ভাইকিং রাজা?' গল্পটা বেশ ভাল লাগছে মুসার।

'মাথা খারাপ! এখনও লোকের বিশ্বাস, ওই চারটে জীব সেদিন না থাকলে আইসল্যাণ্ড ভাইকিংদের দখলেই চলে যেত।'

অনেক বেড়েছে বাতাসের বেগ। উত্তাল হয়ে উঠেছে সাগর। বিপদ আঁচ করে ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে বোটের নাক ঘোরালেন বাতাসের মুখোমুখি, তাতে আর পাশ থেকে ধাক্কা দিতে পারবে না বাতাস, ঠেলা মেরে উল্টে দিতে পারবে না জাহাজ। কিন্তু হঠাৎ করেই আবার মোড় ঘুরে গেল বাতাসের, ভীষণ দুলতে আরম্ভ করল নোমারিক।

ভয়ের লেশমাত্রও নেই রেক্সের চেহারায়, পুরোপুরি শান্ত রয়েছেন তিনি, কিন্তু এমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। 'এমন ঝড় তো আর দেখিনি,' বলেও শেষ করতে পারল না সে, দু'হাতে তুলে ধরে যেন সামনের দিকে জাহাজটাকে ছুঁড়ে মারল কোন দৈত্য। একেকজন একেক দিকে ছিটকে পড়ল যাত্রীরা।

পনেরো

ডেকের ওপর এসে আছড়ে পড়ছে বিরাট বিরাট ঢেউ, নোমারিককে ডোবানোর চেষ্টা করছে যেন। কোনমতে হ্যাচের ঢাকনাগুলো নামিয়ে দিল ছেলেরা। পাম্পের ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে পানি সেঁচতে শুরু করলেন রেক্স।

'ভুল করেছি,' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর, 'সী-সিক পিল নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

দুটো ঘন্টা প্রচণ্ড ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করল ছোট্ট ট্রলারটা। ডুবল না, টিকে রইল কোনমতে। আস্তে আস্তে কমে এল বাতাসের বেগ। বাংকে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল ছেলেরা। বাতাস আর ঢেউ তখনও যথেষ্ট রয়েছে, সেই সঙ্গে চলল জাহাজের দুলুনি, ফলে ভালমত ঘুমাতে পারল না ওরা।

ভোরের ধূসর আলোয় দেখা গেল উঁচুনিচু উপকূল। ডেকে তাদেরকে তুলে দিলেন রেক্স। ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংস, রুটি আর দুধ দিয়ে নাস্তা সেরে তাঁকে সাহায্য করতে ব্রিজে উঠে এল ওরা।

'এবার আমরা সামলাতে পারব,' কিশোর বলল রেক্সকে। 'আপনি গিয়ে ঘুমান।'

খুশি হয়েই ওদের হাতে হুইল ছেড়ে দিলেন তিনি, তবে নিচে গেলেন না, একটা বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হুইল ধরল কিশোর। চার্টে চোখ বোলাতে লাগল এমি। 'ক্রস দেয়া জায়গাটায় গিয়ে তীরে ভেড়াতে হবে জাহাজ,' বলল সে।

কিশোরও দেখল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল, 'মুসা, দেখো দেখো, ঠিক এই জায়গাটাতেই ডগলাসবারে তুলে দেয়া হয়েছিল আমাদের!'

আরও একটা ঘন্টা ঢেউ ভাঙল মজবুত ট্রলারটা। রেক্সকে ডেকে তুলল এমি। 'মনে হয়ে এসে গেছি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন রেক্স। ম্যাপ দেখলেন। তারপর তাকালেন তীরের দিকে। এক জায়গায় যেন ব্যথা পেয়ে ফুলে উঠেছে উপকূল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, *'জা।* খাল দেখা যাচ্ছে। ঢোকা যাবে।'

হুইল ঘুরিয়ে জাহাজের নাক তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিল কিশোর।

খালের পাথুরে মুখের কাছে আসতেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'অ্যাই কিশোর, দেখো, একটা রবারের ভেলা!' তাক থেকে একটা দূরবীন তুলে নিয়ে চোখে লাগাল। 'ছোট একটা ইঞ্জিনও লাগানো আছে!'

'তার মানে আমাদের আগেই কেউ এসে বসে আছে!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

রেডিওটা দেখাল মুসা। 'ক্যাপ্টেন হুরনের সঙ্গে কথা বলব?'

'না। একই ওয়েভলেংথে যদি রেডিও অন করে রাখে ডেভিড আমাদের কথা শুনে ফেলবে। আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে।'

এখানে জাহাজ চালানো কঠিন। কিশোর পারবে না তা নয়, তবু ঝুঁকি নিতে চাইলেন না রেক্স, তার হাত থেকে হুইল নিয়ে নিলেন। একটা অস্থায়ী ডক আছে খালের মুখের সামান্য ভেতরে। সেখানে নিয়ে গিয়ে জাহাজ ভেড়ালেন তিনি। হুইল ছেড়ে দিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাদের কাজ আপাতত শেষ। এবার লোকটার অপেক্ষায় শুধু বসে থাকা।'

'ততক্ষণে আমি গিয়ে ভেলাটা দেখে আসি,' কিশোর বলল।

'আমিও যাব,' মুসা বলল।

'চলো।'

তিন কিশোরই নেমে পড়ল তীরে। চারপাশে নজর রাখার জন্যে এমি গিয়ে একটা টিলায় উঠল। কিশোর আর মুসা এবড়োখেবড়ো ঢালু পাড় ধরে এগোল ভেলাটা যেদিকে দেখা গেছে সেদিকে।

সরু আরেকটা খালের মুখে পাওয়া গেল ওটা। ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে।

ভেলায় উঠে গেল মুসা। 'এ রকম পিপার মত ভেলা তো আর দেখিনি! ওয়াটার টাইট, ইচ্ছে করলে ভেতরে ঢুকে বসে থাকা যায়। পনটুনও ধাতব নয়, রবারের। ব্যালাস্ট ট্যাংকের ভালভের মত ভালভ লাগানো।'

'আর এগুলো কমপ্রেসড এয়ার কনটেইনার। বুঝতে পারছ তো ব্যাপারটা এখন?'

'কি?'

'ডেভিড কি করে পালিয়েছে?'

'কি ভাবে···?' বলেই বুঝে ফেলল মুসা। উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি! জাহাজের পেছনে দড়ি বেঁধে হুকে আটকে টেনে নেয়া হয়েছে এই খুদে সাবমেরিন। আমরা পোচারদের জাহাজে ওঠার আগেই এটাতে করে পানির নিচ দিয়ে পালিয়েছে ডেভিড। সাংঘাতিক ব্যাপার-স্যাপার তো! করছে কি লোকটা?'

'ভেলাটা এখানে এনেছে, আমাদেরকে আসতে বলেছে, তারমানে এই এলাকাতেই কোথাও আছে সে।'

'রবিন আর টমকেও এখানেই নিয়ে আসা হয়নি তো?'

'আনলে অবাক হব না।'

যেভাবে পেয়েছে ভেলাটা সেভাবেই রেখে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। এমিকে বলল সব কথা।

'এতসব চালাকি যারা করতে পারে,' এমি বলল, 'তারা সাধারণ লোক নয়। ডেঞ্জারাস। সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

সারাটা দিন অপেক্ষা করে থাকতে হলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এই সময় দূরবীন নিয়ে তীরে চোখ বোলাতে লাগলেন রেক্স। কয়েক মিনিট পর বললেন, 'ওই যে আসছে আমাদের লোক।' যন্ত্রটা তুলে দিলেন কিশোরের হাতে।

উঁচুনিচু পথে ঝাঁকি খেতে খেতে আসছে একটা জীপ। চালাচ্ছে ডেভিড।

'ছদ্মবেশ! জলদি!' রেক্স বললেন।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে নকল ভুরু ও গালের ভেতর চিক প্যাড লাগিয়ে নিল কিশোর, মুসা পরচুলা পরে নিল। ডেকে বেরিয়ে দেখল পৌঁছে গেছে ডেভিড। জ্যাকেটের নিচে শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল আছে বোঝা যায়।

মনে মনে হাসল কিশোর। ছদ্মবেশ বনাম ছদ্মবেশ। কিশোররা সেজেছে নাবিক, ডেভিড সেজেছে আইসল্যাণ্ডের সিকিউরিটি সংস্থার লোক। এমন ভাবভঙ্গি করছে যেন উচ্চ পদস্থ কোন দায়িত্বশীল অফিসার। ওরা তো তাকে চিনেছে, সে এখন ওদেরকে চিনে না ফেললেই হয়।

জাহাজে উঠে এল লোকটা। এই ঝড়ের মধ্যে জাহাজ চালিয়ে ঠিকমত যে আসতে পেরেছে এ জন্যে রেক্সের প্রশংসা করল।

'আপনি একটা ভাল বোট চেয়েছিলেন,' রেক্স বললেন, 'কাজেই নিয়ে এসেছি, মিস্টার...'

হাসল ডেভিড, 'আমাকে চীফ কিংবা বস্ ডাকলেই চলবে, নাম জানার দরকার নেই।' তিন কিশোরের ওপর ঘুরে এসে আবার রেক্সের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে হবে তোমাকে। আর্কটিক পেট্রোলের খপ্পরে পড়া চলবে না।'

'কি জিনিস নিতে হবে?'

ধূর্ত হাসি ফুটল ডেভিডের ঠোঁটে। 'তোমরা আইসল্যাণ্ডাররা প্রশ্ন না করে থাকতে পারো না? বড় বেশি কৌতূহল। ঠিক আছে, বলেই দিই। রাস্তাঘাটে গিয়ে খুলে দেখার চেয়ে আগেই শুনে নাও। তিনটে বাক্সে দুর্লভ ধাতুর আকরিক নিয়ে যেতে হবে। এদেশে এ জিনিস আছে জানতই না কেউ। নতুন আবিষ্কার হয়েছে। আইসল্যাণ্ডের সরকার জানলে কিছুতেই নিতে দেবে না আমাকে।' শ্রাগ করল সে। 'কাজেই বেআইনী ভাবে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখলাম না। তোমার ছোকরাগুলোকে নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।'

জাহাজ থেকে আগে নামল ডেভিড। পেছনে টপাটপ লাফিয়ে নেমে পড়ল অন্য চারজন। লোকটার পিছে পিছে চলে এল জীপের কাছে। এমির গাড়িটার মতই ছাত খোলা এটার। সবাইকে উঠতে ইশারা করে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ডেভিড। পেছনে গাদাগাদি করে বসল চারজন।

রুক্ষ পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলল জীপ। ঢুকে যাচ্ছে দেশের ভেতরে। একটা কাঁচা রাস্তা চোখে পড়ল। টায়ারের দাগ কেটে বসেছে। এঁকেবেঁকে চলে গেছে পথটা।

গতি বাড়াল ডেভিড। ছোট একটা গিরিখাতের কাছে এসে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে

পথ, সরুও হয়ে গেছে অনেক। একপাশের চাকা পিছলে সরে যেতে লাগল খাদের দিকে।

আঁতকে উঠে মুসা বলল, 'চলে যাচ্ছে তো, খাইছে!'

সামনের দুটো চাকাই পার হয়ে গেল, কিন্তু পেছনের একটা চাকা নেমে গেল খাড়া ঢালে। পাথুরে রাস্তায় বাড়ি লাগল পেছনের অ্যাক্সেল। যাচ্ছিল চলে আরেকটু হলেই, অনেক কষ্টে সামলাল ডেভিড, তুলে আনল চাকাটাকে। জীপের ইঞ্জিন শক্তিশালী বলেই সম্ভব হলো।

এতক্ষণে ফিরে তাকানোর সময় পেল ডেভিড। জিজ্ঞেস করল, 'ইংরেজিতে কথা বলল কে?'

'কেউ না,' আইসল্যাণ্ডিকে জবাব দিল এমি।

'একটা কান খারাপ আমার, কি শুনতে কি শুনি কে জানে!'

বোকামিটা যে করে ফেলেছে খেয়ালই করেনি মুসা। নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল এখন। এরকম ভুল আর করা চলবে না। একবার বেঁচেছে বলেই বার বার ভুল করে বাঁচতে পারবে না।

শেষ হলো পায়ে চলা পথ, আবার খারাপ জমিতে পড়ল জীপ। এমনই অবস্থা হয়ে গেল, এগোতেই পারল না আর গাড়ি। থামিয়ে দিল ডেভিড। শ'খানেক গজ দূরে একটা ঢালের ওপরে দেখা গেল পাঁচটা টাট্টু। লম্বা লম্বা কোঁকড়া লোমে ঢাকা ছোট্ট ঘোড়াগুলোর শরীর। শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জিন পরিয়ে একেকজন একেকটা ঘোড়ায় চেপে বসল। আগে আগে চলল ডেভিড। ঢাল বেয়ে নেমে উপত্যকা ধরে এগোল। মোড় ঘুরতেই বিরাট বিরাট লাভার চাঙড় দেখা গেল, সরু উপত্যকাটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। এরকমই একটা চাঙড়ের পেছনে ঢালের ওপর তৈরি হয়েছে একটা বড় কুঁড়েঘর। ছাত থেকে বেরিয়ে আছে পাতলা, লম্বা একটা অ্যান্টেনা।

কুঁড়ের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল ডেভিড। অন্যদেরকেও নামতে ইশারা করল। সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কাঁচা মেঝে। আসবাবপত্র কম। টেবিল, চেয়ার, স্টোভ আর অন্যান্য জিনিস সবই আধুনিক। বেশ গরম, আরামেই থাকা যায়।

যে তিনটে বাক্সের কথা বলেছে ডেভিড সেগুলো দেখা গেল না কোথাও।

ডেভিডের কাছ থেকে সরে এসে কিশোরের কানে কানে মুসা বলল, 'পুরো ব্যাপারটা কেমন জানি লাগছে, না?'

জবাব দিল না কিশোর।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল আরেকজন লোক। চিনতে পারল কিশোর। ডেভিডের সহকারী সেই লোকটা, যে হেলিকপ্টার নিয়ে ভ্যাটনাইয়োকুল হিমবাহতে গিয়েছিল। ছেলেদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল সে। তারপর দূরে সরে গিয়ে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল ডেভিডের সঙ্গে।

খাবার দেয়া হলো। সীম, রুটি আর ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংস দিয়ে খাওয়া সারার পর নাবিকদের ঘুমানোর জন্যে কয়েকটা ফোল্ডিং বেড বের করে দিল ডেভিড। তারপর সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়

লোকটার নাম জানা হয়ে গেছে গোয়েন্দাদের, টোনার।

'মুসা,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর, 'এই আমাদের সুযোগ!'

দ্রুতহাতে আবার ট্রাউজার আর জুতো পরে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। দরজা ফাঁক করে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল কিশোর, কেউ আছে কিনা দেখল। তারপর বেরিয়ে এল।

বড় একটা লাভার চাঙড়ের কাছাকাছি এসে কথা শুনতে পেল। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল দু'জনে। কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, ডেভিড আর টোনার। এমন একটা ভাষায় কথা বলছে কিছুই বোঝা গেল না।

হঠাৎ দুটো শব্দ কানে ঢুকতেই চমকে গেল কিশোর আর মুসা। ডেভিড বলেছে 'তিন গোয়েন্দা'। কেন বলল? ওদের ছদ্মবেশ কি ফাঁস হয়ে গেছে?

ষোলো

দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। লোকগুলোর কাছে পিস্তল আছে। এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে ওদেরকে, পালানো সহজ হবে না। চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবে। পায়ে পায়ে আবার কুঁড়েতে ফিরে এল দু'জনে। কি শুনে এসেছে জানাল এমি আর রেক্সকে।

'ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে হত,' এমি বলল।

'আপাতত কিছুই করার নেই আমাদের,' মুসা বলল, 'ওদের কথা শোনা ছাড়া।'

রাতে কুঁড়েতে একা ফিরল ডেভিড। তার সহকারী বাইরেই রয়ে গেল। তার সাড়া পেল না গোয়েন্দারা, তবে আন্দাজ করল, বাইরে পাহারায় রয়েছে সে।

ভোরের আলো ফুটতেই কুঁড়ের ঢুকে নাস্তা বানাতে বসল টোনার। আড় চোখে বার বার তার দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা, কিন্তু ওদেরকে চিনতে পারার কোন লক্ষণই দেখাল না সে। তবু নিশ্চিত হতে পারল না ওরা।

টিনের প্লেটে নাস্তা দেয়া হলো, ডিম ভাজা আর রুটি। যে যেখানে পারল বসে খেতে শুরু করে দিল সবাই।

রেক্সের কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলল কিশোর, 'বাক্সগুলোর কথা জিজ্ঞেস করুন।'

ইংরেজিতে কথা বললেন রেক্স. 'চীফ, বাক্স কোথায়? যেগুলো নিয়ে যেতে হবে আমাদের?'

প্লেট নামিয়ে রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল ডেভিড। 'অত তাড়া কিসের? এসেছ, থাকো না। ওগুলো এখানে নেই।'

'ও।'

বাঁকা হাসি ফুটল ডেভিডের ঠোঁটে। 'আমি আর টোনার বেরোচ্ছি। আমরা না আসা পর্যন্ত থাকো। চলে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। বাইরে আমার লোক আছে পাহারায়।'

ওরা বেরিয়ে গেলে ছোট একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। একটা

আগ্নেয়শিলার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল ডেভিড আর টোনার।

'জায়গাটা খুঁজে দেখব, এসো,' মুসা আর এমির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কিশোর।

রেক্সও চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। ছেলেদের সঙ্গে খুঁজতে শুরু করলেন। ঘরের কোথাও, কোন জিনিস দেখা বাদ দেয়া হলো না। পাতলা ম্যাট্রেস সরিয়ে বিছানার নিচেও উঁকি দিল।

ডেভিডের বিছানাটা আবার জায়গামত রাখতে যাবে এই সময় মুসার চোখে পড়ল কাঁচা মেঝেতে একটা সরু ফাটল। ডাক দিল, 'কিশোর, দেখে যাও!'

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উবু হয়ে দেখতে লাগল ছেলেরা। পকেট থেকে ছোট ছুরি বের করে ফাটলে ঢুকিয়ে খোঁচাতে শুরু করল কিশোর। আস্তে আস্তে লম্বা হচ্ছে ফাটলটা। ওটার ভেতরে ছুরির ফলা চালাতে চালাতে দুই ফুট চওড়া তিন ফুট লম্বা একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল।

হাতের তালুতে ভর দিয়ে এমিও তাকিয়ে আছে ফাটলটার দিকে। বলে উঠল, 'ট্র্যাপ-ডোর!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে গোয়েন্দাদের কাজ দেখছেন রেক্স। তাঁকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করল কিশোর, কেউ আসে কিনা দেখতে বলল।

চলে গেলেন রেক্স।

তিনজনে হাত চালাল এবার। মাটি সরাতে বেরিয়ে পড়ল একটা আঙটা।

ধরে টান দিল মুসা।

উঠে এল ট্র্যাপ-ডোর।

অন্ধকার পাতালঘরে মইয়ের সিঁড়ি নেমে গেছে। ডেকে রেক্সকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আপনার কাছে লাইটার আছে, মিস্টার মার?'

পকেট থেকে লাইটার বের করে ছুঁড়ে দিলেন রেক্স। লুফে নিল সেটা মুসা। আগে আগে মই বেয়ে নিচে নেমে গেল। খচ করে লাইটার জ্বেলেই চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, দেখে যাও!'

নামল কিশোর। ছোট একটা ঘর। একপাশে রাখা রেডিও আর নানা রকম অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

'এ-তো রেডিও রুম!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'হ্যাঁ, সেনডিং অ্যাণ্ড রিসিভিং স্টেশন।'

'টপ-কোয়ালিটি স্পাই সেন্টার! গুপ্তচরের আড্ডা!'

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ভাল চেনে কিশোর। মুসাও প্রায় সব ধরনের রেডিওই অপারেট করতে পারে। ম্লান আলোয় চকচক করছে যন্ত্রগুলো।

ট্র্যাপ-ডোরের মুখে উঁকি দিল এমি। 'কি ব্যাপার? কি আছে?'

'দেখে যাও,' কিশোর বলল।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ঘাঁটতে ভাল লাগে তার, কোনটাতে হাত দিয়ে, কোনটা নেড়েচেড়ে দেখছে, এই সময় ট্র্যাপ-ডোরের মুখে আবার শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠ, 'ওরা আসছে!'

দুড়দাড় করে ওপরে উঠে এল ছেলেরা।

'কত দূরে?' জিজ্ঞেস করল এমি।

'একশো গজ।'

তাড়াতাড়ি আবার ট্র্যাপ-ডোরটা লাগিয়ে, মাটি দিয়ে ঢেকে ডলে ডলে সমান করে দেয়া হলো আগের মত, খোলা হয়েছিল যে যাতে বোঝা না যায়।

'দাঁড়িয়ে গেছে ওরা,' জানালার কাছ থেকে জানালেন রেক্স, 'কথা বলছে।'

কিশোর ভাবছে, কি বলছে ওরা? বাক্সগুলোর কথা? একটা সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল মনের গোপন কোণে, ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে ওপরে।

তিনটে বাক্স, তিনজন নিখোঁজ মানুষ!

সন্দেহের কথাটা এমি আর মুসাকে জানাল।

চমকে গেল মুসা। 'তুমি বলতে চাইছ মেজর পিটারকিন, রবিন আর টমকে ভরা হয়েছে ওগুলোতে! ধাতুফাতু সব ফালতু কথা!'

আগেই ঘাবড়ে যেতে চাইল না এমি। 'বাক্সগুলো তো দেখলামই না এখনও। মানুষ ঢোকানোর মত বড় হলে তবে তো। অনেক ছোটও তো হতে পারে।'

'কিছু একটা করা দরকার,' মুসা বলল। 'এক কাজ করা যায়।' পরিকল্পনার কথাটা বলল সে। লোকগুলো যখন ঢুকবে, ওদেরকে ঠেলে বেরিয়ে একটা ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলে যাবে নোমারিকে। রেডিওতে সাহায্য চাইবে।

'বোকামি হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'এমি ঠিকই বলেছে, বাক্সগুলো দেখিইনি এখনও, আগেই ভাবাটা ঠিক হচ্ছে না।'

'চুপ!' জানালার কাছ থেকে সাবধান করলেন রেক্স, 'আসছে ওরা!'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দু'জন লোক।

কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এমি, নিঃশব্দে সরে যেতে চাইল ঘরের কোণে। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে টোনারের পায়ে পা লেগে গেল। গাল দিয়ে উঠল লোকটা। ঠাস করে চড় মারল এমির গালে। নীরবে সহ্য করল সে, কিছু বলল না। আবছা অন্ধকারে জ্বলে উঠল কেবল চোখ, টোনার দেখতে পেল না।

'বেরোও, সবাই।' আদেশ দিল ডেভিড। ইংরেজিতে বলেছে সে।

এবার আর ফাঁদে পা দিল না ছেলেরা, না বোঝার ভান করে তাকিয়ে রইল।

হাত তুলে দরজা দেখাল ডেভিড। বেরোতে ইশারা করল।

এমি আর রেক্সের পেছন পেছন বেরোল কিশোর ও মুসা।

একটা চাঙড়ের পেছনে দেখা গেল তিনটে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ছাত নেই, অনেকটা ঠেলাগাড়ির মত দেখতে। একটাতে চড়ে বসল ডেভিড আর টোনার, বাকিগুলোতে উঠতে ইশারা করল অন্যদেরকে। দ্বিতীয়টায় রেক্সের সঙ্গে উঠল কিশোর, তৃতীয়টাতে মুসা ও এমি।

'টোনার কিন্তু আইসল্যান্ডিকে গাল দেয়নি,' ফিসফিস করে কিশোরকে বললেন রেক্স।

'তাহলে কি ভাষা? বুঝলাম না তো?'

'বলকান। কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে গিয়েছি আমি, ভাষাটা শুনেছি।'

ঘোড়া চালাল ডেভিড। আগে আগে চলল। পেছনে অন্য দুটো গাড়ি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে, বড় বড় চাঙড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। কোথায় চলেছে কিছুই বুঝতে পারছে না ছেলেরা। কিছুক্ষণ পর সামনে দেখা গেল হাঁ করে রয়েছে যেন কালো গুহামুখ।

তাতে ঢুকে পড়ল গাড়ি। শক্তিশালী টর্চ জ্বেলেছে ডেভিড আর টোনার।

থেমে গেল সামনের গাড়িটা।

লাফ দিয়ে নামল ডেভিড। 'এসো তোমরা,' বলে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল।

আগ্নেয় পর্বতের গুহার গভীরে ঢুকে যেতে থাকল দলটা। অবশেষে টর্চের আলোয় ফুটে উঠল তিনটে বড় বড় বাক্স। গুহার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। কাঠ দিয়ে নতুন তৈরি করা হয়েছে। দেখতে অবিকল কফিনের মত।

সতেরো

বাক্সগুলো দেখে বুক কাঁপতে লাগল ছেলেদের। বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। কিশোরের কথাই যেন সত্যি প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।

কুঁড়েতে যখন কথাটা বলেছে কিশোর, তখনই ভয় পেয়ে গেছে মুসা, কারণ সাধারণত ভুল করে না গোয়েন্দাপ্রধান। কঠিন মেঝেতে একটা খাকি জ্যাকেট পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহটা আরও জোরদার হলো। ওটাতে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর মেজরের মনোগ্রাম লাগানো রয়েছে।

আর কোন সন্দেহ নেই। মহাকাশচারীকে ডেভিডরাই ধরে এনেছে।

কিশোরও দেখেছে জ্যাকেটটা। চট করে একবার মুসার দিকে তাকিয়েই আরেক দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। দু'জনের মনে একই ভাবনা চলছে। যে করেই হোক বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে, নোমারিকে পৌঁছতে হবে।

এমিকে ইশারা করল মুসা, কিশোর করল রেক্সকে।

হঠাৎ দৌড় দিল মুসা। গুহামুখের দিকে। তার পেছনে এমি আর কিশোর। রেক্স কিছু করার আগেই তাকে আটকে ফেলল ডেভিড।

এখন আর থামার সময় নেই। ছুটতে ছুটতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল তিন কিশোর। গুহার ভেতরে পিস্তলের গুলির শব্দ হলো। মুখের কাছে লুকিয়ে ছিল দু'জন লোক। সঙ্কেত শুনে বেরিয়ে এল তারা। কিশোর আর এমির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল মুসা। চোখের পলকে এসে ঘুসি মেরে বসল একজনের চোয়াল সই করে। লাগাতে পারল না। তার আগেই মাথা সরিয়ে নিয়েছে লোকটা। এমিকে ধরেছে সে: মাথায় বাড়ি মেরে কাবু করে ফেলল তাকে। অন্য লোকটার চোয়ালে ঘুসি মারল কিশোর। উফ করে উঠল লোকটা, কিন্তু কিশোরকে ছাড়ল না।

ছুটে বেরিয়ে এল ডেভিড আর টোনার। পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে শুইয়ে দিল মুসাকে। এমি আগেই চিত। একা কিশোর আর কিছুই করতে পারল না।

পকেট থেকে নাইলনের শক্ত দড়ি বের করে পিছমোড়া করে হাত বাঁধা হলো

তিনজনের।

গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন রেক্স। হতবাক হয়ে গেছেন। জিভ দিয়ে কয়েকবার শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেগুলোকে কি করবেন? ভয় পেয়ে গিয়েছিল ওরা…'

'চুপ!' ধমক দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিল ডেভিড।

টেনেটুনে দাঁড় করানো হলো মুসা আর এমিকে। মাথা ঘুরছে দু'জনের। টনটন করছে মাথার যেখানটায় বাড়ি খেয়েছে।

'বাক্সগুলো ভালই কাজে লাগবে,' বলে হা হা করে হাসল ডেভিড।

গম্ভীর হয়ে গেল ডেভিড। 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। বাক্সগুলো বের করা দরকার। কুঁড়েতে গিয়ে বসে থাকতে হবে। নির্দেশ পেলে তারপর যা করার করব।' দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সে, 'বাক্সগুলো বের করো।'

এক এক করে তিনটে বাক্সই বের করা হলো। তোলা হলো একটা গাড়িতে। দ্বিতীয় গাড়িটাতে তিন কিশোরকে উঠতে বলল ডেভিড। ওটা সে নিজেই চালাবে। তৃতীয়টাতে উঠবে টোনার, লোক দু'জন আর রেক্স।

কুঁড়েয় ফিরল আবার দলটা। ঠেলে এনে ধাক্কা দিয়ে তিন কিশোরকে বিছানায় বসিয়ে দেয়া হলো। নিজে নিজেই গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন রেক্স।

ডেভিড আর টোনারও বসল। লোক দু'জন গিয়ে মাটি সরিয়ে ট্র্যাপ-ডোর খুলে নেমে গেল নিচে, রেডিওরুমে।

'শেষ পর্যন্ত তিন গোয়েন্দাকে ধরতে পারলাম,' দাঁত বের করে হাসল ডেভিড।

'চিনলেন কি করে?' জানতে চাইল কিশোর।

'গাড়ি খাদে পড়ে যাচ্ছে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল তোমার দোস্ত, ইংরেজিতে। ধরাটা তাতেই পড়েছ।'

দাঁতে দাঁত চাপল মুসা, 'এসব করে পাড় পাবেন না আপনি!'

নীরবে হাসল আবার ডেভিড, 'পাড় পেয়ে গেছিই ধরে নিতে পারো। তবে বড় জ্বালান জ্বালিয়েছ তোমরা স্বীকার করতেই হবে। ভেবেছিলাম রকি বীচেই কব্জা করে ফেলব। তোমাদেরকে অতটা আণ্ডার এস্টিমেট করা উচিত হয়নি।'

সাপের মত হিসহিস করে উঠল এমি, 'এখনও অত সহজ ভেবো না! আমার বাড়িতে এসে আমাকেই কিছু করে চলে যাবে, এতই সহজ,' বলে আইসল্যাণ্ডিকে একটা গাল দিল, যার অর্থ 'নোংরা বিদেশী কোথাকার'।

গালটা হজম করল ডেভিড। হাসি মুছল না। অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'বিদেশী বলছ কেন?' টোনারকে দেখিয়ে বলল, 'মিস্টার টোনারেস্কু আর আমার আইসল্যাণ্ডিক পাসপোর্ট আছে।'

'নিশ্চয় জাল?' বাঁকা চোখে তাকাল মুসা।

'আমাদের সরাতে চান কেন?' রাগারাগির মধ্যে গেল না কিশোর, তথ্য আদায় করতে চায়।

'আমরা জানি মহাকাশচারীদের কেসে কাজ করছে তোমাদের বন্ধু গোয়েন্দা

ভিকটর সাইমন। সে-ই তোমাদেরকে পাঠিয়েছে এখানে তদন্ত করার জন্যে।'

শক্ত হয়ে গেল কিশোর। সবই জানে তাহলে স্পাইগুলো! মিস্টার সাইমনকেও ধরার চেষ্টা করবে না তো? নাকি ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছে?

'তখন আপনি রেক্স হলোবিয়রন্‌সন সেজে তিন লাখ ডলার মেরে দিতে চাইলেন?'

'তিন লাখ? ফুহ্‌!' নাক কুঁচকাল ডেভিড। 'ওটা কোন টাকাই না। তোমাদের ঠেকাতে না পারলে আরও অনেক বেশি চলে যেত আমাদের, সে জন্যেই ধরলাম। বহুবার নানা ভাবে সাবধান করেছি, শোনোনি। এখন আর সে সুযোগ নেই। অনেক কিছু জেনে ফেলেছ তোমরা। বাঁচিয়ে রাখা আর চলবে না।'

'বিচ্ছু বাঁচিয়ে রেখে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই,' খিকখিক করে হাসল টোনার। 'সুযোগ দিলেই হুল ফোটাবে। বড় বেশি পিচ্ছিল বিচ্ছু তোমরা। এয়ারপোর্টে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে কেটে পড়লে, হিমবাহ থেকে পালালে...'

'বলছ যে আবার লজ্জা করে না!' ধমক দিল ডেভিড। 'তোমার গাধামির জন্যেই তো হলো। প্লেনের ইঞ্জিন ঠিকমত টিউন করে রাখতে পারতে যদি, ওদেরকে নিয়ে ঠিকই পূর্ব উপকূলে আমাদের...'

'আমাকে করতে বললে কেন?' রেগে উঠল টোনার। 'তখনই তো বলেছি, ভাল মেকানিককে ডাকো, আমি প্লেনের ইঞ্জিনের কি বুঝি...'

কথায় বাধা পড়ল। ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে মাথা বের করে বলল তার এক সহকারী, 'যোগাযোগ করেছি। প্ল্যান বি-এর অপারেশন চলছে। রওনা হয়ে গেছে ওরা।'

হাসি ফুটল ডেভিডের মুখে, 'গুড।'

ভাবছে কিশোর। লোকটার মুখ থেকে কথা আদায় করা দরকার। খোঁচা না দিলে বেরোবে না। বলল, 'খুব চালাক মনে করেন নিজেদের, না? অত সহজে পার পাবেন না, মুসা ঠিকই বলেছে। আপনাদের কাণ্ডকারখানা সবই আমাদের জানা। নাসার গোপন তথ্য না দিলে মেজর পিটারকিনকে গন্ধকের গুহায় ঠেলে ফেলে দেয়ার ভয় দেখিয়েছেন। আমরা যেমন জানি, আইসল্যাণ্ডের সরকারী অফিসাররাও অনেকেই জানেন।'

লোকটাকে চমকে দিতে পারল কিশোর। থামল না, বলল, 'এত করেও নিশ্চয় মেজরের মুখ খোলাতে পারেননি, তাই না?'

'বলবে না আবার! কোনমতে একবার এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারলেই বাপ বাপ করে বলবে।'

'প্ল্যান বি-টা কি?' জিজ্ঞেস করল এমি।

মাথা নাড়ল ডেভিড, 'তোমাদের জানার দরকার নেই।'

উঠে চলে গেল রেডিও রুমে। একটা মেসেজ পাঠাতে শোনা গেল। ফিরে এসে বেরোনোর নির্দেশ দিল ছেলেদের।

বেরিয়ে এল ওরা।

অনেক অনুরোধ করলেন রেক্স, শুনল না লোকগুলো, ছেলেদেরকে বাক্সের মধ্যে ভরলই। ডালা নামিয়ে হুক আটকে দিল।

গাড়িতে বাক্সগুলো তুলতে রেক্সকে বাধ্য করল ডেভিড।

রওনা হলো গাড়ি। শুরু হলো ঝাঁকুনি। উঁচুনিচু পথ। পিঠে ব্যথা লাগছে। শুয়ে শুয়ে অন্ধকারেই চোখ মেলে রইল কিশোর। খুব পাতলা এক চিলতে ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। যাক, বাতাস আসার ব্যবস্থা আছে, দম বন্ধ হয়ে মরবে না।

জীপটার কাছে চলে এসেছে ওরা। অর্ধেক পথ এসেছে, অনুমান করল কিশোর, এই সময় ভয়ে চিৎকার করে উঠল টোনার, 'ওই যে, ওই যে! ঘোড়া খেতে আসছে!'

'ধরতে পারলে আমাদেরও ছাড়বে না,' ডেভিড বলল।

আইসল্যাণ্ডিকে চিৎকার করে বললেন রেক্স, 'ইসবিয়র্‌ন্‌।'

শব্দটার মানে জানা আছে কিশোরের, ইংরেজিতে কেউ বলে আইস বিয়ার, কেউ পোলার বিয়ার। বাংলায় একটাই মানে, মেরু ভালুক। মনে পড়ল, কোস্ট গার্ডের পাইলট বলেছিল কয়েকটা ভালুক এসে উঠে পড়েছে দ্বীপে। বোধহয় সেগুলোই আসছে আক্রমণ করতে। পেটে খিদে থাকলে মানুষ, ঘোড়া সব খায় মেরু ভালুক।

যে ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে তাতে চোখ নিয়ে গিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে। পুরোপুরি আকৃতিটা চোখে পড়ল না, কেবল মনে হলো সাদা একটা বিরাট কিছু এগিয়ে আসছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে গাড়ি থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল ঘোড়াগুলো। কিশোর যে গাড়িটাতে রয়েছে সেটার ঘোড়াটা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে খাড়া হতে গিয়ে আরেকটু হলেই উল্টে দিয়েছিল গাড়ি।

রাইফেলের গুলির শব্দ হলো।...একবার...দুই বার...ভয়াবহ গর্জন শোনা গেল। গোঙাতে লাগল আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো।

'গাধা কোথাকার!' ধমকে উঠল ডেভিড, 'গুলিটাও ঠিকমত করতে পারে না! জখম করেছে!...ভাগ...জলদি ভাগ, বাঁচতে চাইলে!'

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড় দেয়ার আওয়াজ শোনা গেল। ছুটে পালাচ্ছে লোকগুলো। মরিয়া হয়ে ছুটছে ঘোড়া। ভয় হতে লাগল কিশোরের, বাক্সটা না খুলে পড়ে যায়। কঠিন লাভার ওপর পড়লে হাড়গোড় আর একটাও আস্ত থাকবে না। বাক্সের মধ্যে কাঠ হয়ে রইল সে।

তারপর এক সময় সব গোলমাল থেমে গেল। নীরব হয়ে গেল চারপাশটা। রেক্সের খসখসে কণ্ঠ শোনা গেল বাক্সের কাছে, 'ভালুকটা তাড়া করেছে ওদেরকে!'

ডালা উঠে যেতেই লাফিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। এমি আর মুসাকে বের করতে রেক্সকে সাহায্য করল।

'আপনি পালালেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দৌড়ে পালানোর চেয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়েছি, এটাই তো ভাল হয়েছে।'

'ভালুকের হাতে মুক্তি পেলে আবার ধরতে আসবে,' মুসা বলল, 'তার আগেই কেটে পড়া দরকার আমাদের।'

'তাহলে ওদের আর ধরা যাবে না,' কিশোর বলল। 'বাক্সগুলোকে পাথর দিয়ে ভরে দিলেই ওজন দেখে আর টের পাবে না আমরা যে বেরিয়ে গেছি। আপনি কি

থাকবেন, মিস্টার রেক্স? এমন ভাব করবেন, যেন ভেতরেই রয়েছি আমরা। ততক্ষণে আমরা ট্রলারে গিয়ে রেডিওতে সাহায্য চেয়ে পাঠাব।'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ নাবিক, 'থাকব। এতসব শয়তানী করে পাড় পেতে ওদের দেব না। থাকব আমি। তোমাদের কাজ তোমরা করো।'

দ্রুত হাত চালাল ছেলেরা। গায়ের জ্যাকেট খুলে লাভার টুকরো দিয়ে সেগুলো ভরে রেখে দিল বাক্সের মধ্যে। ডালা নামিয়ে হুক লাগিয়ে দিল আগের মত। কাজ শেষ। তখনও দেখা গেল না লোকগুলোকে।

'আমি এক কাজ করি,' রেক্স বললেন, 'ভালুকটা যেখানে হামলা চালিয়েছে ফিরে গিয়ে সেখানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার ভান করি। আমি বেহুঁশ, বাক্সের হুক খুলবে কে? সন্দেহ জাগবে না ওদের। ডালা খুলে দেখার কথা ভাববে না। তোমরা পালাও!'

আঠারো

মুহূর্ত দেরি না করে আর ছুটতে শুরু করল তিন কিশোর। ডেভিডরা আসার আগেই যদি কোনমতে গিয়ে ট্রলারে পৌঁছতে পারে তাহলে বাইরের সাহায্য পাওয়ার একটা আশা আছে।

আগে আগে ছুটছে কিশোর। এক সারিতে চলছে ওরা। কখনও সরু কখনও চওড়া হয়ে গেছে পথ। কোথাও পথের ওপর এসে পড়েছে লাভার চাঙড়। সেগুলো এড়ানোর জন্যে পাশ কাটাতে হচ্ছে। একপাশ থেকে মাথায় লাগার সম্ভাবনাও দেখা দিচ্ছে কোথাও কোথাও, সেসব জায়গায় মাথা নুইয়ে ফেলতে হচ্ছে।

এমনি করে করেই জীপের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

'আহ্, বাঁচলাম!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল এমি। উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। ইগনিশনে মোচড় দিতে যাবে, বাধা দিল কিশোর। 'না, এমি, স্টার্ট দিও না।'

'কেন?'

'জীপটা না দেখলে সন্দেহ করবে ওরা। বুঝে ফেলবে, আমরা নিয়ে গেছি।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো মুসা। 'এখন ওদেরকে কোনমতেই সতর্ক করা চলবে না।'

'কিন্তু ওরা জীপটা পেলে আমাদের ওভারটেক করে চলে যাবে,' যুক্তি দেখাল এমি। 'তখন এমনিতেই ধরে ফেলবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ভারি বোঝা নিয়ে আসতে হবে ওদেরকে। কোনমতেই জীপে জায়গা হবে না তিনটে বাক্স। আগে যাবে কি করে?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেমে এল এমি। ঘুরে এসে জীপের হুড তুলল।

'কি করো?' মুসার প্রশ্ন।

'একটা প্লাগ ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি। তাতে কিছুটা সময় অন্তত নষ্ট হবে ওদের।'

কয়েক মিনিটের বিশ্রামে শক্তি ফিরে পেয়েছে পেশীগুলো। আবার ছুটল ওরা।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে উপকূলের দিকে।

অবশেষে সাগরের ধারে ফোড়ার মত ফুলে ওঠা উঁচু জায়গাটায় এসে উঠল তিনজনে। ওপরে উঠে নিচে তাকাল। পাথুরে কঠিন উপকূলে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ, ফেনায় ফেনায় সাদা। আগের জায়গাতেই বাঁধা আছে নোমারিক। দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে।

জাহাজটার দিকে তাকিয়ে হাঁপ ছাড়ল কিশোর।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা।

জাহাজে উঠেই রেডিওর কাছে যেতে চাইল মুসা, বাধা দিল কিশোর, 'দাঁড়াও। ভেবে নিই। ডেভিডের কোন লোক কোথাও রেডিও খুলে বসে আছে কিনা জানি না। থাকলে আমাদের মেসেজ ব্লক করে দিতে পারে। গোলমাল করে বাধা তো অন্তত দিতেই পারবে।'

'ঠিক,' এমি বলল, 'তখন ওদের প্ল্যান বদল করে অন্য কিছু করবে। বেচারা রেক্সও ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন।'

'তাহলে?' ঠোঁট কামড়াল মুসা, 'আর তো কোন পথ দেখি না। লুকিয়ে থাকব? তারপর সুযোগ মত হামলা চালাব?'

হাসল এমি, 'হামলা, এবং বিজয়।'

'ওদের সঙ্গে পারব কেন আমরা? লোক বেশি, বন্দুক আছে...'

'আমি আর কথা বলতে পারছি না,' মুসা বলল, 'খিদেয় হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আগে কিছু খেয়ে নিই।'

তাকে সমর্থন করল কিশোর, 'ঠিক, পেট খালি থাকলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।'

খাবার বের করে গপগপ করে খেতে শুরু করল তিনজনেই। গলা শুকিয়ে গেছে। পানি দিয়ে গিলতে হচ্ছে বার বার। খেতে খেতেই আলোচনা করতে লাগল কি করে শত্রুদের ঠেকানো যায়। খাওয়াও শেষ হলো, একটা বুদ্ধিও বেরিয়ে গেল।

ঠিক হলো, জাহাজের পাশে ঝোলানো লাইফবোটটায় লুকিয়ে থাকবে মুসা। ব্রিজের একটা লকারে ঢুকে থাকবে কিশোর। এমি গিয়ে লুকাবে ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে।

'কাজটা সহজ হবে না,' কিশোর বলল। 'একসঙ্গে পারব না, একজন একজন করে কাবু করতে হবে।'

'যদি কেউ বিপদে পড়ে যাই?' প্রশ্ন তুলল এমি, 'যাকে কাবু করতে যাব তার সঙ্গে না পারি?'

'তখন আর লুকোছাপা নেই,' বলল মুসা, 'হুঙ্কার ছেড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব একসঙ্গে।'

'হ্যাঁ, উপায় না দেখলে তো তাই করতে হবে,' কিশোর বলল। 'ব্যাটাদেরকে বাঁধার জন্যে আগেই দড়ি নিয়ে রাখি।'

জাহাজে দড়ির অভাব থাকে না, লকারেই পাওয়া গেল। ব্রিজে চলে এল তিনজনে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে তীরের দিকে তাকাল এমি।

'যদি ওরা না আসে?'

'আসতেই হবে। আর কিছু করার নেই এখন ওদের, ট্রলারটা লাগবেই,' কিশোর বলল।

'আচ্ছা, ধরো এল ওরা। কাবুও করলাম। তারপর?'

'ওদেরকে এখানে বেঁধে রেখে গিয়ে গুহাটায় খুঁজব। আমার বিশ্বাস, ওখানে আরও কেউ আছে।'

'কে?' চোখ থেকে দূরবীন না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল এমি।

'হয়তো...'

'আসছে ওরা!'

পাহাড়ের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এসেছে একটা বিচিত্র মিছিল। আগে আগে আসছে জীপটা, তাতে চারজন লোক। পেছনে বাঁধা দুটো ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া বাদ দিয়ে গাড়ির সঙ্গে জুতে নেয়া হয়েছে। একটাতে দুটো বাক্স, আরেকটাতে একটা বাক্স আর রেক্স।

'যাও,' নির্দেশ দিল কিশোর, 'লুকিয়ে পড়ো।'

সে রয়ে গেল ব্রিজে। লকার খুলল। তাতে কেবল ক্যাপ্টেনের একটা কোট রাখা। ভেতরে ঢুকে টেনে দিল ধাতব দরজাটা। বাতাস চলাচলের জন্যে সামান্য ফাঁক করে রাখল।

ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে এসে বাথরুমের দরজার আড়ালে লুকাল এমি।

নৌকায় লুকাতে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে যেতে পারে, সে জন্যে সাবধান থাকতে হলো মুসাকে। মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে এসে ক্যানভাসের কভারের একটা কোণা উঁচু করল। ঢুকে পড়লে ভেতরে। ফাঁক দিয়ে চোখ বের করে তাকিয়ে রইল মিছিলটার দিকে।

ডকের কাছে এসে গাড়ি থামাল টোনার।

পেছনে ফিরে তাকিয়ে জোরে জোরে বলল ডেভিড, 'এসে গেছি। সাগর পাড়ি দেয়ার জন্যে রেডি হও সবাই।' শব্দ করে হাসল, তারপর ফিরল তার সহকারীর দিকে, 'কথা বলে না তো?'

'কি আর বলবে?' টোনার বলল, 'বুঝতে পেরেছে গণ্ডগোল করে লাভ নেই, হার স্বীকার করে নিয়েছে।' জীপের অন্য দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধরো, নামাও এগুলো।'

ধরাধরি করে বাক্সগুলোকে জাহাজের ডেকে তুলে রেলিং ঘেঁষে রাখা হলো। জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল ডেভিড।

চালু হলো ইঞ্জিন। মৃদু একটা কম্পন ছড়িয়ে গেল নোমারিকের শরীরে।

'ব্রিজে যাও,' রেক্সকে আদেশ দিল ডেভিড।

'কি করব গিয়ে?'

ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাঁকে নিয়ে চলল ডেভিড। দাঁড় করিয়ে দিল হুইলের সামনে। 'গ্রীনল্যাণ্ডের দিকে চালাও। আইসল্যাণ্ডের সীমানার বারো মাইল পেরোনোর পর গিয়ে বাক্সগুলো খুলবে।'

'কি করবেন ছেলেগুলোকে?' ছোট্ট খাঁড়ি থেকে জাহাজটাকে বের করে আনতে

শুরু করলেন রেক্স। 'মেরে ফেলবেন?'

লকারে থেকে সব শুনছে কিশোর। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল একবার, যদি ভালুকটা হামলা চালিয়ে না বসত তাহলে কি হত ভেবে।

'আমাকে কি করবেন?' কণ্ঠস্বর এমন করে তুলেছেন বৃদ্ধ নাবিক যেন ভীষণ ভয় পেয়েছেন।

'আগে গ্রীনল্যাণ্ডে গিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে।'

পিছিয়ে এল ডেভিড। এখন হামলা চালানো যায়। বেরোতে যাবে কিশোর, এই সময় সেখান থেকে চলে গেল লোকটা।

দরজা ফাঁক করল কিশোর। চাপা গলায় ডাকল, 'ক্যাপ্টেন?'

ভীষণ চমকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরলেন রেক্স। কিশোরকে দেখে আস্তে আস্তে ঢিল হয়ে এল মুখের পেশী।

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর। মুসা আর এমি কোথায় আছে, কি ওদের উদ্দেশ্য, জানাল। তারপর বলল, 'এর পর যে-ই ব্রিজে আসবে, যেতে দেয়া হবে না আর।'

মাথা ঝাঁকালেন রেক্স। হাসি ফুটেছে মুখে।

ক্যানভাসের নিচ থেকে উঁকি দিয়ে আছে মুসা। অলস ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে রেলিঙে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাল টোনারের দুই সহকারীর একজন। আস্তে বেরিয়ে এল সে। শব্দ না করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঝুলন্ত নৌকা থেকে বেরোতে গিয়ে শব্দ হয়েই গেল। ফিরে তাকাল লোকটা। ততক্ষণে ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছে মুসা। ডাইভ দিয়ে এসে পড়ল লোকটার ওপর, তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল ডেকে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে আবার উঠে দাঁড়াল লোকটা। তাজ্জব হয়ে গেছে। তার এই বিমূঢ় ভাবটা কাটার সময় দিল না মুসা, সোজা এসে ঘুসি মেরে বসল সোলার প্লেক্সাসে, কারাতের ক্লাসে বালি ভরা বস্তার ওপর যেভাবে প্র্যাকটিস করে ঠিক সেভাবে।

গায়ের জোরে মেরেছে মুসা। এই প্রচণ্ড আঘাত সইতে পারল না লোকটা, হুঁক করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে, বাঁকা হয়ে গেল শরীর। দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে। বিন্দুমাত্র সময় কিংবা সুযোগ কোনটাই দিল না তাকে মুসা; কানের লতির ঠিক নিচে হাতের একপাশ দিয়ে দা দিয়ে কোপানোর মত করে কোপ মারল। টুঁ শব্দ করতে পারল না আর লোকটা। গমের বস্তার মত থ্যাপ্পাস করে পড়ল ডেকে।

দ্রুতহাতে তার হাত-পা বেঁধে ফেলে তাকে নৌকায় তুলে দিল মুসা লোকটাকে পিটিয়ে বেহুঁশ করে দু'হাতে তুলে নৌকায় ফেলার পর নিজেকে টারজান টারজান মনে হতে লাগল। একটা গেল, বাকি রয়েছে আর তিনটে।

দ্বিতীয় লোকটাকে আসতে দেখা গেল এই সময়। চট করে একটা মোটা খুঁটির আড়ালে চলে এল মুসা। ভাল করে তাকালে তাকে অবশ্যই দেখতে পেত লোকটা কিন্তু তাকাল না, সে তো আর জানে না কাছাকাছিই শত্রু লুকিয়ে আছে। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে এগোল।

লোকটা সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঝট করে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল মুসা।

হোঁচট খেয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল লোকটা। গড়িয়ে সোজা হলো, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল মুসার দিকে। প্রথম লোক মতই অবাক হয়েছে, বিশ্বাস তে পারছে না নিজের চোখকে।

এই লোকটাকে কাবু করা প্রথমজনের মত অত সহজ হলো না। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। মারতে গেল তাকে মুসা। মাথা নুইয়ে ফেলে আঘাতটা এড়িয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা, 'বেরিয়ে গেছে! ডেভিড, ছেলেগুলো বেরিয়ে গেছে!'

চোখের পলকে সেখানে এসে হাজির হলো ডেভিড আর টোনার। পিস্তলে হাত দিতে গেল ডেভিড। মরিয়া হয়ে গেছে তখন মুসা। কোন রকম চিন্তাভাবনা না করে মাথা নিচু করে ছুটে গেল, একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে, সাহায্যের জন্যে ডাকল বন্ধুদেরকে।

লকার থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে সেখানে চলে এল কিশোর। এমিও বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টার থেকে। শুরু হলো মরণ পণ লড়াই। ছেলেরা জানে ধরা পড়লে মরতে হবে, ফলে বাঁচার চেষ্টায় শক্তি বেড়ে গেল ওদের দ্বিগুণ।

ডেভিডের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে মুসা, কিছুতেই পিস্তল বের করতে দিচ্ছে না। টোনারের সঙ্গে লড়ছে কিশোর। তৃতীয় লোকটাকে কাবু করার চেষ্টা করছে এমি। লোকটার গলা টিপে ধরে ডেকময় গড়াগড়ি করছে দু'জনে। গড়াতে গড়াতে ডেকের কাছে গিয়ে ঠেকল, কিন্তু গলা ছাড়ল না এমি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটার সঙ্গে পারল না সে। তার শার্টের কলার ধরে টেনে তুলল লোকটা। রেলিঙের ওপর দিয়ে পানিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

দিতও, কিন্তু সময় মত সেখানে পৌঁছে গেলেন রেক্স। ভালুকের থাবার মত বিশাল থাবা দিয়ে লোকটার গলা চেপে ধরলেন।

লোকটার গলাটারই যেন সমস্ত দোষ আজ, একবার অনেক চেষ্টা করে রেহাই পেয়েছে এমির হাত থেকে, এবার আর পারল না। এমি আর রেক্স মিলে তাকে ধরে তুলে রেলিং ডিঙিয়ে পানিতে ফেলে দিলেন।

ঢেউ তেমন নেই, তাই রক্ষা। হাবুডুবু খেতে খেতে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চিৎকার শুরু করল সে। টান দিয়ে একটা বয়া খুলে নিয়েই তার কাছে ছুঁড়ে দিল এমি। দেখতে দেখতে জাহাজের অনেক পেছনে পড়ে গেল লোকটা।

টোনারের সঙ্গে পারল না কিশোর, কাহিল হয়ে আসছে ক্রমে, এতক্ষণ যে টিকেছে এইই বেশি। তার পাশে এসে দাঁড়াল এমি। সাহায্যকারী দেখে আবার কিছুটা বল ফিরে পেল কিশোর। নতুন শত্রু দেখে মুহূর্তের জন্যে চোখ ফিরিয়েছিল টোনার, সুযোগটা কাজে লাগাল সে। কারাতের ক্লাসে শেখা একটা প্রচণ্ড মার মেরে বসল লোকটার ঘাড়ে। শক্তিশালী অন্য লোকে মারলে মরেই যেত টোনার, কিন্তু কিশোর মেরেছে তো, তাই কেবল বেহুঁশ হলো।

মুসাকে ঠেলতে ঠেলতে রেলিঙের কাছে নিয়ে গেছে ডেভিড। পানিতে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। পারল না, তার আগেই সেখানে হাজির হয়ে গেল কিশোর,

এমি আর রেক্স। একা মুসাকে কাবু করতেই হিমশিম খাচ্ছিল, আরও তিনজনের বিরুদ্ধে কিছুই করার থাকল না তার।

হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো বন্দিদের।

ডেভিডকে রেলিঙের ওপরে রেখে পানিতে ঠেলে ফেলার হুমকি দিলেন রেক্স। 'ছেলেগুলোকে মারতে চেয়েছিলে না? এইবার কেমন!'

সাঁতার জানে না ডেভিড। আতঙ্কে চেঁচিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল।

রেলিঙের এপাশে এনে তাকে হাত থেকে ছেড়ে দিলেন রেক্স। ধপ করে ডেকে পড়ল ডেভিড। ব্যথা পেল। তাকে ব্যথা দিতেই চেয়েছেন তিনি।

শত্রুরা সব পরাজিত, আবার জাহাজের দায়িত্ব নিলেন রেক্স। ব্রিজে গিয়ে রেডিওতে কোস্ট গার্ডের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তারপর মুখ ঘোরালেন জাহাজের। কয়েক মিনিট পরেই বয়া ধরে ভেসে থাকা লোকটাকে দেখা গেল। তুলে নেয়া হলো তাকে। পানিতে থেকে ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে সে।

আবার খাঁড়ির দিকে চলল নোমারিক।

খালের মুখে ঢুকে ডকে জাহাজ ভেড়ালেন রেক্স।

'মিস্টার রেক্স, আপনি আর এমি জাহাজে থাকুন। আমি আর মুসা গুহাটার মধ্যে গিয়ে ভালমত দেখে আসি,' কিশোর বলল। 'দেখবেন, কোন মতেই যেন ছুটতে না পারে ব্যাটারা।'

'নিশ্চিন্তে চলে যাও,' হেসে বলল এমি। 'কোস্ট গার্ডরা নিশ্চয় মার মার করে চলে আসছে। তোমরা এসে দেখবে ওরা এসে পড়েছে।'

'বেশি বেশি করলে কফিনে ভরে পানিতে ফেলে দেব,' বললেন রেক্স। তাঁর সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছে ডেভিড আর তার লোকেরা, ভুলতে পারছেন না তিনি, রাগ যাচ্ছে না।

মুসা বলল, 'দাঁড়ান, আগে রবিন আর টমকে খুঁজে আসি। ওদের কিছু হয়ে থাকলে সত্যি সত্যি ব্যাটাদের পানিতে ফেলব আমি।'

'চলো, আর দেরি নয়,' তাগাদা দিল কিশোর। মুসাকে নিয়ে লাফ দিয়ে তীরে নামল সে।

জীপের পেছন থেকে ঘোড়ার গাড়ি খুলে নিল ওরা। মুসা বসল ড্রাইভিং সীটে, কিশোর তার পাশে।

যেখানে গাড়ি রেখে ঘোড়ায় করে ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিল ডেভিড সে জায়গাটায় পৌঁছতে দেরি হলো না। দেখল আগের জায়গাতেই ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। জীপ থেকে নেমে গিয়ে একেক জনে একেকটা ঘোড়ার পিঠে চাপল। কুঁড়েটার দিকে চলল।

কুঁড়ের কাছে এসে সাবধানে এগোল। বলা যায় না, পাহারায় কাউকে রেখে যেতে পারে ডেভিড।

কাউকে চোখে পড়ল না। বোধহয় নেই। ঘরে ঢুকল রবিন। একটা টর্চ খুঁজে পেয়ে নিয়ে এল। আবার চাপল ঘোড়ায়। গুহায় চলল।

আগের বার প্রথম ঢুকেছিল, তাছাড়া ওরা উত্তেজিত ছিল বলে ভালমত দেখতে

পারেনি গুহাটা। এখন দেখল, অনেক বড় গুহা।

ঘোড়া থেকে নেমে সাবধানে এগোল দু'জনে। চলে এল একেবারে শেষ মাথায়। মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখল একজন মানুষকে। পাশে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল কিশোর। 'দেখি, ধর, চিত করে শোয়াই।'

শোয়ানো হলো। টর্চের আলো পড়ল একটা ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য মুখে। চোখ বোজা।

আরি, এ কি! এ যে টম মার্টিন!

উনিশ

বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে টমকে। তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে ধরাধরি করে গুহার বাইরের আলো-বাতাসে নিয়ে আসা হলো তাকে।

'অবস্থা তো খারাপ দেখা যাচ্ছে!' শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মুসা।

নাড়ি দেখছে কিশোর। বলল, 'মরবে না। সুসংবাদটা ওকে দেয়া দরকার।'

'কিন্তু ভাল তো করে নিতে হবে আগে।'

সেবা-শুশ্রূষায় চোখ মেলল টম। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু এতটাই দুর্বল, পড়ে গেল আবার।

'থাকো থাকো, শুয়ে থাকো,' কিশোর বলল, 'ঠিক হয়ে যাবে।...টম, রবিন আর মেজর পিটারকিন কোথায়?'

চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না টমের। চোখে শূন্য দৃষ্টি, যেন দেখতেই পাচ্ছে না কিশোর আর মুসাকে।

দুই হাতে জোরে জোরে আবার তার গাল ডলতে শুরু করল মুসা। হাতের তালু ডলে দিতে লাগল কিশোর। বলতে লাগল, 'টম, ওঠো। দেখো, আমরা! আমি কিশোর। কি হয়েছিল, বলো। রবিন কোথায়?'

নড়ে উঠল টমের ঠোঁট, কিন্তু শব্দ বেরোল না।

তাকে উৎসাহ দিতে লাগল মুসা, 'বলো বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো...'

অবশেষে অনেক চেষ্টা করে যেন বলতে পারল টম, 'বোমা...বোমা পেতে রাখা হয়েছে...'

আঁতকে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ, মুসা! নিশ্চয় গুহায় বোমা পেতে রেখেছে...ধর ওকে...' বলতে বলতে টমের বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল সে।

আরেক দিক থেকে ধরল মুসা। টমকে টেনে নিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল দু'জনে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চাইল গুহার কাছ থেকে।

গুহামুখ থেকে অনেকখানি সরে এসে যখন নিরাপদ মনে করল কিশোর, থামল। ফিরে তাকাল পেছনে। এখনও ফাটছে না বোমা।

টমকে নিয়ে যেতে হবে জাহাজে। ঘোড়া আছে দুটো, আরও একটা দরকার।

গুহামুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'ওই যে আরেকটা ঘোড়া।'

পাশেই একটা তৃণভূমিতে চরছে ঘোড়াটা। ওরা ডাকল, কিন্তু ফিরেও তাকাল

না ওটা।

'গিয়ে ধরে নিয়ে আসি,' মুসা বলল।

'না। বোমাটা কখন ফাটবে কিচ্ছু জানি না। আদৌ আছে কিনা সেটাও শিওর না। তবু ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আরেকটু অপেক্ষা করে দেখি...'

আরও কয়েক মিনিট পর আর দাঁড়াতে রাজি হলো না মুসা। যা থাকে কপালে ভেবে দিল দৌড়। ভাবল, এই দৌড়টা যদি রকি বীচ হাই স্কুলে দিত, তাহলে ৪৪০ গজের একটা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে ফেলতে পারত।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল সে। ওটার দড়ি ধরল। টান দিতেই নির্দেশ মানল ঘোড়াটা, পাশে পাশে ছুটল।

বোমা ফাটার ভয়ে চোখ অর্ধেক বন্ধ করে রেখেছে মুসা। দরদর করে ঘাম ঝরছে কপাল থেকে।

ফাটল না বোমাটা। ঘোড়া নিয়ে নিরাপদেই ফিরে এল সে।

ধরে ধরে একটা ঘোড়ায় টমকে তুলে দিল কিশোর আর মুসা। ঘোড়াটার প্রায় ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে রইল টমের মুখ। সমস্ত বোধ-বুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছে।

'এভাবে যেতে পারবে না, পড়ে যাবে,' মুসা বলল। 'বেঁধে দিই বরং।' পকেট থেকে দড়ি বের করে কাজে লেগে গেল সে। তাকে সাহায্য করল কিশোর। তারপর টমের ঘোড়াটাকে মাঝে রেখে দু'জনে অন্য দুটো ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো।

মিনিটখানেকও পেরোল না, বিকট শব্দ হলো পেছনে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি। ভয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াগুলো। ভাগ্যিস বেঁধে রাখার বুদ্ধিটা এসেছিল মুসার মাথায়, নইলে ঘোড়া থেকেই পড়ে যেত টম। নিজেদের ঘোড়াগুলোকে তো সামলাতে হলোই টমেরটাকেও সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

ঘোড়া শান্ত করে ফিরে তাকাল মুসা। অনেক বড় হয়ে গেছে গুহামুখটা, ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভেতর থেকে। টম বোমার কথাটা বলতে না পারলে এতক্ষণে তিনজনেই শেষ হয়ে যেত, লাশও খুঁজে পেত না আর কেউ। তার বুকের কাঁপুনি থামতে সময় লাগল।

জীপের কাছে এসে কাজ সহজ হয়ে গেল। মুসা গাড়ি চালাল, টমকে ধরে রাখল কিশোর, ঝাঁকুনিতে যাতে পড়ে না যায়।

খেপা ড্রাইভারের মত গাড়ি ছোটাল মুসা। রাস্তা মোটেও ভাল না, ওই পথেও গাড়িটাকে চমৎকার সামলাল সে। সাংঘাতিক সরু পথে যখন দু'দিক থেকে দেয়াল চেপে আসে, ওগুলোর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়; কিংবা রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা বিশাল লাভার চাইয়ের পাশ কাটানোর সময়ও একটিবারের জন্যে কোন কিছুর সঙ্গে ঘষা লাগাল না।

উঁচু জায়গাটা দেখা গেল। সাগর তীরে পৌঁছে গেছে ওরা।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে নিচে তাকাল মুসা। ডকে এখন দুটো বোট দেখা গেল। কোস্ট গার্ডের ওই জাহাজটাকে চেনে সে, মেটিঅরলুগান। দুটো জাহাজের ডেকেই বেশ ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকেই এদিকে ডাক দিল সে। টমকে নামাতে

সাহায্য করার জন্যে। তারপর ফিরে এল আবার জীপে। কোস্ট গার্ডদের কথা জানাল কিশোরকে। গাড়ি চালাল আবার।

জীপ ডকে ঢুকতে না ঢুকতেই কয়েজন লোক নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন হুগুরাড।

'টমকে নামাতে হবে,' কিশোর বলল। 'সাংঘাতিক অসুস্থ। কথাই বলতে পারে না।'

দৌড়ে গিয়ে আবার জাহাজে উঠল দু'জন নাবিক। স্ট্রেচার নিয়ে ফিরে এল। টমকে নিয়ে যাওয়া হলো মেটিঅরলুগানের নিচের কেবিনে, সেখানে তার চিকিৎসা শুরু করলেন একজন ডাক্তার। গোয়েন্দাদের প্রশংসা করতে লাগলেন হুগুরাড। বার বার হাত মেলালেন দু'জনের সঙ্গে।

'একাজের জন্যে,' বললেন তিনি, 'আইসল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে মেডেল পাওয়া উচিত তোমাদের!···ডেভিড লোকটা একটা শয়তান। সব কথা আমাকে বলেছেন রেক্স। এমিও বলেছে।'

অপরাধীদের হাতকড়া পরিয়ে মেটিঅরলুগানে তোলা হয়েছে, কড়া পাহারায় আছে ওরা এখন, একথা গোয়েন্দাদেরকে বলছেন ক্যাপ্টেন, এই সময় শোনা গেল হেলিকপ্টারের শব্দ।

জাহাজের পেছনের ডেকে নামল কপ্টার। দরজা খুলে নেমে এলেন সুবেশী একজন মানুষ।

'আরি, মিস্টার সাইমন!' দৌড় দিল মুসা।

কিশোরও গেল।

'যাক, ভালই আছ তোমরা!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সাইমন। 'চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম আমি। ডিনামাইট নিয়ে খেলেছ তোমরা। প্রচুর বদনাম আছে ডেভিডের।'

'একদম খাঁটি কথা বলেছেন,' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'ডিনামাইট নিয়েই খেলে এসেছি। পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছে বোমা দিয়ে।'

হেলিকপ্টারের আর দরকার নেই। হাত নেড়ে গুডবাই জানিয়ে তার চপার নিয়ে উড়ে গেল পাইলট।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে কিশোর, মুসা ও মিস্টার সাইমনকে নিয়ে কেবিনে চলে এলেন হুগুরাড। বসল সবাই। আলোচনা শুরু হলো ঘটনাটা নিয়ে।

যে কেসটা নিয়ে টেকসাসে গিয়েছিলেন সাইমন, সেটার কথা বললেন। তদন্ত করে জানতে পারলেন, তাতে ইন্টারন্যাশনাল স্পাই হামক্রে ডেভিড জড়িত।

'কেসটা জেনেই বুঝলাম,' বললেন তিনি, 'কি ভয়ানক বিপদে আছে ছেলেগুলো। ছুটলাম। এসে তো দেখি সব সেরে বসে আছে।' হাসলেন ডিটেকটিভ।

'শেষ এখনও হয়নি,' কিশোর বলল। 'টম কথা বলতে পারলে অনেক কিছু জানা যেত। কখন যে বলবে···'

দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল একজন নাবিক। জানাল, আমেরিকান ছেলেটার

বোধ ফিরেছে।

লাফিয়ে উঠল কিশোর আর মুসা। ছুটল নিচের কেবিনে।

অনেকটা সুস্থ হয়েছে বটে টম, তবে সব কথা বলতে পারার মত হয়েছে বলে মনে হলো না।

সাইমন আর হুগুরাডও ঢুকেছেন কেবিনে। ক্যাপ্টেন বললেন, আরেকটু সময় দেয়া দরকার টমকে। খাবারও পেটে পড়া প্রয়োজন।

ডিনারের বেশি দেরি নেই। খানিক পরেই ঘণ্টা বাজল। বড় গোল একটা টেবিল ঘিরে বসল কিশোর, মুসা, এমি, মিস্টার সাইমন এবং হুগুরাড। রেক্স মার রয়েছেন তাঁর জাহাজে।

সকলেরই খিদে পেয়েছে। পেট ভরে খাওয়া হলো।

খাওয়ার পর বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলেন সাইমন। কোন কথারই জবাব দিতে চাইল না ওরা, চুপ করে রইল।

কিশোর, মুসা আর এমি বসে আছে তখন টমের বিছানার পাশে। ওকে কথা বলানোর চেষ্টা করছে। বলতে পারছে এখন টম, তবে কি কি ঘটেছে মনে করতে পারছে না। মাঝরাতের দিকে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কিশোর, মনে পড়েছে!'

একই কেবিনে বাংকে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে গোয়েন্দারা। টমের চিৎকারে লাফিয়ে উঠে বসল। তার বিছানার কাছে ছুটে গেল।

উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর বলল, 'বলো, বলে ফেল! এমির কাছে শুনলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা করার একটা মেসেজ পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। আকুরীরি থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। তোমাদের সাহায্য দরকার। একটা প্রাইভেট প্লেন ঠিক করা আছে রেকিয়াভিকে, সেটা নিয়ে চলে যেতে হবে।'

'দেখো কাণ্ড!' মুসা বলল, 'আর আমরা ভেবেছি জলপথে গেছ তোমরা। রবিন নাকি এমিকে সী-সিক পিলের কথা বলেছিল।'

'মজা লাগায় অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছিল রবিন। খেয়েই ভয় পেয়ে গেল। বলতে লাগল পেট জানি কেমন কেমন করছে। বমির ভয়ে কয়েকটা বড়ি কিনে সঙ্গে রেখেছে।'

মলিন হাসি হাসল মুসা, 'একেই বলে দুর্ভাগ্য। যেহেতু সী-সিক পিল, আমরা ভেবে বসলাম কিনা জলপথে গেছ তোমরা।'

'প্লেনে ওঠার পর মাথায় বাড়ি মেরে আমাদের বেহুঁশ করে ফেলা হলো,' বলতে থাকল টম। 'হুঁশ ফিরলে দেখলাম, হাত-পা বাঁধা। একটা গুহার কাছে ছোট্ট এক চিলতে খোলা জায়গায় প্লেন নামল। আমাদেরকে সরিয়ে নিয়েছে ব্যাটারা, তোমাদেরকে ঘায়েল করতে সুবিধে হবে মনে করে।'

'তারপর?' এমির প্রশ্ন।

'ওদের কথায় জানতে পারলাম, বাক্সে ভরে আমাদেরকে মেজর পিটারকিনের সঙ্গে গ্রীনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে, জাহাজে করে। যদি বাধা আসে, কোন অসুবিধে হয়, তাহলে অন্য কোন ভাবে পাঠাবে ওরা, যার নাম দিয়েছে প্ল্যান বি।'

মুসার দিকে চট করে তাকিয়ে নিল একবার কিশোর, তারপর আবার টমের

দিকে ফিরল, 'সেটা কি?'

'তা জানি না। বলাবলি করতে শুনলাম, পিটারকিন আর আমি এক সমান লম্বা, মোটামুটি দেখতেও নাকি এক রকম। আমার নাম আর পরিচয়ে তাঁকে পার করে দেয়া হবে।'

'কি ভাবে?' জানতে চাইল মুসা।

'জানি না। মেজর আর রবিনকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমাকে ওখানেই ফেলে রেখে বোমা ফিট করে দিয়েছে, সব চিহ্ন নষ্ট করে দেয়ার জন্যে। কাজটা তখনই সেরে ফেলতে চেয়েছিল ডেভিড, কিন্তু টোনারটা একটা নরকের শয়তান, স্যাডিস্ট। আমাকে খানিকক্ষণ মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার জন্যেই ওকাজ করেছে।'

হাত মুঠো হয়ে গেল কিশোরের। নিজের অজান্তেই যেন দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা শব্দ, 'জানোয়ার!'

'তবে তেমন সফল হতে পারেনি টোনার। মানসিক যন্ত্রণা পাওয়ার অবস্থা তখন আমার ছিলই না। ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে খাবার দেয়নি, পানি দেয়নি, আধমরা হয়ে গেছি ততক্ষণে। বোধই ছিল না কোন।'

টম যা যা বলেছে, কেবিনে ডেকে এনে সব জানানো হলো মিস্টার সাইমনকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিন আর মেজরকে কি গ্রীনল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

'বলতে পারব না। যা জানি বললাম, আর কিছু জানি না।'

আপাতত আর কিছু করার নেই। বাংকে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার ছেলেরা। মুসা আর ত্রমি ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কিশোরের চোখে ঘুম নেই। ভেবে বের করার চেষ্টা করছে, কিভাবে উদ্ধার করা যায় রবিনদেরকে? কোন উপায়ই দেখতে পেল না। ডেভিড কিংবা তার দলের কেউ মুখ খুললে হতো, কিন্তু ওরা বলবে বলে মনে হয় না।

ঘুমিয়ে গিয়েছিল। ভোরের দিকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসল। পেয়ে গেছে সমাধান। কি করে নিয়ে যাওয়া হবে মেজর আর রবিনকে, আন্দাজ করে ফেলেছে।

টম সাজিয়ে 'পার করা' হবে মেজরকে, নিশ্চয় কাস্টমস পার করবে। জলপথে নয়, তাহলে রেক্সকে দিয়ে জাহাজ ভাড়া করানোর প্রয়োজন পড়ত না। আইসল্যাণ্ড থেকে গ্রীনল্যাণ্ডে যাওয়ার আর একটাই উপায়, আকাশপথ, অর্থাৎ বিমান।

ছুটে গিয়ে সাইমনকে বলল কিশোর। তারপর দু'জনে গিয়ে বললেন ক্যাপ্টেনকে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখন রেকিয়াভিকে পৌঁছতে হবে।

সকালের নাস্তা শেষ হতে হতেই রেকিয়াভিক বন্দরে পৌঁছে গেল জাহাজ।

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়ল গোয়েন্দারা। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ছুটল এয়ারপোর্টে। টমকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়ল এমির ওপর।

বিমান বন্দরে পৌঁছে তাড়াহুড়া করে পাসপোর্ট কন্ট্রোলে ঢুকল গোয়েন্দারা। একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললেন সাইমন। জানা গেল, রবিন মিলফোর্ড আর টম মার্টিন নামে দু'জনকে গেট পার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওরা অসুস্থ, তাই স্ট্রেচারে করে নেয়া হয়েছে।

'কিন্তু ও টম মার্টিন নয়,' বলে বসল মুসা।

'কে তাহলে?' অবাক হলেন অফিসার।

রাখঢাক করে যতটা বলে বোঝানো সম্ভব, ততটাই বললেন সাইমন।

'তাহলে তো এক্ষুণি প্লেন আটকানো দরকার! স্কটল্যাণ্ডের প্লেন আটটা তিরিশে ছাড়ার কথা। দাঁড়ান, দেখছি!'

'স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছে ওরা! গ্রীনল্যাণ্ড না!' প্রায় চিৎকার করে বলল বিস্মিত কিশোর।

'না।' গোয়েন্দাদেরকে তাঁর অফিসে নিয়ে এলেন অফিসার। ওদেরকে বসতে বলে দ্রুত একটা মেসেজ পাঠালেন টাওয়ারে।

সঙ্গে সঙ্গে মেসেজটা বিমানে রিলে করে দেয়া হলো। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না।

অফিস থেকে ছুটে বেরোলেন চারজনে। রানওয়ের শেষ মাথায় চলে গেছে বিমান, হোয়াইট লাইন অতিক্রম করতে যাচ্ছে।

'মিস্টার সাইমন, থামাতে হবে ওটাকে, যে করেই হোক!' গলা কাঁপছে কিশোরের। 'মুসা, এসো আমার সঙ্গে।' বলেই দৌড় দিল খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এয়ারপোর্টের একটা জীপের দিকে।

মুসাকে হুইল ধরতে বলে নিজে লাফিয়ে উঠে বসল পাশের সীটে। ফিরে তাকিয়ে দেখল ছুটে আসছেন সাইমন, কিশোরের উদ্দেশ্য বোধহয় বুঝে গেছেন তিনি। তাঁর পেছনে আসছেন বিস্মিত অফিসার।

তাঁরা কাছে চলে এলে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। অত সময় নেই। মুসাকে তাড়াতাড়ি জীপ ছাড়তে বলল কিশোর।

ছুটতে শুরু করল জীপ। মুসা ভাবছে, এ যাত্রায় অনেক কিছুই হওয়া গেল। রেক্সের জাহাজে হয়েছিল টারজান, এখন সাজতে যাচ্ছে জেমস বণ্ড ছবির রজার মুর। ভালই। কিশোরের কথামত সোজা বিমানের দিকে গাড়ি ছুটিয়েছে সে।

ছুটে আসছে বিশাল বিমানটা। দানবীয় ইঞ্জিনের বিকট শব্দে কান ঝালাপালা। যদি না থামে, মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটতে যাচ্ছে প্লেন আর জীপের।

বিশ

থামছে না বিমান। বুক কাঁপছে কিশোরের। তবে আশ্চর্য শান্ত রয়েছে মুসা। মরার ডর তো নেইই, বরং মজাই পাচ্ছে যেন। ওকে এখন দেখলে কল্পনাই করতে পারবে না কেউ, ভূতের নাম শুনলেই আতঙ্কে কুঁকড়ে যায় এই ছেলেটি।

থামল না বিমান। ধাক্কা লাগে লাগে। শেষ মুহূর্তে বাঁয়ে কাটল মুসা। আশ্চর্য দক্ষতায় গাড়িটাকে সরিয়ে নিয়ে এল। মাথার ওপর দিয়ে হুসস করে বেরিয়ে গেল বিমানটা। এগজস্ট দিয়ে বেরোনো গরম হাওয়া ঝাপটা দিয়ে গেল দু'জনের গায়ে, ছ্যাঁকা দিয়ে নাকমুখ পুড়িয়ে দিতে চাইল যেন।

নাক কোণাকুণি করে ওপরে উঠে যাচ্ছে বিমানটা। অনেক ওপরে উঠে তারপর

সোজা হবে।

টাওয়ারের দিকে ছুটে যাচ্ছেন সাইমন আর অফিসার। মুসাকে সেদিকে যেতে বলল কিশোর।

ছুটল মুসা। টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে কিশোর দেখতে পেল জানালায় অনেকগুলো মুখ, এদিকেই তাকিয়ে আছে। ও তাকিয়েছে বুঝতে পেরে হাত নাড়ল কেউ কেউ।

হুড়মুড় করে টাওয়ারের রেডিও রুমে ঢুকল চারজনে।

রেডিও বাজছে। স্কটল্যাণ্ডগামী প্লেন থেকে কথা বলছে একটা কণ্ঠ ঃ ...কেউ আমাদের পিছু নিলে পাইলটকে গুলি করা হবে!

'ব্যাটারা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না!' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কিশোর।

'যাবে কোথায়? ধরা পড়তেই হবে!' ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসে উঠলেন টাওয়ার কন্ট্রোলার।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে বিমানটাকে দেখতে লাগলেন মিস্টার সাইমন। ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল ওটা। দূরবীন সরিয়ে তাকালেন রাডারের পর্দার দিকে। পুবে গেছে বিমানটা, তারই নির্দেশ দিচ্ছে রাডার।

'শেষ পর্যন্ত চলেই গেল!' কেঁদে ফেলবে যেন মুসা।

'স্কটল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' সাইমন বললেন। 'উত্তরে ঘুরছে।'

পুরো একশো আশি ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে পশ্চিমে নাক ঘোরাল বিমানটা।

ইতিমধ্যে পুলিশ আর সিকিউরিটির লোকজনও এসে হাজির হয়েছে টাওয়ারে। জরুরী আলোচনা করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলল তারা। কেফ্লাভিকের আমেরিকান বেজ আর গ্রীনল্যাণ্ডের ড্যানিশ এয়ার ফোর্সকে সতর্ক করে দেয়া হলো। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুটো ঘাঁটি থেকে আকাশে উড়ল প্রায় একডজন বিমান।

আফসোস করল মুসা, 'ইস্, এই প্লেন তাড়ানোর খেলায় যদি শরীক হতে পারতাম!'

'এখন তোমাদের আর কিছু করার নেই,' বলে উঠলেন পাশে দাঁড়ানো লম্বা এক ভদ্রলোক। আমেরিকান এয়ার ফোর্সের লোক তিনি। নিজের পরিচয় দিলেন, কর্নেল মেরিট কিনশেড। 'তবে নারসারসুয়াকে তোমাদেরকে প্রয়োজন হবে আমাদের।'

'ওখানেই নামছে নাকি প্লেনটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওরা তো নামতে চাইবে না, তবে আমরা জোর করে নামানোর চেষ্টা করব। চারপাশ থেকে প্লেন দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে ওদের।'

গোয়েন্দাদেরকে টাওয়ার থেকে বের করে নিয়ে এলেন কর্নেল। ফীল্ডে দাঁড়িয়ে আছে একটা সামরিক জেট বিমান। তাতে উঠতে বলা হলো ওদেরকে।

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রীনল্যাণ্ড পৌঁছে যাব আমরা,' কর্নেল জানালেন।

সীটবেল্ট বেঁধেও সারতে পারল না ছেলেরা, তীব্র গতিতে আগে বাড়ল জেট

বিমান। সীটের হেলানের সঙ্গে পিঠ চেপে বসে গেল ওদের। প্রবল বেগে বাতাস কাটার কারণে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে আকাশে উঠে গেল বিমান, একপাশের ডানা পুরো কাত করে ঘুরে গিয়ে নাক ঘোরাল পশ্চিমে।

শরীর ঢিল করে দিয়ে বসল যাত্রীরা।

'আমাদের প্ল্যান মাফিক ঘটনা ঘটলে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারব আমরা,' কর্নেল বললেন।

'কিন্তু যদি বেপরোয়া হয়ে যায় কিডন্যাপাররা?' কিশোর বলল, 'যদি ধ্বংস করে দেয় বিমানটাকে?'

'তা তো দিতেই পারে। সেক্ষেত্রে, সত্যি বলতে কি, আমাদের কিছুই করার থাকবে না। দেখা যাক, কতটা কি হয়?'

খড়খড় করে উঠল বিমানের দেয়ালে বসানো স্পীকার। পাইলট বললেন, 'ওটা কাছে চলে আসছে।'

কথা শেষও হলো না তাঁর, ধমক দিয়ে বসল একজন হাইজ্যাকার, 'খবরদার, কাছে আসবে না! জোর করে নামানোর চেষ্টা করলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব প্লেন!'

পিছু নেয়া বিমানগুলোর একটা থেকে রিপোর্ট করা হলো, নিচের দিকে নাক কোণাকুণি করে ফেলেছে প্লেনটা, ডাইভ দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তে যাওয়ার মত করে।

মাইক্রোফোনে আদেশ দিলেন কর্নেল, 'সরে এসো। চোখের আড়াল করবে না।'

'লোকগুলো বদ্ধ উন্মাদ!' ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন সাইমন। 'এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা!'

মাইক্রোফোনে কথা বলে চলেছেন কর্নেল, নির্দেশের পর নির্দেশ দিচ্ছেন, এই সময় কথা বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ, 'মেজর পিটারকিন বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

সন্দেহ ফুটল কর্নেলের চোখে। সাইমনের দিকে তাকালেন একবার, তারপর বললেন, 'ওসব ভাঁওতাবাজি করে কোন লাভ নেই। ফায়দা হবে না।'

'ভাঁওতা নয়। আমি সত্যিই মেজর পিটারকিন। সব কন্ট্রোলে নিয়ে এসেছি আমি আর রবিন। নারসারসুয়াকে দেখা হবে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

আনন্দ আর উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল কিশোরদের বিমানে।

খানিক পরেই গ্রীনল্যাণ্ডের পর্বতের চূড়া চোখে পড়ল। আরও কয়েক মিনিট পর নারসারসুয়াক বিমান বন্দরের ওপর চক্কর দিতে লাগল বিমান। মাটি ছুঁল চাকা। ট্যাক্সিইং করে এসে থামল মাঠের একধারে।

পাইলট ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই হাইজ্যাকারদের প্লেনটা দেখে ফেলল কিশোর আর মুসা। মাঠের ওপরের আকাশে একবার চক্কর দিয়েই নামার জন্যে প্রস্তুত হলো।

প্রায় লেজের কাছেই লেগে রয়েছে দুটো সামরিক বিমান। জেটলাইনারটাকে যেন এসকর্ট করে নিয়ে এসে থামাল লোডিং এরিয়াতে। দ্রুত পেছনের দরজার

কাছে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ি লাগানো হলো। দরজা খুলে গেল। পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল ভীত-সন্ত্রস্ত যাত্রীরা।

সিঁড়ির গোড়ায় অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা। তাদের সঙ্গে কর্নেল কিনশেডও রয়েছেন। শেষ যাত্রীটি নেমেও সারতে পারল না, লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল মুসা। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। তার পেছনে রইল কিশোর, সাইমন আর কিনশেড।

ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, সীটের মাঝের গলিপথে পড়ে আছে দু'জন লোক। পিছমোড়া করে হাত বাঁধা। একজনের কপালের একপাশে গোলআলুর মত ফুলে আছে। আরেকজনের এক চোখের চারপাশ এতটাই ফুলেছে চোখই দেখা যায় না। অন্য চোখটা জ্বলছে।

ওদের পাশে একটা সীটে বসে আছে রবিন, পাহারা দিচ্ছে লোকগুলোকে। বিমানের ক্রুরাও রয়েছে কাছাকাছি। সবাই সতর্ক, আর কোন শয়তানী করতে দেয়া হবে না হাইজ্যাকারদের।

কিশোর আর মুসাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'তোমরা এসেছ! টমকে পেয়েছ!'

'পেয়েছি। ও ভাল আছে,' জবাব দিল কিশোর।

বন্দিদেরকে মিলিটারি পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হলো। ক্রুদের সঙ্গে নেমে এলেন লম্বা, সুদর্শন মহাকাশচারী মেজর পিটারকিন। পরিচয় দেয়া-নেয়া, হাত মেলানো, পিঠ চাপড়ানো চলল কিছুক্ষণ। তারপর তিন গোয়েন্দা, মিস্টার সাইমন আর মেজর পিটারকিনকে নিয়ে এয়ারপোর্টের অফিসে চলে এলেন কর্নেল কিনশেড।

তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বার বার গোয়েন্দাদেরকে ধন্যবাদ দিলেন মেজর।

'আমরা চেষ্টা করেছি মাত্র, বাঁচাতে পারিনি,' বিনয় দেখিয়ে বলল কিশোর, 'শেষমেষ নিজের প্রাণটা নিজেই রক্ষা করেছেন আপনি। কি করে করলেন কাজটা, শোনান না?'

'ড্রাগ দেয়া হয়েছিল আমাকে,' মেজর বললেন। 'সেটার ঘোর কাটতেই রবিনকে সঙ্কেত দিলাম, সেরে গেছে। তারপর যা করার সে-ই করল। এই রবিন, তুমিই বলো না।'

হিরো হয়ে গেছে রবিন। এত প্রশংসায় লজ্জাই পাচ্ছে। বলল, 'দুই হাইজ্যাকারের একজন গিয়ে পাইলটের দিকে পিস্তল ধরে রেখেছে। আরেকজন ছিল আমাদের কাছাকাছি। বুঝতেই পারেনি ঘোর কেটে গেছে আমাদের। আরেক দিকে তাকিয়ে ছিল। থাবা দিয়ে তার হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েই কনুই দিয়ে কষে এক গুঁতো মারলাম তার বুকে। তারপর কারাত। দমাদ্দম কয়েকটা কোপ মেরে দিলাম ঘাড়ে আর গলায়।' বলে কি করে মেরেছে হাত ঘুরিয়ে দেখাতে গিয়ে আরেকটু হলে মুসার গায়েই লাগিয়ে দিয়েছিল সে।

ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল মুসা। হেসে ফেলল সবাই।

রবিন বলল, 'টুঁ শব্দ করতে পারল না শয়তানটা। পড়ে গেল একটা সীটের ওপর। কপালে বাড়িটা তখনই খেয়েছে।'

'যাক, তোমার কারাতের প্র্যাকটিস এবার সত্যিই কাজে লাগল,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'আমি মেরু ভালুককে মারতে না পারলেও তুমি মেরুর শয়তানকে ঠিকই মেরেছ।'

'মেরুর শয়তান নয় ওরা,' মেজর বললেন, 'রুমানিয়ার শয়তান, আসছি সে কথায়। একটাকে কাবু করে সোজা গিয়ে ঢুকলাম পাইলটের কেবিনে। কল্পনাও করতে পারেনি দ্বিতীয় লোকটা, আমরা ওভাবে ঢুকে পড়ব। টেরও পেল না কখন বেহুঁশ হলো।'

'তাকে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছেন মেজর পিটারকিন,' রবিন জানাল।

'যাক, ভালয় ভালয় যে সব মিটল,' স্বস্তির সঙ্গে বললেন সাইমন। 'মেজর, আপনাকে ধরল কি করে ওরা বলুন তো?'

'গন্ধকের গর্তের কাছে। জায়গাটা দেখতে দেখতে আর সবার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলাম, হঠাৎ তিনজন লোক এসে পিস্তল ধরল। হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে গেল আমাকে, একটা গুহার মধ্যে ঢোকাল।'

'গুহাটা নেই আর এখন,' মুসা বলল, 'ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিয়েছে।'

'জানি। বোমা ফিট করে রেখে আমাকে আর রবিনকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সময় মত গিয়ে যে তোমরা টমকে উদ্ধার করতে পেরেছ···!' মেজর জানালেন ঘন্টার পর ঘণ্টা তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, নির্যাতনের হুমকিও দিয়েছে। কিন্তু নাসার গোপন কথা ফাঁস করেননি তিনি।

'গোপন কথাটা কি?' জিজ্ঞেস করে বসল মুসা।

থমকে গেলেন মেজর। তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'না শুনলেই কি নয়?'

এতই টপ সিক্রেট ব্যাপার, ওদেরকেও বলতে চান না মেজর, বুঝতে পেরে হাসল সে। মাথা নাড়ল, 'না, শুনতে চাই না। সরি।'

'ঠিক আছে, কিছুটা আভাস বরং দিই। এমন কিছু তথ্য আছে আমার কাছে, যেগুলো পেলে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে অনেক দামে বিক্রি করতে পারত ডেভিড। যাই হোক, আবার আমাকে ওরা গন্ধকের গর্তের কাছে নিয়ে গেল। যা জানি সেগুলো না বললে গর্তে ছুঁড়ে ফেলার হুমকি দিল,' মেজর বললেন।

'ওসব আসলে ভয় দেখানোর জন্যে করেছে,' কিশোর বলল।

'শুধু ভয় দেখানোর জন্যে নয়। টোনার লোকটা একটা স্যাডিস্ট। যত রকম উদ্ভট চিন্তা মাথায় খেলে তার। ওখানে নিয়ে গিয়ে গর্তে ফেলার ভয় দেখিয়ে এক ধরনের মজা পেতে চেয়েছে···'

'এবং বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ভুলে একটা মূল্যবান সূত্র ফেলে এসেছে,' কিশোর বলল। 'গর্তের কাছে গিয়ে পেয়ে গেছিলাম আমরা।'

'ভুলে নয়, ইচ্ছে করেই ফেলেছে, যাতে সবাই মনে করে আমি গর্তে পড়ে গেছি। পরের বার আমাকে সহ গর্তের কাছে ফিরে যাওয়ার এটাও আরেকটা কারণ। সব কিছু ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে করেছে ওরা।' দম নিলেন মেজর, তারপর বললেন, 'অনেক চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই আমার মুখ থেকে কথা আদায় করতে

পারল না, আবার নিয়ে গেল আমাকে ওদের ঘাঁটিতে। প্রথমবার নিয়েছিল কপ্টারে করে, পরের বার গাড়িতে করে।'

'হুঁ, এই জন্যেই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'প্রথমবার কোন হদিসই পাওয়া যায়নি কি করে নেয়া হয়েছে। হেলিকপ্টারে করে যে নিয়েছে ভাবতেই পারেনি কেউ।'

'পূর্ব উপকূলে একটা পরিত্যক্ত হেলিকপ্টার পাওয়া গেছে,' সাইমন বললেন। 'আমি শিওর, ওটা কিডন্যাপারদেরই জিনিস।'

'পূর্ব উপকূল? ঠিকই আছে। আমাদেরকে প্রথমবার যখন কিডন্যাপ করল ডেভিড, ওদিকেই নিয়ে চলেছিল। হিমবাহে আটকা পড়ার পর কপ্টারে করে এসে তাকে তুলে নিয়ে যায় টোনার।'

'একটা খাঁড়ির মধ্যে একটা স্পীডবোটও পাওয়া গেছে। আমার ধারণা, তোমাদেরকে নিয়ে গিয়ে সাগরে ফেলে দেয়ার ইচ্ছে ছিল ওদের।'

দুপুর বেলা তিন গোয়েন্দা, মিস্টার সাইমন আর মেজর পিটারকিন রেকিয়াভিকে ফিরে এলেন। ফরেন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তখনও মুখ খোলেনি ডেভিড আর টোনার। তবে ওদের এক সহকারী যা জানে বলে দিয়েছে।

ডেভিডরা ভাড়াটে গুপ্তচর, টোনার তার সহকারী। বিদেশী একটা সংস্থা ওদেরকে ভাড়া করেছিল আমেরিকান মহাকাশচারীকে সেদেশে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

হামবার নিকবারসন জানালেন, 'আইসল্যাণ্ডের মানুষ খুব আইন মেনে চলে, কিডন্যাপিঙের মত ন্যাক্কারজনক অপরাধের কথা কেউ ভাবতেই পারে না এখানে। ফলে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সেই সুযোগটাই নিয়েছে ওরা।'

'কিন্তু অনেক আগে থেকেই তো তৈরি হচ্ছিল ওরা মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, পাহাড়ের মধ্যেকার কুঁড়ে আর তার মাটির নিচের ঘরের অত্যাধুনিক রেডিও রুমের কথা ভেবে।

'অনেক দিন ধরে আছে লোকটা এখানে। আমাদের মিলিটারি বেজের ওপর নজর রেখেছে। তাছাড়া বেশ কিছুদিন থেকেই আইসল্যাণ্ডে আসার কথা হয়েছিল মহাকাশচারীদের, অন্য কাজে আটকে পড়ায় এতদিন আসতে পারেনি।'

সন্ধ্যার মধ্যে অনেক সেরে উঠল টম মার্টিন। তিন গোয়েন্দা, মেজর পিটারকিন আর মিস্টার সাইমনের সঙ্গে সাগা হোটেলের ছাতের ওপর বিশেষ ভাবে তৈরি রেস্টুরেন্টে ডিনার খেতে বসতে পারল। বন্দরের আলো চোখে পড়ে এখান থেকে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে সেদিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে কিশোর। ভাল লাগছে দেখতে।

স্মোকড্ ল্যাম্বের চমৎকার ডিশ চলছে, এই সময় ভাতিজিকে নিয়ে সেখানে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন হুরন। আপ্যায়ন করে তাঁদেরকেও বসানো হলো। আরও খাবার এল।

গোয়েন্দাদের অনেক প্রশংসা করলেন ক্যাপ্টেন।

কয়েক মিনিট পর আরও একজন এসে হাজির, তিনি রেক্স মার। গাঢ় রঙের স্যুট পরে এসেছেন। সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে।

আন্তরিক ভাবে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন সাইমন। ছেলেদের জন্যে যা করেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন।

'আমার জন্যেও ওরা অনেক কিছু করেছে, সেই তুলনায় কিছুই করতে পারিনি আমি,' ওয়েইটারের এনে দেয়া চেয়ারে বসতে বসতে বললেন বৃদ্ধ নাবিক। 'আমাকে ধনী বানিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'ওই টাকা দিয়ে কি করতে চান, মিস্টার মার?' জানতে চাইল মুসা। 'মাছধরা ট্রলার কিনবেন?'

'নিশ্চয়। আর কি যোগ্যতা আছে আমার…'

'আমাকে বাদ দিয়েই সবাই…' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা হাসিখুশি কণ্ঠ। টেবিলের কাছে এগিয়ে এল এমি।

'এসে গেছ,' মার বললেন। 'তোমাকেই খুঁজছিলাম মনে মনে। কিছুদিনের জন্যে আমার জাহাজে আমার অ্যাসিসটেন্ট হতে রাজি আছ?'

'না হওয়ার কি আছে?'

হাসল সবাই।

নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে চুপ করতে বলল কিশোর। 'একটা কাজ বাকি। গন্ধকের গর্তের কাছে একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমরা, সেটা তার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।' পকেট থেকে কালো একটা দস্তানা বের করে মেজর পিটারকিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

চোখ বড় বড় করে ফেললেন মেজর। বললেন, 'গোয়েন্দা বটে!'

'জা! জা!' একমত হলো মুসা।

—০—

কালো হাত

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯৩

'এবারের ছুটি কোথায় কাটাব আমরা, জানো? কল্পনাও করতে পারবে না!' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে জিনা।

রাফিয়ান বসে আছে তার পাশে। সে-ও তাকিয়ে রয়েছে আর সবার দিকে, জিনার মতই যেন জবাব শোনার অপেক্ষায়।

রবিন আর মুসা তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। ওরা বললে ঠিক না-ও হতে পারে, তাই আশা করছে জবাবটা দলপতিই দিক।

জিনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। আনমনে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। তার আশায় থেকে থেকে বিরক্ত হয়েই জিনাকে বলে ফেলল মুসা, 'ব্যাপার কি বলো তো? আমাদের তাড়ানোর মতলব করেছেন নাকি কেরিআন্টি?'

'শুধু তাড়ানো নয়, নিজেরাও তাড়িত হবেন,' হাসি বাড়ল জিনার।

'তাড়িত হবেন মানে? কোথায়?'

'বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি কোথাও?' রবিন জানতে চাইল।

মাথা ঝাঁকাল শুধু জিনা।

'আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

আবার মাথা ঝাঁকাল জিনা।

'আমাদেরকে তাহলে এখানে আসতে বললে কেন?' রেগে গেল মুসা।

'আগে কি আর জানি। আসার পর তো শুনলাম।'

'যাচ্ছিটা কোথায়, মানে কোথায় বিদেয় করছেন, সেটা বলে ফেলো না!' অধৈর্য হয়ে উঠেছে রবিন।

তার অস্থিরতা দেখে হেসে উঠল জিনা। মজা পাচ্ছে। কিছুই না বুঝে ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান। তার গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল জিনা। 'তুই চুপ কর। তোকে তো জিজ্ঞেস করিনি। কোথায় যাই সে তো দেখতেই পাবি।'

'সাগরের ধারের কোন গ্রীষ্মনিবাসে?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল জিনা, 'হলো না।'

'তাহলে কোন পার্বত্য এলাকায়?' রবিনের অনুমান।

'উঁহু।'

'কোথায় তাহলে!'

'সেটাই তো আন্দাজ করতে বলছি।'

আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর, 'আন্টিরা কোথায় যাচ্ছেন?'

থমকে গেল জিনা। তার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল কিশোর, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছি, নাকি একা?'

একটু চিন্তা করল জিনা। দাঁত দিয়ে নখ কাটল। আঙুলটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'যে কোন একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারি। কোনটা?'

'আন্টিরা কোথায় যাচ্ছেন?'

'সাগর ভ্রমণে।'

'বুঝেছি,' মাথা দোলাল কিশোর, 'আমরাও তাঁদের সঙ্গেই যাচ্ছি। এবার বলে ফেলো, কোথায়?'

'নাহ্, তোমাকে আর হারানো গেল না,' হেসে বলল জিনা। 'সামান্য একটা সূত্র কোনমতে ধরিয়ে দিতে পারলেই হয়। অমনি আন্দাজ করে ফেলবে। কোথায় যাচ্ছি, সেটাও আন্দাজ করো তাহলে?'

'সূত্র দাও। সব কথা পেটে রেখে দিলে কি করে হবে?'

'থাক, অত কথার মধ্যে গিয়ে আর কাজ নেই, বলেই ফেলি,' জিনা বলল। 'তোমার সঙ্গে পারা যাবে না।'

'চুপ করে আছো কেন তাহলে? বলে ফেলো না!' তাগাদা দিল মুসা।

বোমা ফাটাল জিনা, 'ভূমধ্যসাগর।'

'খাইছে!' চোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে যাবে মুসার।

'পাসপোর্টগুলো ঠিকঠাকমত এসেছে তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মানে, আমাদেরগুলো পাঠিয়েছে?'

ভুরু কোঁচকাল জিনা। হাঁ করে আছে মুসা আর রবিন। কিছু বুঝতে পারছে না।

'তুমি জানলে কি করে?' জানতে চাইল জিনা।

মিটিমিটি হাসছে কিশোর। 'দেখো জিনা, একটা কথা বোধহয় তোমার জানা নেই। আমাদের চিঠির বাক্সটা রোজ দুবার করে খুলে দেখি আমি, চিঠি আছে কিনা। এখান থেকে ওখান থেকে প্রচুর চিঠি আসে, বেশির ভাগই ব্যবসা সংক্রান্ত। পুরানো জিনিসের লিস্ট পাঠিয়ে জানতে চায় ওসব আমাদের ইয়ার্ডে আছে কিনা। কেউ বা চিঠি লেখে এই এই জিনিস আছে, কিনব কিনা। সমস্ত চিঠি খুলে খুলে আমাকেই পড়তে হয়...'

'তার মানে আম্মার চিঠিটা তুমি পড়ে ফেলেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'দোহাই লাগে তোমাদের, মঙ্গল গ্রহের ভাষা বাদ দিয়ে এখন পৃথিবীর ভাষা বলো, পৃথিবীর! ইংরেজি! কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

আর অন্ধকারে রাখল না ওদেরকে কিশোর। বলল, 'আন্টি চিঠি লিখেছেন চাচীকে, আমাদেরকে যেন ছুটি হলেই ছেড়ে দেয়া হয়। তোমার আর মুসার আম্মাকেও রাজি করানোর ভার চাচীর ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমাদেরকে যাতে আগে থেকেই কিছু না বলা হয়, সারপ্রাইজ দিতে চান। আমাদের পাসপোর্ট নিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন এখানে...'

রবিন বলে উঠল, 'এত সব কাণ্ড ঘটে গেল, আর আমরা কিছুই জানি না! তুমিও তো আমাদের বলোনি...'

'আন্টি মানা করেছেন, তাঁর মজাটা নষ্ট করতে চাইনি...'

'কিন্তু তুমি যেমন চুপ করে ছিলে, আমরাও তো পারতাম...'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। মুখ ফসকে বলে ফেলার অভ্যাস আছে মুসার...'

তাড়াতাড়ি মুসা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর, যা বলছিলে বলো।'

জিনার দিকে তাকাল কিশোর। চুপসে গেছে জিনা। সে-ও আগে থেকে কিছুই জানত না, এখানে এসে জেনেছে। ভেবেছিল জানিয়ে চমকে দেবে। হতাশ হয়েছে। সেটা বুঝতে পেরে কিশোর বলল, 'মন খারাপ করছ কেন? মুসা আর রবিনকে তো চমকে দিতে পেরেছ।'

কিসের এত উত্তেজনা কিছুই বুঝতে পারছে না রাফিয়ান। মৃদু স্বরে দুবার ঘাউ ঘাউ করেই চুপ হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে এর ওর মুখের দিকে।

'বাকিটা তুমিই বলো, জিনা,' কিশোর বলল।

'না, তুমিই বলো!'

বলতে লাগল কিশোর, 'দীর্ঘ যাত্রায় বেরোচ্ছি এবার আমরা। প্লেনে করে প্রথমে যাব ইংল্যাণ্ডে। প্রফেসর কারসওয়েলের কথা মনে আছে না? বিজ্ঞানী? টকারের আব্বা। ওদের ওখানেই যাব আমরা প্রথমে। তারপর সাউথহ্যাম্পটন থেকে জাহাজে।'

'তার মানে প্রফেসর কারসওয়েল আর টকারও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে!' রবিন বলল।

'হ্যাঁ।'

'সত্যি, খুব মজা হবে,' উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে মুসার।

'ভূমধ্যসাগরের ঠিক কোন জায়গায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সেটা কারোরই জানা নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'যাই হোক, রহস্য যাত্রা নাম দেয়া হয়েছে এই ভ্রমণের। কোথায় গিয়ে যাত্রা শেষ করবে জানানো হবে না যাত্রীদের। যাওয়ার পর দেখতে পাবে সবাই। ব্যবস্থা করেছে ইংল্যাণ্ডের একটা বিখ্যাত ট্র্যাভেল কোম্পানি। বিজ্ঞানী হিসেবে দুটো অনারারি টিকেট দেয়া হয়েছে প্রফেসর কারসওয়েল আর জিনার আব্বাকে। টকার শুনেই তার আব্বাকে চাপাচাপি শুরু করেছে আমাদের নেয়ার জন্যে।'

'এবং নিশ্চয় রাজি করিয়ে ফেলেছে,' মুসা বলল। 'যে জন্যে এরকম একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম আমরা।'

'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' অবাক লাগছে রবিনের, 'অতটা সময় অযথা নষ্ট করতে রাজি হলেন দুই প্রফেসর? ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকতেই তো পছন্দ করেন বেশি।'

'সে জন্যেই তো খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরেছে আম্মা,' জিনা বলল। 'বাপকে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে শেষে আম্মাকে অনুরোধ করে চিঠি

লিখেছে টকার। জোর করে আব্বাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আম্মা। বইয়ে মুখ গুঁজে থাকতে থাকতে ইদানীং শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে আব্বার। আর যেই আব্বা রাজি হয়েছে, প্রফেসর কারসওয়েলও রাজি। তাঁর ধারণা, জাহাজে চুটিয়ে জটিল সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন দুজনে মিলে। তবে আম্মা কাজ করতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে।'

'দুই প্রফেসর যখন একখানে হচ্ছেন, বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারবেন না আন্টি।'

'তা-ও ঠিক।'

'টকারের জন্যেই তাহলে আমরা যেতে পারছি,' মুসা বলল।

'তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'রাফির কি হবে? ওসব দামী জাহাজে তো শুনেছি কুত্তা-টুত্তা নিতে দেয় না।'

'এটাতে দেবে। রাফি তো যেতে পারবেই, টকারও তার বানরটাকে নিয়ে আসতে পারবে।'

বানর শব্দটা উৎসুক করল রাফিয়ানকে। ঘাড় কাত করে জিনার দিকে তাকাল সে। হেসে তার গলায় চাপড় দিয়ে জিনা বলল, 'হ্যাঁ, বানরই বলেছি। তোর খুব চেনা। নটি।'

লম্বা জিভ বের করে দিল রাফি। যেন হাসছে। বলল, 'ঘাউ!'

'শুরুটা তো খুব ভালই মনে হচ্ছে,' মুসা বলল। 'এখন শেষটা কেমন হয় কে জানে। গোয়েন্দা কাহিনী লেখকদের তো খুব প্রিয় একটা জায়গা জাহাজ। আমরাও ওখানে একআধটা রহস্য পেলে মন্দ হত না।'

'দেখা যাক। পেয়েও যেতে পারি। তবে না পেলেও খারাপ লাগবে না। ওরকম একখান ভ্রমণ, সময় ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যাবে, দেখো।'

'রওনা হচ্ছি কবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কাল।'

তিন গোয়েন্দাকে দেখে তো ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করল টকার। কল্পনাই করতে পারেনি সে, জিনার সঙ্গে ওরাও আসবে।

পুরানো বন্ধুকে দেখে নটিও খুব খুশি। একলাফে টকারের কাঁধ থেকে নেমে এসে রাফির একটা পা চেপে ধরল। রাফিও অভ্যাস বশত পা-টা বাড়িয়ে দিল হাত মেলানোর ভঙ্গিতে, মানুষের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে ব্যাপারটা রপ্ত হয়ে গেছে তার।

কিচির মিচির করতে লাগল বানরটা। রাফি কয়েকবার আস্তে আস্তে বলল, 'ঘাউ! ঘাউ! ঘাউ!' যেন তার ভাষায় বলল, 'কি নটি মিয়া, কেমন আছ? সাগরে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা সে খবর রাখো? তবে ভাই যা-ই বলো, এই পানিটানির চেয়ে বনে গেলেই ভাল করত ওরা। খরগোশ আছে, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, আরও কত প্রাণী। তোমার গাছ ভাল্লাগে না?'

'নিশ্চয়!' বলল নটি। গাছে চড়ে যে বাঁদরামি করতে ভাল লাগে, সেটা বোঝানোর জন্যেই যেন এক লাফে রাফির পিঠে চড়ে বসে তার দুই কান ধরে

ঝাঁকাতে শুরু করল।

জানোয়ার দুটোর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

শহর থেকে দূরে সাগরের ধারে বিগ হোলো নামে একটা গ্রামে থাকেন প্রফেসর কারসওয়েল। ওরকম নিরালা জায়গায় বাড়ি করেছেনই নিরাপদে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে। শহরে বড় ঝামেলা। পারত পক্ষে সেদিকে যেতে চান না তিনি।

সুন্দর বাগান আছে বাড়ির সামনে। দল বেঁধে সেখানে চলে এলো গোয়েন্দারা, আরামে বসে কথা বলার জন্যে। ঘরে হট্টগোল করলে কাজের ক্ষতি হয় বলে বিরক্ত হন কারসওয়েল। তাছাড়া আজ বন্ধুকে পেয়েছেন। মিস্টার পারকারকে নিয়ে সোজা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছেন। জিনার আম্মা গেছেন শহরে, কিছু কেনাকাটা করবেন।

বসে বসে ভবিষ্যতের নানা রকম পরিকল্পনা করছে ওরা, এই সময় বেরোল কারসওয়েলের হাউসকীপার ডোরা। মোটাসোটা, খাটো, মাঝবয়েসী একজন মহিলা। এক সময় সুন্দরীই ছিল।

'এই ডোরা, এসো এসো,' হাত নেড়ে ডাকল টকার। অনেক ছোটবেলায় তার মা মারা গেছেন, তারপর থেকে এই মহিলাোই তাকে মায়ের আদরে মানুষ করছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ভীষণ ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন কারসওয়েল। ডোরাকে পেয়ে তার হাতে ছেলেকে তুলে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

বন্ধুদের সঙ্গে ডোরার পরিচয় করিয়ে দিল টকার। কয়েকটা কথা বলেই মহিলাকে পছন্দ করে ফেলল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। রাফিও করল কয়েক মিনিট পরেই যখন চা খাওয়ার জন্যে ওদেরকে ডেকে নিয়ে গেল ডোরা।

অনেক বড় একটা চকোলেট কেক বানিয়েছে সে। আর দুই ধরনের স্যাণ্ডউইচ। একটা ঝাল, আরেকটা মিষ্টি; একটাতে দেয়া হয়েছে টমেটো, অন্যটাতে মধু। ঘরে তৈরি লেমোনেডও টেবিলে এনে রাখল সে।

খাবারের চেহারা দেখে একটা সেকেণ্ড দেরি করল না মুসা। বসে পড়ল। অন্যেরাও বসে পড়ল চেয়ার টেনে টেনে। প্রচুর কথাবার্তা সহযোগে চলল নাস্তা খাওয়া।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কে কিভাবে পাশ করেছে, সেই খোঁজ-খবর নেয়া হলো প্রথমে। এক কথা থেকে আরেক কথা। সব শেষে আলোচনায় ঢুকল অপরাধ জগৎ।

'ভাল কথা,' টকার বলল, 'লাঞ্চের সময়কার রেডিও নিউজ শুনেছ? কালো হাত তো আবার পত্রিকার হেডলাইন হয়ে গেছে।'

'কালো হাত!' মুখের কাছে লেমোনেডের গ্লাসটা নিয়ে গেছে মুসা, হাতটা থেমে গেছে ওখানেই। 'ওটা আবার কি?'

'ওটা নয়, সে,' শুধরে দিল কিশোর।

'মানে, কালো হাত একজন মানুষ!' না খেয়েই গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল মুসা।

'হ্যাঁ,' কিশোরের হয়ে জবাবটা দিল রবিন, 'আন্তর্জাতিক রত্নচোর হিসেবে

কুখ্যাত। কোন দলটল নেই তার, একাই হাত সাফাইয়ের খেলা খেলে।' টকারের দিকে তাকাল, 'ইংল্যাণ্ডে এসে হাজির হয়েছে নাকি? শেষ খবর কি? পুলিশ কি বলে?'

'পুলিশ আর কি করবে?' কিশোর বলল, 'ওকে কি ধরতে পারবে নাকি? শেয়ালের মত ধূর্ত...আহ্, নটি, কি আরম্ভ করলি, শার্টের হাতা টানিস কেন? তোর কথা হচ্ছে না, তুই তো আর শেয়াল না।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কোন সহকারী নেই বলে তার কিছু সুবিধে হয়েছে। ধরিয়ে দেয়ার ভয় নেই। চেহারা কেমন, কালো হাত ছেলে না মেয়ে, তা-ও জানে না কেউ।'

'পুলিশও না?' অবাক হয়ে বলল জিনা।

'না। জানলে হয়তো এতদিনে ধরে জেলে ভরে দিতে পারত।'

'তাহলে ভালই হলো তোমাদের জন্যে। ইংল্যাণ্ডে এসেই একটা রহস্য পেয়ে গেলে,' হাসতে হাসতে বলল জিনা। 'এক কাজ করো না, লেগে যাও পিছে, ধরিয়ে দিতে পারলে একটা কাজের কাজই হবে। ইংল্যাণ্ডেও নাম হয়ে যাবে তিন গোয়েন্দার।'

'পারা যেত,' টকার বলল, 'যদি সাগর ভ্রমণে যেতে না হত আমাদের। কালই রওনা হচ্ছি আমরা। কালো হাতকে ধরার সময় নেই।'

'বলা যায় না,' মুসা বলল, 'জাহাজে গিয়ে উঠে বসে থাকতে পারে কালো হাত। এই টকার, যে জাহাজটাতে যাচ্ছি আমরা, দেখেছ নাকি সেটা?'

'দেখিনি।'

'ভুল বলনি,' মুসার দিকে তর্জনী তুলল রবিন। 'ওই জাহাজে উঠেও পড়তে পারে সে। বিলাস-তরী, ধনী মহিলারা নিশ্চয় যাবেন, তাঁদের কাছে দামি রত্ন থাকবেই। কালো হাতের জন্যে একটা মস্ত আর্কষণ।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'কি বলো, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'গেলে খুব ভাল হত। ধরার ব্যবস্থা করতে পারতাম।'

'তোমরা তো মনে হচ্ছে লোকটার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো...' বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা।

রবিন বলল, 'লোক না মেয়েলোক সেটাই জানে না কেউ, বললাম না?'

'বেশ,' হাত তুলল মুসা, 'লোকই হোক আর মেয়েলোকই হোক, তার সম্পর্কে তো অনেক কিছুই জানো তোমরা দেখা যাচ্ছে। আমি জানি না কেন?'

'যেহেতু খবরের কাগজ পড়ো না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল কিশোর।

'কে বলল পড়ি না?'

'পড়ো, শুধু খেলার পাতা। ওটা কি আর খবরের কাগজ পড়া হলো নাকি?'

'যাই হোক,' হাল ছেড়ে দিল মুসা, 'ওসব নিয়ে পরে তর্ক করা যাবে। ওই কালো হাতের ব্যাপারে কিছু জ্ঞান দাও তো আমাকে।'

'সাধারণত কোটিপতি মহিলাদের দিকেই তার নজর,' রবিন বলল, 'অনেক দামি রত্ন, অলঙ্কার এসব পাওয়া যায় বলে। তবে সুযোগ পেলে অন্য দিকে হাত

বাড়াতেও ছাড়ে না। এই তো, কয়েক দিন আগেই বুয়েনাস এয়ার্সের এক ব্যাংকের স্ট্রংরুম ভাঙল। সাংঘাতিক কঠিন ব্যাপার। একা কি করে কাজটা করল সে, আশ্চর্য!'

'কালো হাত শুধু চোরই না,' টকার বলল, 'পত্রিকায় লিখেছে, সে নাকি স্পাইও।'

'স্পাই?' ভুরু কোঁচকাল জিনা।

'হ্যাঁ। টাকার বিনিময়ে নাকি গুপ্তচরগিরি করে। এই তো, আজই আব্বার কাছে শুনলাম, ডিপ্লোম্যাটদের মূল্যবান দলিল চুরি থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীদের থিসিস গাপ করে দেয়া, সবই সে করে। কৌশলে অফার দেয় বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে। মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে তাদের কাছে।'

ঘড়ি দেখল টকার। 'সাড়ে পাঁচটা প্রায় বাজে। চলো, টিভির খবর দেখি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখাবে। কালো হাতের কথা বলতে পারে।'

সবাইকে নিয়ে বসার ঘরে চলে এল সে। টেলিভিশন খুলে দিল। খবর শুরু হয়ে গেছে। প্রধান খবরগুলোর মধ্যেই রয়েছে কালো হাতের কথা।

অন্যান্য বেশি জরুরী খবরগুলো শেষ করে এসে তার কথা যা বলল সংবাদ পাঠক, তার সার-সংক্ষেপ হলো ঃ পুরানো কায়দা বদল করেনি কালো হাত। যেখানে চুরি করে, সেফ ভাঙে, তার কাছে ফেলে যায় একটা কার্ড। তাতে আঁকা থাকে একটা কালো হাতের ছবি। চুরিও করে, আবার সদর্পে ঘোষণাও করে যায় সেটা। স্পর্ধা ও দুঃসাহস দুইই আছে লোকটার। আর্জেন্টিনার শেষ যে ব্যাংকটার তালা সে ভেঙেছে সেটার ম্যানেজার নাকি তাঁর বিশ্বস্ততার সুনাম নষ্ট হয়েছে বলে এতটাই দুঃখ পেয়েছেন, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। সময় মতো একজন ক্লার্ক দেখে ফেলেছিল বলে রক্ষা।

'বেঁচেছে চোরটা!' রেগে গেল জিনা, 'ম্যানেজার মারা গেলে তাঁর মৃত্যুর দায়টা অনায়াসে চাপিয়ে দেয়া যেত কালো হাতের ঘাড়ে। খুনী!'

'খুনী কিনা জানি না,' রবিন বলল, 'তবে খারাপ যে তাতে সন্দেহ নেই। সাংঘাতিক চালাক। এই তো সেদিন পড়লাম মোনাকোর ক্যাসিনোতে চুরি করেছে; তারপরই চলে গেল বুয়েনাস এয়ারসে, এরপর যে কোথায় উদয় হবে কে জানে!'

'মরুকগে,' হাত নাড়ল মুসা, 'যেখানে খুশি যাক। আমাদের সঙ্গে তো তার কারবার নেই। সাগরে বেড়াতে যাচ্ছি, কি কি করব, সেটা নিয়েই এখন ভাবা উচিত আমাদের।'

দুই

পরদিন সকালে ট্রেনে চাপল কিশোররা। শেষ বিকেলে এসে পৌঁছল সাউথহ্যাম্পটনে।

যে কোম্পানি এই রহস্য-যাত্রার ব্যবস্থা করেছে, যাত্রীদের সমস্ত ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব নিয়েছে তারা। হোটেলে রুম বুক করে রেখেছে। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন জাহাজে চড়বে সবাই।

ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে হোটেলের লাউঞ্জে এসে বসল তিন গোয়েন্দা, জিনা আর টকার। ডিনারের সময় না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।

ট্রেনযাত্রা তেমন ভাল লাগেনি নটির। কিচির মিচির করে বিরক্তি প্রকাশ করে রাফির গলা জড়িয়ে ধরল। যেন বোঝাতে চাইছে কুকুরটা জিভ দিয়ে চেটে তার সব অস্থিরতা দূর করে দিক। চমৎকার একটা জোড়া হয়ে গেছে রাফি আর নটি। গেস্টদের অনেকেরই নজরে পড়ে গেছে। দুটোকে নিয়ে বেশ মজা পাচ্ছে তারা, হাসাহাসি করছে।

'দারুণ তো!' বললেন কালো চশমা পরা এক ভদ্রলোক, কথায় বিদেশী টান। 'এমন জোড়া তো আর দেখিনি!'

তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল টকার। ভদ্রলোকও হাসলেন। আদর করে রাফি আর নটির পিঠ চাপড়ে দিলেন। বাঁ হাতের আঙুলে অনেক বড় একটা চুনি পাথর বসানো আঙটি। আলো লেগে ঝিক করে উঠছে পাথরটা।

হঠাৎ শোনা গেল তীক্ষ্ণ একটা বিরক্ত কণ্ঠ, 'এই জানোয়ারগুলোকে হোটেলে ঢুকতে দিল কে? উকুনে ভরা!'

রেগে গেল জিনা। কে এমন করে কথা বলে তার প্রিয় রাফিয়ানের সম্পর্কে!

বলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। কথা যেমন খারাপ, চেহারাও তেমনি খারাপ। বাঁকা নাক, তীক্ষ্ণ চিবুক যেন রূপকথার বইয়ে আঁকা ডাইনীর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'আমার কুকুরের গায়ে উকুন নেই!' আগুন জ্বলে উঠল যেন জিনার কণ্ঠে।

'আমার বানরের গায়েও নেই!' একই স্বরে ঘোষণা করল টকার, জানিয়ে দিল উপস্থিত সবাইকে।

হাসিখুশি, মোটা, লালমুখো একজন লোক হো হো করে হেসে উঠলেন। ছেলেমেয়েদের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'ওই মহিলোর কথায় কান দিয়ো না,' আঙুল তুলে ডাইনিকে দেখালেন তিনি। চমৎকার ইংরেজি বলেন, তবে ইংল্যাণ্ডের লোক যে নন বোঝা গেল কথার টানেই। 'এক ঘণ্টা ধরে বসে আছি তাঁর পাশে। ঘ্যানর ঘ্যানর করেই চলেছেন, খালি অভিযোগ আর অভিযোগ, মুহূর্তের বিরাম নেই। যেন খুঁত ধরার জন্যেই ওখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে।'

ভদ্রলোকের কথায় জিনার রাগ কমল না একটুও, ফুঁসে উঠল, 'দেখতে যেমন ডাইনীর মতো, বুড়ির কাজকর্মও তেমনি!'

খুব একটা আস্তে বলেনি সে, শুনে ফেললেন মহিলো। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল এতক্ষণ সুন্দরী এক চীনা তরুণী। হাসল এমন একটা ভঙ্গিতে, ব্যাঙ্গ করল না করুণা করল, বোঝা গেল না।

চেয়ার থেকে আচমকা উঠে দাঁড়ালেন সুবেশী, সুদর্শন এক ভদ্রলোক, 'এই যে, উঠুন আপনারা। মনে হয় ডিনার দেয়া হয়ে গেছে।' শরীরের তুলনায় হাতদুটো অস্বাভাবিক লম্বা তাঁর, ধবধবে সাদা।

লাউঞ্জের পরিবেশ জটিল হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সেটাকে সহজ করার জন্যেই বোধহয় একাজটা করলেন ভদ্রলোক। রওনা হয়ে গেলেন ডাইনিং রুমের দিকে।

পেছন পেছন চলল বাকি মেহমানরা। জিনারা তাদের সঙ্গী হতে পারল না। এখনও নামেননি তার আব্বা আম্মা। তাঁদেরকে না নিয়ে যায় কি করে?

'ওই ডাইনীটা যদি আমাদের সঙ্গে যায়,' জিনার রাগ এখনও পড়েনি, 'আমি তাহলে এর মধ্যে নেই। রাফিকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডেই থেকে যাব।'

'তাহলে তোমাকে ইংল্যাণ্ডেই থাকতে হচ্ছে,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

চমকে গেল জিনা। ফিরে তাকিয়ে দেখল, একটা আর্মচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে বছর তিরিশেক বয়েসের এক যুবক। চেয়ারে এতটাই ডুবে ছিল এতক্ষণ, চোখেই পড়েনি।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

হাসল লোকটা। 'বলছি। শুনলেই বুঝবে। এখানে যত লোককে দেখলে, তাদের অনেককেই চিনি আমি। বেশির ভাগই যাচ্ছে ওই রহস্য যাত্রায়। হাতে চুনি বসানো আঙটি পরা যে ভদ্রলোককে দেখলে তাঁর নাম হুয়ান রডরেজ। সারা দুনিয়ায় পরিচিত। কোটিপতি। কফির চাষ করেন। আর যে মহিলার ওপর রেগে আছ তুমি, তাঁর নাম মিসেস সিলভার রোজ...'

'রূপালি গোলাপ,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'গোলাপ না ছাই!' মুখ ঝামটা দিল জিনা, 'বিছুটি রাখা উচিত ছিল নাম!'

হাসল লোকটা, 'নামের সঙ্গে অবশ্য চেহারা, স্বভাব কোনটারই মিল নেই। একটা দুর্ভাগ্যই আছে মহিলার। ইতিমধ্যেই তিন-তিনজন স্বামীকে খুইয়েছেন। বিয়ে করলেই কিছুদিন পরে মরে যায়।'

'মরবে না তো কি করবে। ওর কথার জ্বালাতেই মরে।'

জিনার রাগ দেখে হেসে ফেলল মুসা আর রবিন। মুসা বলল, 'মাপ করে দাও না মহিলাকে, আর কত?'

মুখ কালো করে রাখল জিনা।

লোকটা বলতে লাগল, 'মিসেস রোজ মস্ত ধনী, অনেক টাকার মালিক। টাকা থাকলে অনেক মানুষেরই স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, ভাবে দুনিয়াটাই তার গোলাম, কথাবার্তা কি বলে না বলে হুঁশ থাকে না।'

'থাকবে,' মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'একবার রাফিয়ানের খপ্পরে পড়লে থেকে কুল পাবে না। ফালতু কথা বলা জীবনের জন্যে ভুলে যাবে।'

লোকটা হাসল। 'কিন্তু ইংল্যাণ্ডে থেকে যাও যদি তো আর সে সুযোগ পাবে না। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলে ওই মহিলাও যাচ্ছে।'

'আপনিও যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। আমার নাম পিটার উড। আমার কথা পরে শুনো। আগে আমাদের সঙ্গী-সাথীদের কথা শুনে নাও। হাসিখুশি মোটা ভদ্রলোক ওলন্দাজ, হীরার ব্যবসা করেন, নাম ভিক ড্যান। হাত লম্বা যে ভদ্রলোক, তিনি বিখ্যাত পিয়ানোবাদক জিউসেপ অ্যারিয়ানো। চীনা মেয়েটির নাম মিস টিটাং।'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর।

সবার সঙ্গে হাত মেলাল পিটার। জিনার সঙ্গে হাত মেলানোর সময় মিষ্টি করে হাসল।

কিছুক্ষণ পর ডাইনিং রুমে বসে সফর-সঙ্গীদের ভালমতো দেখার সুযোগ পেল গোয়েন্দারা। ওদের পাশেই বসেছে পিটার। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে এদিকে, কখনও মুচকি হাসছে, কখনও চোখ টিপছে।

'লোকটা খুব ভাল,' মুসা বলল।

'অন্তত মিসেস রোজের চেয়ে যে অনেক ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই,' টেবিলের নিচে বসা রাফির গলা চাপড়ে দিতে দিতে বলল জিনা।

'দেখো,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'একলা তো আর জাহাজ ভাড়া করে যাচ্ছি না আমরা। দুনিয়ায় নানা রকমের মানুষ আছে। কারও স্বভাব এক রকম নয়। কেউ ভাল, কেউ মন্দ। একসঙ্গে কোথাও যেতে গেলে তাদের সঙ্গে মিলে মিশেই যেতে হবে। আর তা করতে না পারলে বাড়িতে বসে থাকাই ভাল।'

'মন্দ লোক থাকে,' জিনা বলল, 'তবে মিসেস রোজের মতো কেউই নয়...'

'জিনা!' কঠিন হয়ে গেল কিশোরের কণ্ঠ, 'কারও সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা ঠিক না। পারকার আংকেল শুনলে তোমার ওপর ভীষণ রাগ করবেন...'

'রাগ করবে কি?' টকার বলল, 'তারা কি আর দুনিয়ায় আছে? ওই দেখো,' হাত তুলে দেখাল সে। ওদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে বসেছেন জিনার আব্বা-আম্মা আর তার বাবা প্রফেসর কারসওয়েল। গভীর আলোচনায় মগ্ন দুই প্রফেসর, মাঝখান থেকে একা হয়ে গেছেন মিসেস পারকার। একেবারে নিঃসঙ্গ লাগছে। দুজনের কারোরই তাঁর দিকে মনোযোগ নেই। 'বড় একটা টেবিল হলে খুব ভাল হত। একসঙ্গে বসতে পারতাম তাহলে। আন্টিকেও ওরকম মনমরা থাকতে হত না। আর কাজ পায়নি। গিয়ে বসেছে আব্বার সঙ্গে।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো রবিন। 'আন্টি ওখানে বোর ফিল করবেনই। ওসব অঙ্ক-টঙ্ক নিয়ে কি আর মাথা ঘামান নাকি তিনি।'

'এক কাজ করলে পারি।' প্রস্তাব দিল মুসা, 'আরেটা চেয়ার ঢোকানো যায় এখানে। আন্টিকে ডেকে নিয়ে আসি এখানে।'

প্রস্তাবটা সমর্থন করল সবাই।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরে তৈরি হয়ে রইল, ট্যাক্সি এলেই যাতে উঠে পড়তে পারে।

ট্যাক্সি এল অনেকগুলো। সারি দিয়ে দাঁড়াল হোটেলের সামনে। এক এক করে গিয়ে সেগুলোতে উঠতে লাগল যাত্রীরা। ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে উঠল একটাতে, তাদের সঙ্গে রইল রাফি আর টকার। গাদাগাদি করে বসতে হলো ওদের। ইচ্ছে করলে অন্য ট্যাক্সিতে চলে যেতে পারত, কিন্তু কেউ কাউকে ফেলে যেতে চাইল না। জিনার আব্বা-আম্মা এবং প্রফেসর কারসওয়েল উঠলেন একটাতে।

সাগর তীরে পৌঁছল ট্যাক্সির মিছিল।

জাহাজটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ছেলেমেয়েরা। খুবই সুন্দর একটা

বিলাস-তরী। সাদা রঙ করা।

'খাইছে! এত সুন্দর!' জাহাজটা এরকম হবে ভাবতে পারেনি মুসা।

'মনে হচ্ছে মস্ত একটা সী-গাল, হাঁক দিলেই ডানা মেলে উড়ে যাবে আকাশে,' জিনা বলল। মুসার মতোই সে-ও সাগর ভালবাসে।

কয়েক হপ্তা জাহাজে কাটানোর ব্যাপারটা শুনে অতটা ভাল লাগেনি রবিনের। কারণ সাগরের চেয়ে পাহাড় বেশি পছন্দ তার। তবে হোয়াইট অ্যাঞ্জেলকে দেখে আর খারাপ লাগল না। আগামী দিনগুলো চমৎকার কাটবে বুঝতে পারল সে।

কিশোর ভাবছে, রহস্য গল্প জমানোর মতোই একটা জাহাজ! ইস্, যদি একটা রহস্য মিলে যেত! জাহাজটাতে এখন কালো হাত উঠে পড়লেই জমে উঠত খেলা।

টকার খুব একটা বেরোতে পারে না বাড়ি ছেড়ে। বাইরে কোথাও যেতে পারলেই সে খুশি, যে কোনখানে; সাগরে যাচ্ছে, পাহাড়ে, না বনে-বাদাড়ে, সেটা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

আর রাফির সঙ্গে যেহেতু জিনা আছে, আর নটির সঙ্গে টকার, ওরাও খুশি।

জাহাজে উঠল ওরা।

মালপত্র কেবিনে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত স্টুয়ার্ডরা। যাত্রীরা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে, যার যার ঘর বুঝে নিচ্ছে। প্রচুর হই হট্টগোল করছে। অনেকেই এসে ভিড় জমাল রেলিঙের ধারে। জাহাজ ছাড়া দেখবে।

ছাড়ল জাহাজ। ধীরে ধীরে সরে এল সাউথহ্যাম্পটন বন্দরের জেটির কাছ থেকে। ঝলমলে রোদ। গাঢ় নীল সাগর। সুন্দর দিন।

রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, জিনা ও টকার। জাহাজের গায়ে বাড়ি খেয়ে সাদা ফেনা সৃষ্টি করছে ঢেউ। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে জিনা। টকারের মনে হচ্ছে একটা সাদা উড়ুক্কুযানে করে মাটির পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গের দিকে উড়ে চলেছে ওরা।

'দারুণ!' সাগরের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল। 'ডাঙার চেয়ে বাতাস এখানে দ্বিগুণ মনে হচ্ছে।'

'চলো, আমাদের বাদিং স্যুট বের করি,' জিনা বলল। 'ডেকের সুইমিং পুলটা খালি পড়ে পড়ে কাঁদছে। বেচারা। ওটাকে একটু খুশি করে তারপর ডেকে শুয়ে রোদ পোয়াব।'

'মন্দ বলোনি,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মুসা।

কেবিনের দিকে পা বাড়াতে যাবে ওরা এই সময় কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠ কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, ডেকের লাউঞ্জ চেয়ারে আরাম করে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল কয়েকজন যাত্রী, উত্তেজনাটা তাদের মধ্যেই। জাহাজে ওঠার আগে ঘাট থেকে সকালের কাগজ কিনেছে ওরা। নিশ্চয় এমন কিছু দেখেছে কাগজে, যেটা উত্তেজিত করে তুলেছে ওদেরকে।

'নিউজটা দেখেছেন?' পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। 'রসিকতা করল, না সত্যি সত্যি কে জানে! রসিকতা করে থাকলে কাজটা ঠিক করেনি।'

'আমাদের সৌভাগ্য দেখে কারও হয়তো হিংসে হচ্ছে,' মন্তব্য করল এক তরুণী। 'যাত্রীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে যাত্রাটাকে পণ্ড করতেই এই শয়তানীটা করেছে।'

'আমার তা মনে হয় না!' বললেন এক বৃদ্ধা, গলা কাঁপছে। 'সত্যি কথাই বলেছে। এরকম একটা কাগজে ফালতু কথা লিখবে না। সাংঘাতিক খবর! লর্ডই জানেন, কি হবে! একদিন সকালে উঠে দেখব গলা ফাঁক করে দেয়া হয়েছে আমার। বিছানায় রক্তের মধ্যে পড়ে আছি।'

'অত ভয় পাবেন না, মিস সিম্পসন,' বললেন আরেক মহিলা। সবে খবরটা পড়া শেষ করেছেন তিনি। 'কালো হাত দুর্দান্ত লোক, সন্দেহ নেই, তবে খুনী নয়। মানুষ মেরেছে, এমন বদনাম কখনও শোনা যায়নি তার। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলে যদি সত্যি সত্যি উঠেও থাকে, আর যাই করুক, কাউকে হত্যা করবে না।'

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা।

জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ। উত্তেজিত চেহারা। 'কালো হাত!' আনমনেই বলল সে, 'এই জাহাজে!...ভেরি গুড! ওর মুখোশ খুলে দেয়ার একটা সুযোগ তাহলে পাব।'

'আরও বিখ্যাত হয়ে যাবে তিন গোয়েন্দা,' টকার বলল।

তার কথার জবাব দিল না কিশোর। জোরে একবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে।

মুসা বলল, 'কি লিখেছে, দেখা দরকার।'

রবিন বলল, 'মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ওঠার সময় একটা কাগজ কেনা উচিত ছিল। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল, তাড়াহুড়োয় তারপর ভুলে গেছি।'

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল এই সময় নটি। রাফির পিঠে বসে থেকে তাকে সামনে এগোনোর জন্যে কান ধরে টানাটানি শুরু করল। কোন দিকে যেতে বলা হচ্ছে তাকে, কি করে বুঝল কুকুরটা সে-ই জানে। সোজা তাকে একটা ডেক চেয়ারের কাছে নিয়ে গেল বানরটা। সেখানে চেয়ারের ওপর একটা খবরের কাগজ ফেলে গেছে কে যেন। এক লাফে রাফির পিঠ থেকে নেমে গিয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে বসল। তাড়া দিতে লাগল টকারের কাছে যাওয়ার জন্যে।

বানরটা অনেক কাণ্ডই করে, কিন্তু এখনকার এই ব্যাপারটা টকারকেও অবাক করল।

'করলটা কি দেখলে?' বন্ধুদেরকে বলল সে, 'এ তো একেবারে মানুষের মতো বুদ্ধি, যেমন রাফির, তেমনি নটির।'

'মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধি,' বাড়িয়ে বলা মুসার স্বভাব। অবশ্য মুখ ফসকে বলে ফেলে। এখনও তাই করল।

অন্য সময় হলে এটা নিয়ে আলোচনা করত কিশোর, এখন তা করল না। টকারের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল কাগজটা। মেলে ধরল। রবিনও তার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এসে তাকাল লেখার দিকে। প্রথম পাতায় বক্স করে দিয়েছে খবরটা,

তিন লাইনের হেডিং ঃ

**হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের রহস্য যাত্রায়
কালো হাতও
সফর সঙ্গী হয়েছে।**

অন্য তিনজনও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল কি লিখেছে দেখার জন্যে। কাগজটা রবিনের হাতে দিয়ে বলল, 'জোরে জোরে পড়ো।'

পড়তে লাগল রবিন, 'আজ ভোরের একটু আগে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার অফিসে একটা করে কার্ড পাঠিয়েছে কালো হাত। তাতে আঁকা তার মনোগ্রাম কালো রঙের হাত।'

মুখ তুলল রবিন। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

আবার বলল কিশোর, 'পড়ো।'

আবার পড়তে লাগল রবিন, 'কার্ডে লিখে দিয়েছে কালো হাত, হোয়াইট অ্যাঞ্জেল জাহাজের রহস্য যাত্রায় সে-ও যাত্রী হয়েছে, ছুটি কাটাতে যাচ্ছে সকলের সঙ্গে।' কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বলল সে, 'সাহস আছে লোকটার!'

'লোক কিনা জানি না আমরা, তাই না?' মনে করিয়ে দিল মুসা, 'মহিলাও হতে পারে।'

'সে জন্যেই বোধহয় খুন করে না,' টকার মন্তব্য করল। 'মহিলা তো, মাথায় বুদ্ধি আছে প্রচুর, কিন্তু গায়ে জোর নেই।'

'বলেছিলাম না,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'রহস্য একটা পেয়েই যাবে...'

'আস্তে বলো!' দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কিশোর, কেউ দেখছে কিনা।

'লোকটা মনে হয় পাগল,' রবিন বলল। 'নইলে এভাবে ফলাও করে খবর ছাপে কেউ? পুলিশকে জানিয়ে দিল কোথায় আছে সে। তাকে ধরা এখন আর কঠিন হবে না পুলিশের জন্যে।'

'নিশ্চয় কেউ মজা করেছে,' টকার বলল।

'বলা যায় না,' মুসা বলল, 'সত্যিও হতে পারে।'

কাগজটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিতে চলল কিশোর।

ইতিমধ্যে ডেকের সবারই পড়া হয়ে গেছে খবরটা। উত্তেজিত গুঞ্জন শুরু হয়েছে। একেকজন একেক কথা বলছে ঃ

'জেনেশুনেও এভাবে যাত্রাটা শুরু করল কেন কোম্পানি? শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন মানে হয়!'

'পুরো পাগলামি!'

'ক্যাপ্টেনকে গিয়ে ধরা দরকার, কেন এরকম ঝুঁকি নেয়া হলো!'

'ঠিক, কৈফিয়ত চাওয়া দরকার!'

অনেকেই সমর্থন করল এটা। কিন্তু কেউ নড়ার আগেই লাউড স্পীকারে

অনুরোধ করা হলো শান্ত হওয়ার জন্যে। ক্যাপ্টেন রেরিমোর কথা বলছেন। যাত্রীদেরকে আশ্বস্ত করার জন্যে একটা ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেছেন তিনি। বললেন, জাহাজ ছাড়ার আগেই কালো হাতের খবরটা জেনেছেন। পুলিশ এসে ভালমত তল্লাশি চালিয়ে গেছে। চোরটাকে পাওয়া যায়নি। সমস্ত যাত্রীর নাম-ধাম পরীক্ষা করেছে তারা। সবাই সম্মানিত লোক। কারও কোন ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই। তাদের কাউকে কালো হাত বলে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। জাহাজের কর্মচারীরাও সন্দেহের বাইরে। পত্রিকাওয়ালারা তাড়াহুড়ো করে খবরটা ছেপে দিয়েছে, তাদেরকে ঠেকানো যায়নি। তবে বিবিসিকে অনুরোধ করেছে কর্তৃপক্ষ, যাতে এই খবর প্রচার করে মানুষকে অহেতুক ঘাবড়ে না দেয়। পুলিশের ধারণা, নিঃসন্দেহে কোন খারাপ লোক এই রসিকতাটা করেছে।

'আর যদি কোন অলৌকিক উপায়ে,' ঘটনাটাকে হালকা করার জন্যে বললেন ক্যাপ্টেন, 'কালো হাত আমাদের মাঝে এসেই গিয়ে থাকে, তাকে অনুরোধ করব যাতে এখানে চুরিদারির কথা চিন্তাও না করে। তাহলে এই বার তাকে ধরা পড়তেই হবে। সাগরে ভাসমান একটা জাহাজ কোন শহর নয় যে সে পালিয়ে যেতে পারবে, লোকও এত বেশি নয় যে কারও ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে।' হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে যাত্রীদের সুখ-সফর কামনা করে শেষ করলেন তিনি।

হালকা মিউজিক বাজতে লাগল স্পীকারে।

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। তার হতাশ দৃষ্টি লক্ষ করে হাসতে শুরু করল মুসা। 'তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে ক্যাম্সার হয়েছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মারা যাচ্ছ তুমি।'

হেসে উঠল জিনা আর টকার। ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফি। আনন্দে কুকুরটার পিঠে একবার ডিগবাজি খেয়ে লাফ দিয়ে এসে মনিবের কাঁধে চড়ল নটি।

রবিন কেবল হাসল না। বলল, 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়? ব্যাপারটা সত্যিই রসিকতা?'

'সময়ই বলবে সেটা!' সরে গেল কিশোর। রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল খোলা সাগরের দিকে।

তিন

নিরাপদেই পেরিয়ে গেল যাত্রা শুরুর কয়েকটা দিন। সোজা ফ্রান্স আর স্পেনের উপকূল পেরিয়ে যাবে হোয়াইট অ্যাঞ্জেল, তারপর জিব্রালটার প্রণালীর ভেতর দিয়ে গিয়ে থামবে মারসিলেস বন্দরে আরও কিছু যাত্রী তুলে নেয়ার জন্যে। তারপর থেকে শুরু হবে রহস্য যাত্রার আসল পর্ব।

সাগর ভ্রমণ খুব ভাল লাগছে গোয়েন্দাদের। রক অভ জিব্রালটার পেরোনোর সময় তো রীতিমতো রোমাঞ্চ অনুভব করল। জাহাজে যত রকম আমোদের ব্যবস্থা আছে কোনটাই মিস করল না। সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা থেকে শুরু করে ডেকে খেলাধুলা সবই করল। জাহাজের সর্বত্র ঘোরাফেরা করল, যাত্রীদের জন্যে নিষিদ্ধ

নয় এমন কোন জায়গাই বাদ দিল না। আধুনিক জাহাজের অনেক কিছু দেখল যা আগে কখনও দেখেনি। ওপরে-নিচের সমস্ত ডেক চেনা হয়ে গেল, জেনে গেল কোন পথে যেতে হয়, কোথায় কোথায় আছে গ্যাংওয়ে। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস ভাগাভাগি করা নেই, সবার জন্যে একটাই ক্লাস, সে জন্যেই ঘোরাফেরাটা অনেক সহজ হয়ে গেল, যেখানে খুশি যাতায়াতে কোন অসুবিধে নেই। অনেকের সঙ্গে পরিচিত হলো ওরা।

মারসিলেসে পৌঁছল জাহাজ। যাত্রী তোলার জন্যে থামবে কিছুক্ষণ। জায়গাটা দেখার জন্যে তীরে নামল গোয়েন্দারা।

সেদিন বিকেলে সব যাত্রীরাই একসঙ্গে খেতে বসল ডাইনিং রুমে।

হাঁটাহাঁটি করে এসে খুব খিদে পেয়েছে গোয়েন্দাদের, রাক্ষসের মতো গিলল একেকজন। খাওয়ার পর উঠে চলে এল ওপরের ডেকে।

'খুব ক্লান্ত লাগছে,' হাই তুলতে তুলতে বলল রবিন। 'রাতে আজ ঘুম হবে ভাল।'

'এখনই চলে যাবে নাকি ঘুমাতে?' মুসা বলল। 'ওসব ঘুমটুমগুলো বাদ দাও, বাড়ি গিয়ে যত খুশি ঘুমিয়ো। কয়েক দিন না ঘুমালে মরবে না। তার চেয়ে চলো সিনেমা দেখিগে।'

'আমার ম্যাজিক দেখার ইচ্ছে,' টকার বলল। 'পারসারের কাছে শুনলাম আজ রাতে খুব ভাল ম্যাজিক দেখানো হবে।'

'এই পারসারটা আবার কে?' জানতে চাইল মুসা।

'পারসার কারও নাম নয়,' রবিন বলল। 'বড় বড় সব জাহাজেই পারসার থাকে। এটা একটা পদবী। অনেক দায়িত্ব থাকে তার ওপর। নাবিক-কর্মচারীদের বেতন দেয়া থেকে শুরু করে কেবিনের দেখাশোনা, খাবারের ব্যবস্থা, সব করতে হয়...'

'ও! এত কাজ করে ঘুমায় কখন?'

'নিশ্চয় সময় পায়। নইলে বাঁচত না?'

'হুঁ।'

'এখানে দাঁড়িয়ে বকর বকর না করে,' তাড়া দিল টকার, 'চলো, দেখতে যাই।'

'কোথায় দেখানো হবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ডাইনিং রুমে।'

'তোমরা যাও। আমার না গেলে হয় না?'

'কেন?'

'আসলে ওসব ফাঁকিবাজি আমার ভালো লাগে না। জানিই তো, কোন না কোন ভাবে ঠকাচ্ছে। তার চেয়ে আমি এখানেই থাকি, সাগর দেখি, তোমরা যাও।'

কিন্তু জোর আপত্তি উঠল। কিশোরকে ফেলে যেতে রাজি হলো না কেউ। সকলের বক্তব্য, একসঙ্গে আনন্দ করতে এসেছে ওরা, তা-ই করবে। আলাদা হওয়া চলবে না।

অগত্যা ম্যাজিক দেখতে যেতে হলো কিশোরকেও।

ডাইনিং রুমে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে কয়েকজন স্টুয়ার্ড। টেবিলগুলো পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। টেবিল সরিয়ে, চেয়ার সাজিয়ে সাজিয়ে ছোট একটা থিয়েটার তৈরি করে ফেলা হবে।

'ম্যাজিশিয়ানের নাম কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল টকার, 'জানি না। পারসার বলল, শো কেমন হবে তা-ও জানে না। যাত্রীদের আনন্দ দেয়ার জন্যে একজন ম্যাজিশিয়ানকে ঠিক করা হয়েছে। কেমন ম্যাজিক দেখাবে, জানা নেই, তবে ভাল দেখাবে বলেই তার বিশ্বাস।'

আগেভাগে চলে আসায় সামনের সারিতেই বসতে পারল গোয়েন্দারা। জিনার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল রাফি। টকারের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নটি।

ম্যাজিশিয়ানের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। হঠাৎ করেই নাটকীয় ভাবে উদয় হলো সে। হাসল দর্শকদের দিকে তাকিয়ে। ইভনিং ড্রেস পরেছে, মাথায় উঁচু চূড়াওয়ালা হ্যাট, হাতে জাদু-লাঠি। সুন্দর চেহারা।

ম্যাজিক দেখতে আসার ইচ্ছে জিনারও খুব একটা ছিল না। 'আরি!' আগ্রহী হয়ে উঠল সে, 'এ যে আমাদের পিটার উড!'

কিশোরকেও আগ্রহী মনে হলো। 'তাহলে ম্যাজিশিয়ানের কাজ নিয়েই জাহাজে উঠেছে! গুড। লোকটাকে আমার পছন্দ। মনে হচ্ছে ভালই ম্যাজিক দেখাবে।'

'তখন তো আসতে চাওনি···' টকার বলল, 'এই দেখো, আমাদের দিকেই চেয়ে আছে।'

ঠিকই বলেছে টকার। ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে পিটার। সেটা বোঝানোর জন্যেই আস্তে করে মাথা নোয়াল একবার।

শুরু হলো ম্যাজিক। কিছু ন্যাকা ন্যাকা কথার পর পকেট থেকে কয়েকটা সাদা বল বের করল। একটা করে ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয়, গায়েব হয়ে যায় ওগুলো। হাঁ করে তাকিয়ে আছে টকার। বলগুলো কোথায় যাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছে।

বলের খেলা শেষ করে একটা ক্যানারি পাখিকে খরগোশের বাচ্চা বানিয়ে ফেলল ম্যাজিশিয়ান। তারপর অনেকগুলো সসেজ গিলে ফেলল, সেগুলো আবার বেরিয়ে এল তার হ্যাটের নিচ থেকে।

বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে কিশোর। অতি সাধারণ খেলা এসব, সব ম্যাজিশিয়ানই দেখায়, নতুন কি হলো?

কয়েক মিনিট বিরতি দিয়ে আরেক ধরনের খেলা শুরু করল পিটার। লম্বা-চওড়া একটা বক্তৃতা দিয়ে নিল আগে। সগর্বে ঘোষণা করল, এ খেলাগুলো তার নিজের আবিষ্কার। এসব কথাতেও কোন নতুনত্ব নেই, প্রায় সব ম্যাজিশিয়ানই এ রকম বলে থাকে।

পিচকারি দিয়ে ওপর দিকে পানি ছুঁড়তে লাগল পিটার, কিছুদূর ওঠার পরই বাজিতে পরিণত হচ্ছে পানির ধারা, নানা রঙের ফুলঝুরি ছিটাচ্ছে। পানির খেলা শেষ করে একটা ছোট খেলনা গাড়ি বের করল। চাকাগুলো চারকোণা। কিন্তু যখন

ঠেলা দিল গাড়িটাকে, গোল চাকার মতোই চারকোণা চাকার ওপর মসৃণ ভাবে চলতে লাগল গাড়িটা। অনেকেই পছন্দ করল এসব, হাততালি দিল।

এর পর এল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলাটা, পিটার অন্তত তা-ই বলল। দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনকে চাইল, যার মাথা কেটে শরীর থেকে আলাদা করে ফেলবে। মাথা কাটাতে আর কে চায়? সবাই বসে আছে।

নিচু গলায় মুসা বলল সঙ্গীদেরকে, 'মাথা কাটা না ছাই। সব আয়না দিয়ে করে। দাঁড়াও, আমিই যাচ্ছি। ফাঁকিবাজিটা বের করব।' উঠে দাঁড়াল সে। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে একলাফে গিয়ে স্টেজে উঠল।

গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে।

হাত তুলল ম্যাজিশিয়ান। ইশারায় সবাইকে চুপ থাকতে অনুরোধ করল। যেন পান থেকে চুন খসলেই ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে যাবে।

চুপ হয়ে গেল দর্শকেরা।

মুসার সামনে এসে দাঁড়াল পিটার নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করতে লাগল। ওপর দিকে হাত তুলে অদৃশ্য কার কাছে যেন সাহায্য ভিক্ষা করল, তারপর শুরু করল তার কাজ। মুসার মাথার কাছে হাত নেড়ে কি যেন করল সে, পরক্ষণেই দর্শকরা দেখতে পেল কালো ছেলেটার ধড়টা শুধু দাঁড়িয়ে আছে, মাথাটা আলাদা হয়ে গিয়ে শূন্যে ভাসছে। ওটার সঙ্গে কথাও বলছে ম্যাজিশিয়ান। রক্ত পড়ছে না মুসার কাটা গলা থেকে, ব্যথা পাচ্ছে বলেও মনে হলো না।

খুব ভাল লাগল এই ম্যাজিকটা দর্শকদের। হাততালিতে ফেটে পড়ল।

'হুঁ, মন্দ না,' বিড়বিড় করল কিশোর।

দর্শকদের দিকে ঝুঁকে বিনীত গলায় জিজ্ঞেস করল পিটার, 'আমার ম্যাজিক আপনাদের ভাল লেগেছে?'

এত হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেছে নটির। টকারের কাঁধে গিয়ে বসেছে। 'নিশ্চয় লেগেছে!' মানুষের ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল বানরটা।

বোকা হয়ে গেল টকার। তাকে সামলে নেয়ার সুযোগ না দিয়েই রাফি বলে উঠল, 'গাধা হয়ে গেলাম নাকি! না পাগল হয়ে যাচ্ছি! বানর আবার ইংরেজিতে কথা বলে কি করে!'

আর সবার মতোই একটা সেকেণ্ডের জন্যে কিশোরও বোকা হয়ে গেল। তারপর হেসে উঠল সে। জানোয়ারগুলো কথা বলছে না, বলছে পিটারই, ভাল ভেনট্রিলোকুইস্ট সে।

শেষ হলো শো। প্রচুর হাততালি দিল দর্শকরা, প্রচুর প্রশংসা করল ম্যাজিশিয়ানের।

কেবিনে ফিরে এল গোয়েন্দারা। পাশাপাশি দুটো কেবিন। একটাতে থাকে টকার, জিনা, রাফি আর নটি। আরেকটাতে তিন গোয়েন্দা। এদের কেবিনটা বড়, চারটে বাংক, ইচ্ছে করলে আরেকজন থাকতে পারে।

ভাল ঘুম হলো সে রাতে। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে এসে দেখে ওরা, আগেই এসে বসে আছেন মিস্টার পারকার আর প্রফেসর কারসওয়েল। কারও

দিকেই নজর নেই। গভীর আলোচনায় মগ্ন।

ওরা এসে বসতে না বসতেই এলেন জিনার আম্মা। বলে দিলেন, সেদিন যা ইচ্ছে করতে পারে ছেলেমেয়েরা, বাধা দেবেন না। তবে একথাও বলে দিলেন, খারাপ কিছুই করবে না ওরা এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

ক্যাপ্টেন ঘোষণা করে দিলেন রহস্য যাত্রা শুরু হলো। রোজ সকালে উঠে যাত্রীদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে সেদিন কোথায় যাবে জাহাজ। জানানোর ভার পারসার মিস্টার টারময়েলের ওপর। আগে থেকে কিছুই জানবে না যাত্রীরা পরদিন কোথায় যাচ্ছে, সেটাই যাত্রার প্রধান মজা এবং চমক।

ডাইনিং রুমে ঢুকলেন টারময়েল। তাঁকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল।

'আজ আমরা ফ্র্যান্স ও স্পেনের উপকূল ধরে এগোব,' হাসিমুখে জানালেন পারসার। 'অনেকগুলো বন্দর পার হব আমরা। রাতের জন্যে নোঙর ফেলব স্প্যানিশ বন্দর ভ্যালেনসিয়াতে। কাল সকালে উঠে রওনা হব ব্যালারিক আইল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে। ইবিজা দেখব।'

দর্শকদের মাঝে আনন্দের গুঞ্জন উঠল। বেরিয়ে গেলেন পারসার।

'আগে থেকে তাহলে বলবে না,' মুসা বলল। 'একটু একটু করে জানাবে।'

'আইডিয়াটা খারাপ না,' পেছন থেকে বলে উঠল পিটার। গোয়েন্দাদের টেবিলে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল। 'নতুনত্ব আছে। আগে থেকেই কিছু জানা থাকবে না যাত্রীদের, আন্দাজ করতে পারবে না কোনখান থেকে কোনখানে যাবে। বাঁধাধরা টাইমটেবল থাকবে না। ভাল, খুব ভাল। কিছুদিন আরামে বিশ্রাম নিতে পারব।'

খেতে খেতে আলোচনা চলল। প্রস্তাব দিল পিটার, ভ্যালেনসিয়ায় জাহাজ থামলে ডিনারের পর ওদেরকে শহরটা দেখাতে নিয়ে যেতে পারে সে।

খুশি হয়েই রাজি হলো সবাই। ওদেরকে ওদের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন আন্টি, সেটা আরেকটা ভাল ব্যাপার। যাবে কি যাবে না, তাঁকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না, অনুমতি তিনি আগেই দিয়ে দিয়েছেন।

জিনা বলল, 'আম্মাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। একলা একলা থাকে। আব্বাটা তো কোন কাজের না!'

যেতে রাজিও হলেন মিসেস পারকার, কিন্তু যাওয়ার সময় প্রচণ্ড মাথা ধরাতে আর যেতে পারলেন না। শুয়ে থাকলেন তিনি। টকার গিয়ে জিজ্ঞেস করল বাবাকে, যাবে কি না। সাফ মানা করে দিলেন তিনি, অকাজে ব্যয় করার মতো সময় তাঁর নেই। সারাদিন ধরে তিনি আর মিস্টার পারকার মিলে একটা জটিল সমস্যার সমাধান করছেন, প্রায় শেষ করে এনেছেন, এ সময় দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়েই কাজ থেকে উঠবেন না তিনি। একই কথা জিনার আব্বারও।

পিটারের সঙ্গে শহর দেখতে তৈরি হলো ছেলেমেয়েরা। ম্যাজিশিয়ান বলল, আগেও অনেকবার স্পেনে এসেছে, অনেক জায়গা তার চেনা। জাহাজ থেকে নামতে যাবে, এই সময় তাদের পথ আগলাল রহস্যময় সেই সুন্দরী চীনা তরুণী, মিস টিটাং। বলল, 'মিস্টার উড, সকালে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময়

পাশের টেবিলেই ছিলাম আমি। সব শুনেছি। শহরটা তো আপনার খুব চেনা। যদি কিছু মনে না করেন, আমাকেও নেবেন, প্লীজ?'

পিটার জবাব দেয়ার আগেই আরেকজন লম্বা, বলিষ্ঠ লোক এসে হাজির। বয়েস পিটারের মতোই হবে, এই তিরিশ-একতিরিশ। হাসল। মিস টিটাঙের মতো একই অনুরোধ করল, 'আমাকেও নিন না। আমি যাঁর চাকরি করি, তিনি শুয়ে পড়েছেন। আমাকে বলেছেন, জাহাজে বসে না থেকে ইচ্ছে করলে তীরে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারি। সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

লোকটা সুদর্শন। হাসি লেগেই আছে মুখে। তাকে চেনে ছেলেমেয়েরা। নাম জিম ক্যাম্পার। যাঁর চাকরি করে সে, তিনি একজন কোটিপতি, রিচার্ড হুফার, গাড়ির ব্যবসা করেন। গত বছর কার-অ্যাক্সিডেন্টে কোমর ভেঙে পঙ্গু হয়েছেন। কিছুটা ভাল হয়েছেন, পুরোপুরি হতে দেরি আছে, ক্রাচ বগলে চেপে দুচার পা এগোতে পারেন কোনমতে। ডেকের ওপর বহুবার তাঁর ইনভ্যালিড চেয়ার ঠেলে নিতে দেখেছে জিমকে। একাধারে মিস্টার হুফারের সেক্রেটারি থেকে শুরু করে নার্সের দায়িত্ব পালন, সব কিছুই জিম ক্যাম্পার একলা করে।

পিটারের সঙ্গে একা যেতে পারলেই খুশি হত ছেলেমেয়েরা। কিন্তু মিস টিটাং আর জিমকে মুখের ওপর 'না' বলে দেয়াটাও অভদ্রতা, দ্বিধা করতে লাগল ওরা।

তবে পিটার কিছু মনে করল বলে মনে হলো না। হেসে বলল, 'বেশ তো, যাবেন। দুজনেই আসুন। তবে আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। মনুমেন্ট আর মিউজিয়াম দেখা যাবে না। ভ্যালেনসিয়ার নৈশ জীবন কিছু কিছু দেখতে পারব। স্পেনের আর সব শহরের মতোই এখানেই রাত বড় সুন্দর। অনেক বেশি জীবন্ত।'

সবাইকে নিয়ে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত পথে নেমে এল পিটার। ঠিকই বলেছে সে, সত্যিই খুব ব্যস্ত শহরটা। যেন রাত হয়নি, দিনই রয়ে গেছে এখনও। তাড়াহুড়ো করে পথ চলছে লোক, ব্যস্ত হয়ে এখানে ঢুকছে, ওখান থেকে বেরোচ্ছে।

'এটাই স্প্যানিশ রীতি,' বুঝিয়ে দিল পিটার। 'দুপুর থেকে প্রচণ্ড গরম পড়ে। রাস্তায় বেরোনো কঠিন। ওই সময়টা তাই বাড়িতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় স্প্যানিশরা। এই বিশ্রামকে ওরা বলে সিয়েসতা। সন্ধ্যায় বেরোয়, যত কাজকর্ম সারে।'

পথে পথে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটা ব্যস্ত সাইড-স্ট্রীটে দলটাকে নিয়ে এল পিটার। একটা কাফেতে ঢুকে কোল্ড ড্রিংক আর হালকা নাস্তার অর্ডার দিল।

সময় কাটানোর এত চমৎকার একটা ব্যবস্থা করে দেয়ায় তাকে ধন্যবাদ দিল ছেলেমেয়েরা।

হাসিমুখে জিম বলল, 'আজ ইবিজা দেখতে পাব। দিন থাকবে তখন। খুব সুন্দর দ্বীপ। তোমাদের ভাল লাগবে।'

জাহাজে ফিরে এল দলটা।

উষ্ণ কোমল রাত। বাতাসে যেন সুগন্ধী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সুন্দর একটা বিকেল উপহার দেয়ার জন্যে পিটারকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে যার যার কেবিনের দিকে চলে গেল মিস টিটাং ও জিম। ছেলেমেয়েরা এসে ঢুকল তাদের

ঘরে।

'কিশোর,' কেবিনে ঢুকে রবিন বলল, 'মিস টিটাংকে কেমন মনে হলো? আমার কিন্তু ভালই লাগল।'

'আমার কাছে মনে হয়েছে বিড়াল গোষ্ঠীর কোন প্রাণী,' কিশোর বলল। 'নরম কোমল থাবার মধ্যে লুকিয়ে রাখে ধারাল ভয়ঙ্কর নখ। তার হাসিটাও মেকি মেকি লাগে।'

'আর জিম ক্যাম্পারকে?' জিনার প্রশ্ন।

'মন্দ না।…যাও, শুয়ে পড়ো সবাই। আমার ঘুম পেয়েছে।' মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে তাই তুলতে শুরু করল কিশোর।

পরদিন সকালে পারসার জানালেন, ইবিজা থেকে কোরসিকা দ্বীপের আইসোলা রোসা নামে একটা জায়গায় থামবে হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। 'দিনটা সেখানে কাটাব আমরা,' বললেন তিনি। 'ছবি তোলার অনেক কিছু পাবেন। যত ইচ্ছে সাঁতার কাটতে পারবেন সাগরে।'

ইবিজা খুব ভাল লাগল যাত্রীদের। হাতে গোণা কয়েকজন বাদে কেউই রইল না জাহাজে। কালো হাতের ভয়ে যারা কাবু হয়ে ছিল, তারাও ভয় কাটিয়ে উঠেছে। কারণ এখন পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটেনি, কারও জিনিস চুরি হয়নি, সব ঠিকঠাক চলছে। চোরটা যে জাহাজে নেই একথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে ওরা।

সেটা নিয়ে ছেলেমেয়েরাও আলোচনা করছে। মুসা বলল, 'শয়তানিই করেছিল কেউ। কার্ড ছেপে পাঠিয়ে দিয়েছিল পত্রিকা অফিসে। আসলে কালো হাত জাহাজে ওঠেনি।'

'এখনও শিওর করে কিছু বলা যায় না,' রবিন বলল। ভ্যালেনসিয়াতে ইংরেজি পত্রিকা কিনেছে সে। তাতে কালো হাতের কথা কিছু লেখেনি। 'হয়তো সত্যিই এসেছে সে। এখনও কোন চুরিদারি করেনি বলে বোঝা যাচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেছ,' কিশোর বলল, 'সুযোগের অপেক্ষায় আছে। চান্স পেলেই গাপ করে দেবে কারও জিনিস।'

'দিকগে,' হাত নাড়ল মুসা। 'আমাদের কিছু নেইও, চুরি যাওয়ারও ভয় নেই।'

'ধরা পড়ার ভয়ে হয়তো চুরি করছে না,' অনুমান করল জিনা। 'ক্যাপ্টেন কি বলেছেন, মনে নেই? জাহাজ শহর নয় যে অপরাধ করে গা ঢাকা দেবে কালো হাত। অল্প লোকের মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।'

টকার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'একদম খাঁটি কথা বলেছ। ওরকমই কিছু হয়েছে। ঘাবড়ে গেছে কালো হাত।'

কথা বলেছেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক জিউসেপ অ্যারিয়ানো। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন, বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না তিনি। দু-চারটা কথা বলেই চলে গেলেন।

কালো হাতকে নিয়ে ছেলেমেয়েরাও বিশেষ মাথা ঘামাল না, কিশোর বাদে। হই চই আনন্দ করে কাটাতে লাগল ওরা।

বড় সুন্দর দ্বীপটা। সাগরের একেবারে ঘন নীল পানির নিচ থেকে উঠে এসেছে

যেন পাহাড়ের ঢাল। ফুলে ফুলে ছাওয়া। সবারই ভাল লাগল, একমাত্র মিসেস সিলভার রোজের ছাড়া। ঘ্যানর ঘ্যানর করে অভিযোগ করেই চললেন তিনি। সব খারাপ তাঁর কাছে, সঅব। নীল সাগর, ঝলমলে রোদ, গা-জুড়ানো বাতাস, সুন্দর পাহাড়ী উপত্যকা, কোনটাই তাঁর কাছে ভাল না। রাফিকে দেখেই দূর দূর করে উঠলেন। যদিও তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষেনি কুকুরটা। কুকুরের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছে ওই মহিলা তাকে দেখতে পারে না, তাই দূরে দূরে রয়েছে।

ফেরার সময় তিন গোয়েন্দা, জিনা, টকার, নটি ও রাফি একসঙ্গে রওনা হলো জাহাজের দিকে। তাদের সঙ্গে রয়েছেন জিনার আম্মা। পেছন পেছন আসছে মিস টিটাং।

আচমকা ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে উঠল সে, 'হায় হায়! আমার ব্রোচ! ব্রোচটা গেল কোথায়!'

চার

'ওটার অনেক দাম আমার কাছে!' কেঁদে ফেলবে যেন টিটাং। 'আমার মায়ের ছিল!'

থেমে গেছে গোয়েন্দারা। পিছিয়ে গিয়ে খুঁজতে লাগল ব্রোচটা। যে পথে এসেছে টিটাং, সেখানকার সমস্ত ঝোপ, ঘাস, পাথর, কিছুই বাদ দিল না, সব জায়গায় খুঁজল। কিন্তু জিনিসটা পেল না।

ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে টিটাঙের। ব্রোচটা সবাইই দেখেছে ওরা, কিশোর, রবিন, মুসা, জিনা, এমনকি টকারেরও নজর এড়ায়নি। সোনার তৈরি। সুন্দর কাজ করা। বড় একটা হীরা বসানো। একটা চমৎকার শিল্পকর্ম।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না জিনিসটা। খালি হাতেই জাহাজে ফিরতে হলো টিটাংকে। ব্যাপারটাকে ঘোরাল করে তুললেন আরও মিসেস রোজ। টিটাংকে বললেন, 'তোমার ব্রোচটা হারায়নি, বুঝলে। লিখে রাখতে পারো আমার কথা, ওটা চুরি হয়েছে। কে চুরি করেছে জানো? কালো হাত। ও সব পারে।'

'ঠিক, ঠিক!' হেসে বললেন মোটা ওলন্দাজ ভদ্রলোক, মিস্টার ভিক ড্যান, 'শিওর, ওই সাংঘাতিক কালো হাতেরই কাজ। কাল পাঁচ পাউণ্ড খোয়া গেছে আমার। তাস খেলে। আমি কখনও হারি না। কাল যখন হারলাম, নিশ্চয় কোন কারণ আছে। অদৃশ্য থেকে আমাকে হারতে সাহায্য করেছে কালো হাত। হাহ্ হাহ্ হা!'

রেগে আগুন হয়ে গেলেন মিসেস রোজ। ভাল কথা বললেই সহ্য করতে পারেন না, আর মুখের ওপর টিটকারি দেবে এটা সহ্য করবেন? অসম্ভব! কিন্তু গোয়েন্দাদেরকে অবাক করে দিয়ে ফেটে পড়তে গিয়েও পড়লেন না তিনি। কঠিন হয়ে গেল চেহারা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখলেন, মুখ খুললেন না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তিন গোয়েন্দা। একটা অপ্রীতিকর ঘটনা দেখতে হলো না বলে।

নোঙর তুলল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। রওনা হলো আবার।

'রবিন,' মুসা বলল, 'তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে এসো। ছবি তোলার প্রচুর খোরাক দেখা যাচ্ছে।'

কিশোরও তাকিয়ে আছে সাগরের বুকের অসংখ্য দ্বীপের দিকে। বিন্দুর মতো ছড়িয়ে আছে ওগুলো। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু আনমনা হয়ে আছে সে, নইলে একআধটা ছবি সে-ও তুলত। মাঝে মাঝে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছে না মিস টিটাঙের ব্রৌচটার কথা। হারিয়েছে? নাকি মিসেস রোজের কথাই ঠিক? চুরি করেছে কালো হাত?

সে কি ভাবছে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও জবাব পেল না মুসা আর রবিন। কাউকে কিছু বলল না সে। এখনই সন্দেহের কথাটা বললে হাসাহাসি করতে পারে ওরা।

নানা খাতে ভাবনা বইতে লাগল তার। হয়তো মিস রোজের মতো সে-ও অতি-কল্পনা করছে। অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছে সারাদিন টিটাং, কোথায় জিনিসটা তার হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে টেরই পায়নি, যেখানে খুঁজেছে ওরা সেখানে হয়তো পড়েইনি জিনিসটা। পাবে কি করে? যেহেতু কালো হাতের কথাটা মনে গেঁথে আছে, জিনিসটা খোয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তার কথাই মনে পড়েছে। সে যদি জাহাজে উঠেই থাকে, তাহলে কোথায় লুকিয়ে আছে? পুলিশ খুঁজে পেল না কেন?

পরদিনও ডাঙায় কাটাল যাত্রীরা। কোন অঘটন ঘটল না। লাঞ্চের পর সৈকতে রৌদ্রস্নান করতে গেল ওরা। ডিনারের সময় জাহাজে উঠতেই একটা চমক দিলেন পারসার। ঘোষণা করলেন, রাতে নাচ হবে। বড়দের সঙ্গে ছোটরাও যোগ দিতে পারবে। ফ্যান্সি পোশাক পরতে পারে যার যা ইচ্ছে। এবং তার জন্যে পুরস্কারেরও ব্যবস্থা আছে।

আর সবার মতোই গোয়েন্দারাও খুশি হলো, কিশোর বাদে। এসব অতি হই চই তার ভাল লাগে না। তবে সেটা বললে বন্ধুদের আনন্দ মাটি হবে, সে জন্যে হাসিমুখে চুপ করে রইল।

কি সাজ নেয়া যায় সেটা নিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল জিনা আর টকার।

হাসতে হাসতে কিশোর বলল, 'আমি কি সাজব আমি জানি। শুধু একটা চাদর দরকার আমার। ব্যস, গায়ে জড়িয়ে ভূত হয়ে যাব।'

'একটা বল্লম জোগাড় করতে পারলে ভাল হত,' মুসা বলল।

'বল্লম দিয়ে আবার কাকে খোঁচাতে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'খোঁচাতাম না। মাসাই যোদ্ধা সাজতাম।'

'বল্লমও পাবে না, মাসাইও সাজতে পারবে না। তবে অন্য কিছু যদি সাজতে চাও আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি।'

'কি?'

'চাদরকে রোমান টোগার মতো পরে নাও। স্যাণ্ডেল তো আছেই। জুলিয়াস সীজারের সৈন্য হয়ে যাও।'

'সৈন্য কেন, স্বয়ং সীজার হয়ে গেলেই বা মন্দ কি?'

'সীজার তো নিগ্রো ছিল না। কোঁকড়া খাটো খাটো চুলও ছিল না।'

'তবে কি টাকমাথা ছিল নাকি?'

জিনা বলল হেসে, 'সৈন্য হওয়া বাদ দাও, জলদস্যু সাজো, মানাবে ভাল।'

'আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে, না!' রেগে গেল মুসা।

'না না, সত্যি বলছি, ইয়ার্কি না…এই টকার, বললে না, তুমি কি সাজবে?'

'অরগান বাদক,' টকারের চোখে উত্তেজনা, 'কাঁধে থাকবে বানর।'

'অরগান পাবে কোথায়?'

'সহজ। রান্নাঘরে অনেক মলাটের বাক্স আছে। এনে ব্যারেল অরগান বানিয়ে নেব।'

'মোটর গাড়ি সাজলেই পারো? ওটাই তো তোমার ভাল আসে।'

'নাহ্, ছেড়ে দিয়েছি। মোটর গাড়ি হয়ে বাবার একটা সাংঘাতিক ক্ষতি করে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি ক্ষতিকর জিনিস আর হব না কখনও।'

'হুঁ, এই জন্যেই আর মোটর গাড়ির আওয়াজ বেরোয় না আজকাল তোমার মুখ দিয়ে,' মুসা বলল।

'তুমি কি সাজবে?' জিনাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ক্লিওপেট্রা। ডোরাকাটা তোয়ালে জড়াব মাথায়, হেডড্রেস হয়ে যাবে।'

কাছেই বসে ছেলেমেয়েদের কথা চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ পিটার উড। হঠাৎ বলল, 'আর আমি সাজব সাপুড়ে। কিছু কিছু মহিলা হয়তো ভয় পাবে। থাকগে। যা ইচ্ছে সাজার স্বাধীনতা তো দেয়াই আছে। সাপুড়ে সাজার জিনিস আছে আমার কাছে।'

অন্যান্য যাত্রীরাও কে কি সাজবে আলোচনা করছে।

মিসেস রোজের দিকে তাকাল জিনা। আর্মচেয়ারে বসে চোখ বুজে আছেন মহিলা। ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল সে, 'ওই মহিলা কি সাজার কথা ভাবছে জানি আমি। ডাইনী। কিছুই লাগবে না, কেবল একটা ঝাড়ুর ডাণ্ডা হাতে থাকলেই হলো।'

তার কথার জবাব দিল না কেউ।

ন'টার সময় মিউজিক বাজতে আরম্ভ করল, একটা উচ্ছল সুর। নাচের পোশাকে তৈরি হয়ে এক এক করে বল রুমে যেতে শুরু করল যাত্রীরা। নাচের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্যালুনে।

কেরিআন্টি সঙ্গে একটা ট্রাউজার স্যুট এনেছেন। সেটা পরে প্রাচ্যের নর্তকী সেজে চললেন বল রুমে। কিন্তু পারকার আংকেল আর প্রফেসর কারসওয়েল কাগজ কলম নিয়ে মুখ গুঁজে বসে আছেন স্মোকিং রুমে, তাদের জন্যে নাচ-টাচ নয়।

মিসেস রোজের সাজ খুব সুন্দর হয়েছে। মোটেও ডাইনী সাজেননি তিনি। বরং প্রায় রুপালি একটা পোশাক পরেছেন, নিজের নামকে সার্থক করতে তার ওপরে যেখানেই জায়গা পেয়েছেন গোলাপ ফুল গুঁজেছেন। অনেকেই হাততালি দিল তাঁকে দেখে, হেসে স্বাগত জানাল। জিনাও না হেসে থাকতে পারল না। তার

কাছে কিম্ভূত লাগছে মহিলার সাজ। তবে এই প্রথমবারের মত হাসতে দেখল তাঁকে। যাক, এখন পর্যন্ত নাচের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই মহিলার।

লাল একটা স্কাল ক্যাপ পরে এলেন মিস্টার ভিক ড্যান। মুখে মেখেছেন রঙ। মোটাসোটা বেশ রসাল এক টুকরো ওলন্দাজ পনিরের মত লাগছে তাঁকে। তিনিও হাসির খোরাক জোগালেন অনেকের।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব কোলাহল, স্থির হয়ে গেল সবাই। গাঢ় বাদামী ইভনিং ড্রেস আর মুখোশ পরা একজন লোক দেখা দিল স্যালুনের দরজায়। তার হাতের দিকে সবার চোখ। দুই হাতেরই কনুই পর্যন্ত টানা দস্তানা পরেছে। কারোরই বুঝতে অসুবিধে হলো না, কালো হাত সেজেছে সে।

খাঁটি চীনা পোশাক পরা মিস টিটাং নীরবতা ভাঙল প্রথম। চিৎকার দিয়ে উঠল।

তবে তার ভয় দূর করে দিলেন কালো হাত সেজে আসা মানুষটি। তাঁর নাম মিস্টার আবে। হালকা-পাতলা, রোগাটে শরীর, চুপচাপ থাকেন, কালো চশমা পরে থাকেন সারাক্ষণ।

আরেকবার চমকালো দর্শকরা, যখন আরেকজন কালো হাত সেজে উদয় হলেন। তিনি ব্রাজিলের কফি ব্যবসায়ী মিস্টার হুয়ান রডরেজ।

তৃতীয় আরও একজন কালো হাত সেজে এলে আর চমকালো না দর্শকরা, হো হো হাসিতে ফেটে পড়ল। তৃতীয়জন হলেন পিয়ানোবাদক জিউসেপ অ্যারিয়ানো।

চতুর্থ কালো হাত এসে আর তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না, কারণ ততক্ষণে ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে গেছে। এই লোকটি জিম ক্যাস্পার।

'দূর!' হাত নেড়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন মিস্টার আবে, 'অন্য কিছু সাজা উচিত ছিল। সবার মাথায়ই যে কালো হাত ঢুকে বসে আছে কে জানে। আমি ভেবেছিলাম, বুক কাঁপিয়ে দেব সবার। হলো না।'

'বুক আপনি ঠিকই কাঁপাতে পেরেছেন, মিস্টার আবে,' মিস টিটাং বলল। 'পরে যারা এসেছে তারা সুবিধে করতে পারেনি।'

খুব জমল নাচ। দারুণ উপভোগ করল ছেলেমেয়েরা। কিশোরেরও ভালই লাগছে। ভেবেছিল বিরক্ত লাগবে, কিন্তু লাগছে না।

পুরস্কার বিতরণ শুরু হবে, এই সময় হুইল চেয়ারে করে এসে হাজির হলেন মিস্টার হুফার।

নাচতে তো আর পারেন না, তাই দেরি করেই এসেছেন। পুরস্কার বিতরণী দেখে কিছুটা আনন্দ অন্তত পেতে চান।

সবার ভোট নিয়েই পুরস্কার বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পারসার মিস্টার টারময়েলকে।

ফার্স্ট প্রাইজ পেলেন মিসেস রোজ। চওড়া হাসি ফুটল মহিলার মুখে। পক্ষপাতিত্ব যে করেছেন টারময়েল, স্পষ্টই বোঝা গেল। নিশ্চয় মহিলার রুক্ষ মেজাজ কিছুটা নরম করার জন্যেই এই চালাকিটা করেছেন মহা-ধুরন্ধর পারসার। এত বড় একটা জাহাজের দায়িত্ব তো আর যার-তার হাতে দেয়া যায় না, বুঝে শুনেই দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

পুরস্কার বিতরণ শেষ হলে পারসার ঘোষণা করলেন, 'এত তাড়াতাড়িই শেষ হবে না। বাজনা বাজবে। ইচ্ছে করলে আবার নাচতে পারেন আপনারা। মাঝ রাত পর্যন্ত চলবে।'

কিন্তু আবার বাজনা শুরু হওয়ার আগেই চিৎকার করে উঠলেন একজন বিশালদেহী মহিলা, 'মিস্টার টারময়েল, আমার হার···চুরি হয়ে গেছে···একটু আগেও গলায় ছিল!'

মহিলার স্বামী মিস্টার সোয়ানসন আমেরিকার মস্ত ধনী, অনেকগুলো তেলকূপের মালিক। স্ত্রীর হীরার এত দামী হার চুরি গেছে শুনেও সামান্যতম মলিন হলো না চেহারা। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'চুপ করো, শান্ত হও, অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। হারটা বীমা করা আছে। টাকা দেবে কোম্পানি। আরেকটা কিনে নিতে পারবে।'

'আমি কি হারের জন্যে চেঁচাচ্ছি নাকি?' মিসেস সোয়ানসন বললেন, 'ঘাবড়ে গেছি কালো হাত সত্যিই জাহাজে আছে জেনে! এই তো, প্রমাণ হয়ে গেল!'

'যাবে কোথায়, আছে দেখুন,' বিচলিত হলেন না পারসার। 'নাচের সময় হয়তো খুলে পড়ে গেছে। খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এখানে পরে এসেছিলেন তো, মনে আছে?'

'নিশ্চয় আছে!' রেগেই গেলেন মহিলা, 'অতটা ভুলো মন নয় আমার! আর এখানে খুলে পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না! আমার গলা থেকেই খুলে নিয়েছে! বাপরে বাপ, কি হাত সাফাই! চোর বটে!'

অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল মুসা। তার দিকে ঘুরে গেল অনেকগুলো চোখ। 'খাইছে, কি পেয়েছি দেখুন!'

মিস্টার টারময়েলের হাতে ছোট একটা কার্ড তুলে দিল সে। এক কোণে একটা কালো হাত আঁকা।

ভুরু কুঁচকে গেল পারসারের। 'সর্বনাশ! এ তো দেখি সত্যি সত্যি কালো হাত!'

কার্ডে কিছু লেখাও রয়েছে। দেখার জন্যে গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর। পেন্সিল দিয়ে লেখা রয়েছে ঃ *চমৎকার এই উপহারটা দেয়ার জন্যে কালো হাতের তরফ থেকে মিসেস সোয়ানসনকে ধন্যবাদ।*

পাঁচ

নীরব হয়ে আছে ঘর। একটা পিন পড়লেও যেন শোনা যাবে।

থমথমে এই পরিবেশ ভাঙলেন মিসেস রোজ, 'আমার কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না! সেই শুরু থেকেই বলে আসছি আমি, এই জাহাজে উঠেছে কালো হাত। বললে আরও ইয়ার্কি মারে,' মিস্টার ডিক ড্যানের দিকে আড়চোখে তাকালেন তিনি। 'আমাদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে চোরটা।' এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন হীরক ব্যবসায়ীই চোর। আর সেটা হলেই যেন বেশি খুশি হন তিনি।

হাসি ফুটেছে কিশোরের মুখে। যাক, যাত্রার একঘেয়েমী শেষ হলো এতদিনে!

জটিল একটা রহস্য এসে হাজির, একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ। মুসার দিকে তাকাল সে।

'বাহ্, বেশ তো হাসি ফুটেছে মুখে,' মুসা বলল। 'কালো হাত এই জাহাজেই আছে এ ব্যাপারে তুমি শিওর ছিলে, না?'

'মনে হচ্ছিল আছে।'

চুপ করে আছে রবিন। তার বুকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে টকার বলল, 'কি, অমন চুপ করে আছো কেন? তোমাদের তো ভালই, একটা রহস্য মিলল।'

'কেন, তোমার জন্যে খারাপ নাকি?'

'না, আমিও খুশি। সত্যি বলব? জাহাজে বোর হয়ে যাচ্ছিলাম, বেশি দিন আর ভাল্লাগতো না। নতুন একটা কাজ পাওয়া গেল। আবার কিছু দিন মজা থাকবে।'

'আমারও ভাল লাগছে,' জিনা বলল। 'অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে আরেক অ্যাডভেঞ্চার।'

'হউ!' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রাফি।

টকারের কাঁধে বসে কিচকিচ করে উঠল নটি। তার চুল ধরে এক দোলা দিয়ে গিয়ে ঝাপ করে পড়ল রাফির পিঠে, তার কান আঁকড়ে ধরল।

'এই, এখন বাঁদরামি করবি না,' ধমক লাগাল টকার, 'কাজের কথা হচ্ছে।'

'দেখুন, আপনারা ঘাবড়াবেন না,' অবশেষে যেন কথা খুঁজে পেলেন মিস্টার টারময়েল। 'ক্যাপ্টেনকে গিয়ে জানাচ্ছি। কিছু যদি মনে না করেন আমি যতক্ষণ না আসি আপনাদেরকে এখানে থাকতে অনুরোধ করব।'

পারসার বেরিয়ে যেতেই সবাই সবার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল যাত্রীরা। সবাই বলাবলি করতে লাগল তাদের মধ্যেই রয়েছে কালো হাত, তাদেরই কেউ একজন। সে কে? হয়তো পাশের লোকটিই হবে, কিন্তু জানার উপায় নেই।

'ধরা অত সহজ হবে না,' জিনা বলল। 'জাহাজের ডিটেকটিভকে নিয়ে আসবেন ক্যাপ্টেন, বুঝতে পারছি। তাতে কি হবে? গায়ে হাত দিয়ে তো খুঁজতে পারবে না। কাকে সন্দেহ করবে?'

'দুজনকে এক্ষুণি বাদ দেয়া যায়,' কিশোর বলল। 'প্রফেসর পারকার ও প্রফেসর কারসওয়েল। নাচে তাঁরা আসেনইনি।'

'আমরাও বাদ,' টকার বলল, 'কারণ, আমরা ছোট মানুষ। আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করবে না নিশ্চয় জাহাজের গোয়েন্দা।'

'কেরিআন্টিও বাদ,' রবিন বলল, 'কারণ তিনি মেয়েমানুষ।'

'আমরা জানি তিনি কালো হাত নন,' কিশোর যুক্তি দেখাল, 'কিন্তু বাইরের কেউ জানে না। আরেকটা কথা ভুলে যাচ্ছ, কালো হাত নারী না পুরুষ, জানে না কেউ। কোন দেশী, তা-ও অজানা।'

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'আমার সন্দেহ মিস টিটাঙের ওপর। কেমন যেন রহস্যময় আচরণ করে।'

'মিসেস রোজ হলে ভাল হত,' জিনা বলল। 'জেলে গিয়ে আর বকর বকর করতে পারত না। সব্বাই ভয় পায় ডাইনীটাকে। যে রাফি বড় বড় ডাকাতকে পর্যন্ত

ভয় করে না, সে-ও ওই বুড়িটাকে দেখলে সিঁটিয়ে যায়।'

'ঘাউ! ঘাউ!' করে কি বোঝাতে চাইল রাফি কে জানে। হয়তো নিজের নাম শুনেই ধারণা করে নিয়েছে তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

'এই, থাম,' কিশোর বলল, 'চুপ থাকবি এখন। ওই যে, ক্যাপ্টেন এসে গেছেন।'

একসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন তিনজন মানুষ। পারসার ও ক্যাপ্টেন বেরিমোর, তাঁদের সঙ্গে রোগাটে, বাদামী চামড়ার একজন লোক।

রোগাটে লোকটির পরিচয় দিলেন পারসার, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, ইনি সদানন্দ বটব্যাল, এই জাহাজের প্রাইভেট ডিটেকটিভ। হার চুরির তদন্ত করবেন এখন। আপনারা তাঁকে সাহায্য করলে খুশি হব। থ্যাংক ইউ।'

নাম শুনেই বোঝা গেল ডিটেকটিভ ভারতের লোক। কথায়ও ভারতীয় টান স্পষ্ট। একটা টেবিলে গিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। খুব বিনীত গলায় ডাকলেন একজন যাত্রীকে, তাঁর সামনে গিয়ে বসার জন্যে।

এক এক করে সবার নাম-ধাম আর বক্তব্য লিখে নিতে লাগলেন। গোয়েন্দারাও বাদ পড়ল না। কার্ডটা কোথায় পেয়েছে মিস্টার বটব্যালকে দেখিয়ে দিল মুসা।

ঘরের প্রতিটি যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কায়দা করে তাদের পকেট-টকেটও খুঁজে দেখার ব্যবস্থা করলেন মিস্টার টারময়েল। কেউ কিছু মনে করল না। সাংঘাতিক চালাক লোক যে তিনি, সেটা আরেকবার প্রমাণ করলেন।

হীরার হারটা পাওয়া গেল না। ছেড়ে দেয়া হলো যাত্রীদেরকে। যার যার কেবিনে ফিরে গেল তারা।

পরদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে সময় কাটল মিস্টার বটব্যালের। জাহাজের কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে করে প্রতিটি কেবিনে তল্লাশি চালালেন তিনি। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সমস্ত জায়গা। যাত্রীরা কেউ আপত্তি করল না।

'খুঁজতে দেয়া উচিত,' মিস্টার আবে বললেন। 'কিছুই যখন পাবে না, বুঝবে আমরা চোর নই।'

কারও ব্যাগে, মালপত্রের মধ্যে হারটা পাওয়া গেল না।

সুইমিং পুলের কিনারে এসে আলোচনায় বসল গোয়েন্দারা। ওরা ছাড়া আর একটি প্রাণীও নেই সেখানে। আসলে সবাই বিব্রত, চিন্তিত, সাঁতার কাটতে আসার মত মানসিকতাই নেই এখন ওদের।

'ক্যাপ্টেন চিন্তায় পড়ে গেছেন,' রবিন বলল। 'হারটা পাওয়া গেল না। কালো হাত জাহাজে আছে। চেনা তো দূরের কথা, কাকে সন্দেহ করবেন সেটাই বুঝতে পারছেন না। চোরটা ধরা পড়েনি, তার মানে চুরির ঘটনা আরও ঘটতে পারে।'

'শুধু কেবিনগুলো নয়,' মুসা বলল, 'শুনলাম, পুরো জাহাজটাতেই নাকি খোঁজা হয়েছে।'

'আমিও শুনেছি,' টকার বলল। 'মিস্টার বটব্যালের ধারণা, এমন কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে হারটা, যেখানে খোঁজার কথা কল্পনাও করবে না কেউ। পরে

সুযোগ মত বের করে নেবে চোরটা।'

'যাত্রা শেষ হলে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার আগে নিশ্চয় আরেকবার তল্লাশি চালানো হবে।'

'তা হবে,' মুসার সঙ্গে একমত হলো কিশোর। 'কিন্তু তার আগেও নানা জায়গায় থামবে জাহাজ। যাত্রীরা নামবে। তাদের নামা ঠেকানো যাবে না। আর একবার নামলেই যথেষ্ট। হারটা ডাঙায় নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে আসতে পারবে চোরটা। নিজের ঠিকানায় পোস্ট করে দিয়ে এলেও কারও কিছু বলার নেই। কে দেখতে যাচ্ছে?'

'তা-ও তো কথা,' মাথা দোলাল মুসা।

'তার মানে, যে-ই তীরে নামুক,' রবিন বলল, 'তার ওপর চোখ রাখতে হবে আমাদের? পোস্ট অফিসে যায় কিনা নজর রাখতে হবে? এভাবে চোরটাকে ধরা অবশ্য খুবই কঠিন, তবে অসম্ভব না।'

জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বলল, 'অসম্ভবই। আমরা মোটে পাঁচজন। তীরে একেকবারে অনেক বেশি লোক নামে। কজনের পিছু নেব? পাঁচজনের বেশি তো আর পারব না। ওই পাঁচজনের কেউ চোর না-ও হতে পারে।'

'পারকার আংকেল আর কেরিআন্টি সাহায্য করতে পারেন,' মুসা বলল। 'আর টকারের আব্বাকে ধরলে আরও একজন বাড়ল। মোট আটজন।'

ওর আব্বা চোরের পিছে লাগবে, গোয়েন্দাগিরি করবে, এটা শুনে হাসতে হাসতে আরেকটু হলে সুইমিং পুলেই পড়ে যাচ্ছিল টকার। বলল, 'আর কাজ পেলে না, আব্বা যাবে চোরের পিছু নিতে! সারা দুনিয়া দিয়ে ফেললেও ওই কাজ করবে না আব্বা। হলে ভাবব ভূতে রাজি করিয়েছে। তার পরেও কথা থাকবে। চোর ধরা তো দূরের কথা, রাস্তা ভুলে গিয়ে নিজেই হারিয়ে যাবে। জাহাজে ফেরার কথাও মনে থাকবে না। তাকে খুঁজতেই তখন আরেক ঝামেলা।'

'কথাটা তুমি ভুল বলোনি, টকার,' হাসতে হাসতে বলল জিনা। 'আমার আব্বারও একই দশা। বলতে গিয়ে বরং বিপদে পড়তে পারি। কিছু তো বোঝার চেষ্টা করবেই না, একটা ছুতোনাতা দেখিয়ে আমাদের গোয়েন্দাগিরিই বন্ধ করে দেবে। জাহাজ থেকেই নামতে দেবে না আর।' হাত নাড়ল সে, 'যে ভাবে আছে থাক, অহেতুক পাগল খেপানোর দরকারই নেই।'

'কি মনে হয় তোমাদের, কাজটা কি খুব বিপজ্জনক?' টকার জিজ্ঞেস করল।

'হওয়াটাই স্বাভাবিক,' জবাব দিল মুসা। 'নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা সবাই করে। কালো হাতও করবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'তা বটে। তারমানে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হচ্ছে।'

এসব আলোচনায় খুব একটা যোগ দিল না কিশোর। তার মগজে এখন ভাবনার ভিড়। চোরটা কে হতে পারে? কি ভাবে তাকে চেনা যাবে? ধরা যাবে তো? প্রতিপক্ষ ভীষণ চালাক, বুঝতে পারছে সে। তাকে ধরা খুব সহজ হবে না। না হোক, ধাঁধা কঠিন হলেই সে খুশি। মাথা ঘামাতে পারবে।

আপাতত একটা বড় সুবিধে আছে ওদের, ভাবছে কিশোর, ওরা ছেলেমানুষ ভেবে কালো হাত ওদের দিকে তেমন নজর দেবে না। তাদের সামনে সামান্য হলেও ভুল করে বসবে। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে।

কালো হাতের সেই ভুল করাটারই অপেক্ষা করতে হবে এখন তাদেরকে।

ছয়

করসিকার উপকূলে আরেকটা দিন নোঙর করে রইল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছেন ক্যাপ্টেন। আরও একটা কারণ আছে, হারটা যে চুরি গেছে একথা বীমা কোম্পানিকে জানাতে হবে মিস্টার সোয়ানসনের। কিছু নিয়ম-কানুন আছে, কাগজপত্র রেডি করে সই করতে হবে।

এসব কাজ শেষ হলে আবার নোঙর তুলে দক্ষিণে যাত্রা করল জাহাজ। দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের দিকে চলেছে।

আবহাওয়া এখনও ভাল। খারাপের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে যাত্রীদের উত্তেজনাও অনেকটা ঝিমিয়ে এল। এর কারণও আছে অবশ্য। আইসোলা রোসায় করসিকান পুলিশ এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেছে প্রতিটি কেবিন, যাত্রীদের মালপত্র। জাহাজের অন্যান্য জায়গায়ও খুঁজেছে। যাত্রীদের পরিচয় চেক করে দেখেছে আরেকবার। এবারেও কালো হাত বলে সন্দেহ করতে পারেনি কাউকে।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে যাত্রীরা। নিজেদের বোঝাতে লাগল, তারা এসেছে বেড়াতে, আনন্দ করতে, কালো হাতের কথা ভেবে সব পণ্ড করতে নয়। কেউ কেউ তো চোরটার চিন্তা জোর করেই মাথা থেকে দূর করার চেষ্টা চালাল। যা খুশি করে করুকগে ব্যাটা, আমাদের কি, এমন একটা ভঙ্গি। একবার করেছে বলেই যে আবারও চুরি করতে আসবে এমন না-ও হতে পারে। এক হারেই তো অনেক টাকা নিয়ে চলে গেল, আর কত?

সবাইকে আনন্দে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মিস্টার টারময়েল। যাত্রীদের নিয়ে গেলেন পিয়ানা নামে ছবির মত একটা জায়গায়, ঘুরে বেড়ানোর জন্যে। ছবি তোলারও অনেক কিছু আছে এখানে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে উপকূলের সড়ক ধরে এগোল যাত্রীরা, একটা লাল পাহাড়ের দিকে। সাগরে নেমে গেছে পাহাড়টার একটা ঢাল।

'এখানে কারও ওপর নজর রাখার দরকার নেই,' মুসা বলল। 'পোস্ট অফিস নেই এখানে।'

'তবু চোখকান খোলা রাখা দরকার,' কিশোর বলল। 'বলা যায় না, কখন কি ঘটে যায়।'

জায়গাটা খুব ভাল লাগল ওদের। এমনকি ওপর থেকে সাগরের দিকে তাকিয়ে রাফিও যেন মুগ্ধ হয়ে গেছে, ওর ভাবভঙ্গি দেখে সে রকমই মনে হলো। চূড়ার ওপর থেকে কেউ পড়ে গিয়ে যাতে দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সে জন্যে একধারে রেলিংমত দেয়া আছে। তাতে পা তুলে দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল সে।

ছবি তুলছে কিশোর, শাটার টিপছে ঘন ঘন। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে জিনা। কুকুরটার হাঁকডাকে এক সময় বিরক্ত হয়ে তাকে থামার জন্যে ধমক লাগাল। নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে নানা অ্যাঙ্গেলে একে অন্যের ছবি তুলতে লাগল রবিন, মুসা ও টকার। বানরটারও অনেকগুলো ছবি উঠে গেল টকারের সঙ্গে। ঝোপের ভেতর থেকে আচমকা বেরিয়ে এল একটা গাধা। সেটার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করল নটি। অবাক হয়ে গেল গাধাটা। তাকে দেখে এত চেঁচানোর কি হলো বুঝতে পারছে না যেন।

ছবি তোলা শেষ হলো যাত্রীদের। এসব জায়গায় আগেও এসেছে পিটার। সে জন্যেই তাকে অনুরোধ করে গাইড হওয়ার জন্যে নিয়ে এসেছেন টারময়েল। জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন কাছাকাছি ভাল কোন কাফে আছে কিনা। সেখানে যাত্রীদের নিয়ে চললেন লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে।

ঢাল বেয়ে একটা গাঁয়ে নেমে এল যাত্রীরা। গাধাটার সঙ্গে খাতির করে ফেলেছে নটি, ওটার পিঠে বসে নাচছে এখন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে গাধাটাও নেমে এসেছে নিচে। একটা বেকারি দেখে তাতে ঢুকে কিছু রুটি কিনে নিয়ে এল জিনা, জানোয়ারটাকে খেতে দিল। রাফি কিছু বলল না বটে, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল গাধাটাকে হিংসে করছে সে।

অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে আসতে হয়েছে। খিদে পেয়েছে। একটু বসাও প্রয়োজন ছিল। কাফেতে ঢুকে চেয়ারে বসতে পেরে হাঁপ ছাড়ল ওরা। খাবার এল, খুব সুস্বাদু। মজা করে খাচ্ছে ওরা এই সময় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন মিসেস রোজ, 'আমার টেবিলে আর চেয়ার কেন? আমি একা খেতে চাই। অ্যাই, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও!'

একজন ওয়েইটারকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বললেন মিস্টার টারময়েল। অবাক মনে হলো লোকটাকে। পকেট থেকে একটা লিস্ট বের করে মিলিয়ে দেখল। প্রতিবাদ জানাল, 'কিন্তু স্যার, আপনি আঠারোজন গেস্টের জন্যে সীট বুক করেছিলেন?'

'করেছি,' মাথা ঝাঁকালেন পারসার। 'আঠারো জনই তো আছে। কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'সতেরো জন আছে, স্যার। যে চেয়ারটা সরিয়ে নিতে বলছেন, ওটাতে আরেকজন বসার কথা। তিনি কোথায়?'

কপাল কুঁচকে গেছে পারসারের। তাড়াতাড়ি ঘরের লোক গুণে ফেললেন। তাই তো, ওয়েইটার তো ঠিকই বলেছে! আরেকজন গেল কোথায়?

সব কথাই কানে গেছে কিশোরের। কৌতূহলী হয়ে সে-ও গুণে ফেলেছে। কারা কারা এসেছিল মনে করার চেষ্টা করছে। ওরা পাঁচজন—সে, রবিন, মুসা, টকার আর জিনা। পিটার উড, মিস টিটাং, মিসেস রোজ, হুয়ান রডরেজ, মিস্টার আবে, পিয়ানোবাদক জিউসেপ অ্যারিয়ানো, ওলন্দাজ হীরক ব্যবসায়ী ডিক ড্যান, গাড়ি ব্যবসায়ী পঙ্গু রিচার্ড হুফার আর তাঁর সহকারী জিম ক্যাম্পার, সোয়ানসন দম্পতি, কেরিআন্টি ও পারসার মিস্টার টারময়েল। নেই কে? সহজেই বের করে

ফেলা গেল।

'হুয়ান রডরেজ নেই!' বলে উঠল সে। 'কিন্তু জাহাজ থেকে তিনি নেমেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাহাড়ের ওপর ওদের কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন, স্পষ্ট মনে আছে।'

আরও অনেকেই লক্ষ করল ব্যাপারটা। চারপাশে এমন ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল যেন তাকালেই তাদের সামনে উদয় হবেন ব্র্যাজিলিয়ান কফি ব্যবসায়ী।

কিশোরদের টেবিলেই বসেছে পিটার। নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ, রডরেজই নেই। জাহাজ থেকে এসেছে, পাহাড়ের ওপর ছবি তুলতে দেখেছি। গেলেন কোথায়?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন টারময়েল, 'সত্যিই দেখেছ?'

রাফি ভাবল তার সঙ্গেই কথা বলছেন পারসার, সে বলল, 'হউ!'

'এই চুপ!' আস্তে তার মাথায় চাপড় দিল জিনা।

কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। গুরুত্ব দিইনি। আসবে না জানলে কড়া নজর রাখতাম।'

নিজের ওপরই রেগে গেছে কিশোর, এটা আর কেউ না বুঝলেও ঠিকই বুঝতে পারল মুসা আর রবিন। দলের সবাইকে যাত্রীদের ওপর নজর রাখতে বলে সে নিজেই সেটা ভুলে বসে ছিল। তার কাছাকাছি ছিলেন হুয়ান রডরেজ, অথচ তিনিই যে গায়েব হয়ে গেছেন সেটাও খেয়াল করেনি।

'আছেন হয়তো বাইরেই কোথাও,' ভিক ড্যান বললেন।

'ছবি তুলতে তুলতে এতটাই বেখেয়াল হয়ে গেছেন,' বললেন মিস্টার আবে, 'আমাদের সঙ্গে আসার কথাই ভুলে গেছেন। সরে গিয়েছিলেন হয়তো কোন দিকে।'

'আমার তা মনে হয় না,' পারসার বললেন। 'আমরা তো আর ছুটে চলে আসিনি। অনেক সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে এসেছি। তাছাড়া বলা আছে দলছুট না হওয়ার জন্যে। এখানে যে আমরা লাঞ্চ খেতে আসব একথাটাও জানা আছে তাঁর। এতক্ষণে চলে আসার কথা।' চিন্তিত হয়ে পড়েছেন টারময়েল। যাত্রীদের ভালমন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর। উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনারা থাকুন। খাওয়া-দাওয়া করুন। আমি তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসি।'

'আমিও যাব আপনার সঙ্গে,' পিটার উঠে দাঁড়াল।

কিশোর বলল, সে যাবে। জিনাও বলল যাবে।

'যাবে? ঠিক আছে, এসো। সুবিধেই হবে তোমরা গেলে,' পিটার বলল। 'ছোটদের নজর অনেক বেশি শার্প।'

কিশোর ও জিনা যাবে, মুসারা কি আর বসে থাকে। ওরাও উঠল। টকারের কাঁধে নটি। জিনার পাশে রাফি।

প্রথমে কাফের ভেতরে সবখানে খোঁজা হলো। রডরেজ নেই ওখানে। কাফে থেকে বেরিয়ে তখন পাহাড়ের দিকে চলল কিশোররা। ক্লিফ-রোড ধরে রওনা হলো। কফি ব্যবসায়ীর ছায়াও দেখা গেল না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

'ব্যাপারটা কি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' বিড়বিড় করলেন পারসার।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফি। জিনার পাশ থেকে হঠাৎ দৌড় দিল পাহাড় চূড়ার দিকে। একদৌড়ে উঠে গেল সেই জায়গাটায়, যেখানে রেলিঙে পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাগরের দিকে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল। কয়েকবার ডেকে ফিরে তাকাল জিনার দিকে।

'নিশ্চয় কিছু দেখেছে ও!' জিনা বলল। 'তখনও ডেকেছিল, থামিয়ে দিয়েছিলাম। তখন খেয়াল করলেই হত। চলো তো দেখি!'

কারও অপেক্ষা না করেই ঢাল বেয়ে প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করল সে। অন্যেরা তার পিছু নিল।

চেঁচিয়েই চলেছে রাফি। জিনার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে গেল সামনে। আর আগে বাড়া যাবে না, নিচে হঠাৎ করে খাড়া হয়ে নেমে গেছে ঢাল। সেটার ধারে পৌঁছে গলা লম্বা করে দিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। নিঃসন্দেহে কিছু চোখে পড়েছে তার।

অত কিনারে যাওয়ার সাহস কারও হলো না, রবিনের বাদে। পাহাড় বাওয়ার ওস্তাদ সে। রাফির পাশে উবু হয়ে শুয়ে নিচে তাকাল। ওই তো, দুটো ঝোপের মাঝে পাথুরে জায়গায় পড়ে আছে একটা দেহ। আরও নিচে খাড়া পাড়ের গায়ে আছড়ে ভাঙছে ঢেউ।

'সর্বনাশ!' চিৎকার করে বলল সে, 'মিস্টার রডরেজ! ওই তো, বেগুনী কোট, লাল টাই! মরে গেলেন নাকি!'

কারও আদেশ-নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই আবার ওপরে উঠতে শুরু করেছে মুসা। রেলিঙের অন্যপাশে গিয়েই ছুটতে শুরু করল। নেমে যেতে লাগল নিচে।

অন্যেরাও ছুটল তার পেছনে।

'বেঁধে রেখেছে নাকি?' পিটার বলল। 'ভঙ্গি দেখে কিন্তু সে রকমই মনে হয়!'

সবার আগে পৌঁছল মুসা, তারপর কিশোর

একবার পরীক্ষা করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মারা যাননি রডরেজ। বেহুঁশ হয়েছেন। চোখ বোজা। কপালের ডানপাশে একটা জায়গা ফুলে আছে, চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে ওখানে বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে তাঁকে।

টারময়েল, পিটার, মুসা আর কিশোর মিলে অনেক কসরত করে রডরেজকে ওপরে তুলে আনল। বড় একটা পাথরের ছায়ায় ঘাসের ওপর শোয়ানো হলো তাঁকে। পাতলা নাইলনের দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধা হয়েছে পকেট থেকে ছোট ছুরি বের করে কেটে দিল পিটার। বাঁধনের জায়গাগুলো ডলে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে দিতে হাত লাগাল রবিন, টকার, মুসা আর পিটার। জিনার হাতব্যাগে অডি কোলন আছে। খানিকটা নিয়ে আলতো করে ডলে দিল রডরেজের কপালের কাটায়।

সেবাযত্নে হুঁশ ফিরল রডরেজের। চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি

কোথায়?' কেউ জবাব দেয়ার আগেই সব কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। রাগে জ্বলে উঠল চোখ। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শয়তানটা কোথায়!' কণ্ঠস্বরই বলে দিল ততটা দুর্বল বোধ করছেন না তিনি। 'ধরতে পারলে বোঝাব মজা!'

'কার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করলেন টারময়েল।

'কি করে বলব? জানি নাকি?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন রডরেজ। 'কয়েকটা টিলা দেখে মনে হলো খুব ভাল ছবি উঠবে ওগুলোর, সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে নেমে গেলাম ওখানে। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন জাপটে ধরল। এমন শক্ত করে ধরল, মনে হলো জুডোর কায়দা। কি যে করল কে জানে, পড়ে যেতে লাগলাম। কিছুতেই সামলাতে পারলাম না। ঠুস করে কপাল ঠুকে গেল পাথরে। তারপর আর কিছু মনে নেই।'

জিনা বলল, 'আমার কুকুরটা অবশ্য ডাকাডাকি করেছিল। তখন যদি খেয়াল করতাম, হয়তো ধরা যেত লোকটাকে...'

তার কথা রডরেজের কানে গেল বলে মনে হলো না, পর্তুগীজ ভাষায় কি যেন বলতে লাগলেন। কথাগুলো না বুঝলেও রেগে যে গেছেন ভীষণ, এটা বুঝতে পারল গোয়েন্দারা। 'দেখুন!' টারময়েলের দিকে বাঁ হাতটা ঠেলে দিলেন তিনি, 'ডাকাতি করে নিয়ে গেছে! আংটিটা নেই!' পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে বললেন, 'পকেটও সাফ!...আরে, এটা কি?' বলতে বলতেই জিনিসটা বের করে আনলেন।

ছোট একটা কার্ড। এক কোণে কালো হাত আঁকা।

এক নজর দেখেই চিনল কিশোর।

'খাইছে!' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা, 'আবার কালো হাত!'

'তার মানে আমাদের সঙ্গেই জাহাজ থেকে নেমেছে!' রবিন বলল, 'দুঃসাহস বটে লোকটার!'

নিচের ঠোঁটে বার দুই ঘন ঘন চিমটি কাটল কিশোর। 'ভালই হলো। সহজ করে দিল আমাদের জন্যে...' বলেই চুপ হয়ে গেল। যেন কাছাকাছিই রয়েছে চোরটা, তার কথা শুনে ফেলবে।

চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই তার, তবে চোখের হাসি মুসা বা রবিন কারোরই নজর এড়াল না। কিশোরের মনের ভাবনা যেন ওরাও পড়ে ফেলতে পারল। যেন বলছে সে, 'রডরেজের ওপর আঘাত হেনে ভুল করেছ তুমি কালো হাত। সুবিধে করে দিয়েছ। জাহাজ বোঝাই লোককে আর সন্দেহ করতে হবে না আমাকে। অনেক সীমিত করে দিয়েছ সেটা।'

সাত

সেদিন সন্ধ্যায় হোয়াইট অ্যাঞ্জেলে আবার সবার মুখে মুখে কেবল কালো হাতের কথা, সমস্ত আলোচনার বিষয়বস্তু যেন একমাত্র সে। আরেক বার জাহাজে ঝাড়া তল্লাশি চালিয়ে গেল পুলিশ। বৃথা চেষ্টা। কোন লাভ হলো না। উদ্ধার করা গেল না মিস্টার রডরেজের চুনির আঙটি।

নানা রকম উদ্ভট ভবিষ্যদ্বাণী আরম্ভ করলেন মিসেস রোজ, 'আর রক্ষা নেই

কারও, বুঝলেন, রক্ষা নেই! একেক দিন সকালে উঠে দেখবেন একেক জনের গলা কাটা! আগেই বলে দিচ্ছি! তখন যেন বলবেন না সাবধান করিনি আমি!'

সাবধান করার কথা বলছেন বটে, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না তাদের ভাল চান, ব্যাপারটা ঘটলেই যেন বেশি খুশি হন তিনি।

ডিনারের পর ওপরের ডেকে চলে এল তিন গোয়েন্দা, জিনা ও টকার। অবশ্যই সঙ্গে এসেছে রাফি অর নটি। নিরাপদে বসে কথা বলার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বের করল, একটা লাইফবোট। ওটাতে উঠে বসল সবাই।

'কি করতে চাও এখন?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'মিসেস সোয়ানসনের হার চুরি গেল, মিস্টার রডরেজের আঙটি আর মানিব্যাগ। এখন তো মনে হচ্ছে মিস টিটাঙের ব্রৌচটাও চুরিই হয়েছে, হারায়নি। আমরা যে অন্ধকারে ছিলাম সেই অন্ধকারেই আছি, একটুও এগোতে পারিনি।'

'ভাবতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল, 'ভালমত ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। কাজে নামার আগে কি ভাবে কি করব তার একটা ছক তৈরি করে নেয়া ভাল।'

'হুঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল জিনা, 'ঠিকই বলেছ। কাকে কাকে সন্দেহ করছি আমরা, সেটা দিয়ে শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ,' টকার বলল। গোয়েন্দাদের সঙ্গে আবার একটা রহস্য ভেদে সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছে বলে খুশি। 'এক কাজ করতে পারি। আজ কে কে ডাঙায় উঠেছিল তার একটা লিস্ট করে, যাদের সন্দেহ হয় না তাদের নাম কেটে দিতে পারি। কমে আসবে নাম। তখন নজর রাখায় সুবিধে হবে।'

আইডিয়াটা সকলেরই পছন্দ হলো। পকেট থেকে কাগজ আর পেন্সিল বের করল রবিন। সকালে যারা পিয়ানায় বেড়াতে গিয়েছিল তাদের নাম লিখে ফেলতে লাগল এক এক করে। লেখা শেষ করে পড়ে শোনাল সবাইকে।

'হ্যাঁ, আঠারো জন হয়েছে,' কিশোর বলল। 'কয়েক জনের নাম এক্ষুণি ছেঁটে ফেলা যায়।'

'কেরিআন্টি এবং আমরা,' মুসা বলল। 'ছয় জন বাদ।'

'পারসার আর পিটারকেও বাদ দিয়ে দেয়া যায় নিশ্চিন্তে,' জিনা বলল।

'তা যায়,' রবিন বলল। কেটে দিল নাম দুটো। 'আট জন গেল।'

'হুয়ান রডরেজও বাদ,' টকার বলল। 'তাঁর আঙটি চুরি গেছে। নিজের আঙটি নিশ্চয় নিজে চুরি করেননি তিনি।'

'মিসেস রোজও বাদ,' বলল মুসা। 'একে তো বয়স্ক, তার ওপর এমন রোগার রোগা, রডরেজের মত একজন পুরুষকে জুডোর কায়দায় চিত করে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।'

কাটতে যাচ্ছিল রবিন, বাধা দিল কিশোর, 'রাখো। চেহারা আর শরীর দেখে কাউকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া উচিত হবে না। রডরেজকেও বাদ দেয়া যাবে না এখনই। পাথরে মাথা ঠুকে নিজে নিজেই ওরকম জখম করা সম্ভব। নিজের পা নিজেই বাঁধা যায়। হাতও যে ভাবে বাঁধা ছিল, সেটাও পারা যায়। আঙটি আর

মানিব্যাগ লুকিয়ে ফেলাটা তো অতি সহজ কাজ।'

'কেন করবেন এসব?' বুঝতে পারছে না টকার।

'যাতে সবাই মনে করে তিনি কালো হাত নন। তাঁর ওপর থেকে সন্দেহ চলে যায়। মিসেস রোজকেও বাদ দেয়া উচিত নয়। গায়ে জোর নেই, রোগা, এসব ভানও হতে পারে। জুডো-কারাত যে কেউ শিখতে পারে, আর এর জন্যে গায়ের জোর খুব একটা দরকার হয় না।'

'বেশ, থাক রডরেজ আর মিসেস রোজ,' রবিন বলল। 'কিন্তু মিস্টার রিচার্ড হুফারকে তো বাদ দেয়া যায়? পঙ্গু মানুষ, হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন।'

'কি করে বুঝব?'

চুপ হয়ে গেল সবাই। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তাই তো! কি করে বুঝবে?

'পঙ্গু তো তিনি নিজে বলছেন,' আবার বলল কিশোর, 'আমরা কি আর জানি? ডাক্তারের রিপোর্টও আমরা দেখিনি। হাঁটতে পারেন না, ক্রাচে ভর দিয়ে চলতেও অসুবিধে হয়, এগুলোও তাঁর মুখের কথা। সবই তাঁর অভিনয় হতে পারে। ধোঁকা দেয়ার জন্যেই হয়তো করছেন।'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'মানলাম তোমার কথা। ধরে নিলাম, জিম ক্যাম্পারও তার সহযোগী। এখন মিস্টার ও মিসেস সোয়ানসনের কথা কি বলবে?'

'রডরেজের কথা যা বলেছি। হার চুরির ব্যাপারটা একেবারেই ভুয়া হতে পারে। সব সাজানো কথাবার্তা।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'মোট দশজন। আবে, ভিক ড্যান, জিউসেপ অ্যারিয়ানো, মিসেস রোজ, মিস টিটাং, সোয়ানসনরা দুজন, হুয়ান রডরেজ, রিচার্ড হুফার ও জিম ক্যাম্পার।'

'রাইট,' কিশোর বলল। '*হারাধনের দশটি ছেলে!*'

'সেটা আবার কি?' বুঝতে পারল না মুসা।

'একটা বাংলা কবিতা। খুব সুন্দর। হারাধন নামে এক লোকের দশটি ছেলে থাকে। একজন একজন করে মরতে মরতে শেষ পর্যন্ত আর কেউই থাকে না।'

'সুন্দর তো!' রবিন বলল, 'পড়তে হবে। দিয়ো তো আমাকে।'

মাথা কাত করল কিশোর।

'লোক কিন্তু খুব একটা কমল না,' আগের কথার খেই ধরে বলল টকার। 'এখনও অনেক।'

'অ্যারিয়ানোকে খারাপ ভাবতে পারছি না আমি,' জিনা বলল। 'তাঁর মত একজন ভদ্রলোক চোর হতে পারেন না।'

'জিনা, গোয়েন্দা গল্প তো আর কম পড়োনি,' কিশোর বলল। 'জানা আছে, যে লোকটাকে সব চেয়ে বেশি নিরপরাধ মনে হয়, শেষে গিয়ে দেখা যায় যত নষ্টামি সে-ই করেছে।'

'পিটারের সাহায্য চাইতে পারি আমরা,' মুসা বলল। 'আমরা যে গোয়েন্দা, অনেক রহস্যের সমাধান করেছি, একথা বলেছি তাকে। বেশ আগ্রহী মনে হলো

তাকে। বললে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যেতে পারে।'

'তোমার এই এক দোষ,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। 'পেটে কথা থাকে না। পিটার উডকেই বা আমরা কতটা চিনি? জাহাজে ওঠার আগে পরিচয় হয়েছে। কালো হাত সে-ও হতে পারে। পারসার জাহাজের কর্মচারী হলেও তাঁকেও সন্দেহ করতে পারি আমরা। কে জানে, চাকরিটা হয়তো তাঁর একটা ছদ্মবেশ, পুলিশের চোখে ধুলো দেয়ার সুবিধের জন্যে। পিটারকেও কাজ দিয়েছেন তিনিই। এমনও তো হতে পারে পিটার তাঁর সহযোগী?'

'সাংঘাতিক সন্দেহপ্রবণ মন তোমার, কিশোর,' হাসতে হাসতে বলল জিনা। 'তুমি গোয়েন্দা হবে না তো আর কে হবে? আমাদের যে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছ সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

জিনার কথার জবাব দিল না কিশোর। আগের কথার খেই টেনে মুসাকে বলল, 'শোনো, সেদিন কি বলেছি মনে নেই? কালো হাত আমাদেরকে ছেলেমানুষ ভাববে, এটাই আমাদের মস্ত সুবিধা। এর মাঝে বড়দের ঢোকানো উচিত না।'

'যা-ই বলো,' রবিনও পিটারকে ঢোকাতে আগ্রহী, 'পিটার আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারবে। এদিককার সমস্ত জায়গা তার চেনা। তদন্তের খাতিরে জাহাজেরও সবখানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে আমাদের। আমরা বললে তো পারসার শুনবেন না, পিটার তাঁকে রাজি করাতে পারবে।'

চলল তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি, পাল্টা যুক্তি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবার চাপের মুখে হার মানতে বাধ্য হলো কিশোর। সকলের সঙ্গে চলল পিটারকে বলতে ওরা তার সাহায্য চায়।

চুপ করে সব শুনল ম্যাজিশিয়ান। বলল, 'আমাকে যে এতটা বিশ্বাস করেছ, জেনে খুশি হলাম। সাধ্যমত সাহায্য করব। তোমাদের সব ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখব। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না, ডেঞ্জারাস একজন অপরাধীর পেছনে লাগতে যাচ্ছি আমরা। সাংঘাতিক চালাক একজন লোক। তার মুখোশ খোলা অত সহজ হবে না।'

অ্যাজাসিও উপসাগরে রাত কাটাল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। পরদিন সকালে যাত্রীরা একবার ঢুঁ মেরে এল শহরে। আবার যাত্রা করল জাহাজ, এবারের গন্তব্য, আলজিয়ার্স। উত্তেজিত হয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। ওরা ভাবতেই পারেনি আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত চলে যাবে জাহাজ।

অন্য যাত্রীরাও খুশি। জাহাজের গতিতে বাধা হলো না কেউই, চলায় বিরতি দিয়ে মাঝে কোথাও নামার জন্যে ব্যস্ত হলো না। ইতিমধ্যেই যারা চোরের শিকার হয়েছেন, তাদের ভয় চলে গেছে। কালো হাত আর কিছু করবে না তাদের। যাদের ওপর এখনও হামলা আসেনি, তারাও ভুলে থাকার চেষ্টা করছে। যতটা সম্ভব আনন্দ আদায় করে নিয়ে ভাড়ার টাকা উসুল করতে চাইছে। ভাবখানা এমন, যখন হামলা আসে তখন দেখা যাবে।

'আসল কথা হলো,' কিশোর বলল, 'কেউ এখন জাহাজ থেকে নামার কথা বললেই তার ওপর সন্দেহ জাগবে। ভাববে, চোরাই মাল লুকানোর জন্যে কিংবা

পালানোর জন্যে নামতে চাইছে। পুলিশ তাকে প্রশ্ন করতে আসবেই। অপমান হতে চায় না আরকি কেউ।'

পরদিন সকালে নাস্তা করার জন্যে ডাইনিং রুমে হাজির হলো যাত্রীরা। ছেলেমেয়েদের অবাক করে দিয়ে ওদেরকে তাঁর টেবিলে বসে খেতে ডাকলেন ক্যাপ্টেন বেরিমোর। খুশি হলো ওরা। কালো হাতের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে পারবে তাঁকে। নতুন কোন তথ্য জানাতেও পারেন।

কিন্তু নামটা শুনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'আমাদের আনন্দটাই মাটি করে দিয়েছে চোরটা। তবে বেশিদিন আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। কড়া নজর রাখছেন মিস্টার বটব্যাল। ধরা তাকে পড়তেই হবে।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটল তাঁর। যাত্রীদের সব দায়িত্ব এখন তাঁর ওপর। সেটা তিনি ঠিকমত পালন করতে পারেননি ভেবে নিজেকেই দোষারোপ করছেন। ঘাম মোছার জন্যে পকেট থেকে রুমাল বের করতেই ভেতর থেকে মেঝেতে পড়ল একটা ছোট কার্ড। তোলার জন্যে নিচু হয়েই বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর।

ধীরে ধীরে সোজা হলো আবার সে। আস্তে করে কার্ডটা রাখল টেবিলে।

হাঁ হয়ে গেছে অন্যেরা। বোকা হয়ে গেছেন যেন ক্যাপ্টেন তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে।

মুসা তো একবার কার্ডটার দিকে চেয়ে সেই যে তাঁর দিকে তাকিয়েছে, চোখ সরাচ্ছে না আর। ক্যাপ্টেন বেরিমোর কালো হাত! অসম্ভব! গলা কেটে ফেললেও একথা বিশ্বাস করতে পারবে না সে।

ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই টকারের কাঁধ থেকে এক লাফে টেবিলে নামল নটি। ঘাড় কাত করে কিশোরের দিকে তাকাল একবার। প্রায় থাবা দিয়ে কার্ডটা তুলে নিয়ে গিয়ে আবার ঢুকিয়ে দিল ক্যাপ্টেনের পকেটে।

হেসে উঠল টকার। 'বানরটাকে মাপ করে দেবেন, ক্যাপ্টেন। বেশি পাজি হয়েছে আজকাল। আপনার সঙ্গেও মজা করল।'

আশেপাশের অনেকেই তাকিয়ে আছে এদিকে। ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। একবার দ্বিধা করে পকেট থেকে আবার কার্ডটা বের করলেন ক্যাপ্টেন।

'আরে ওটা তো আমার কার্ড!' চেঁচিয়ে উঠলেন রডরেজ। 'আমার পকেটে ফেলে গিয়েছিল কালো হাত। ডান কোণে রক্ত লেগে আছে। আমার কপাল থেকে লেগেছে। কেবিনে ফেলে এসেছিলাম...'

বাধা দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। বানরটার কাজ,' মলিন হাসি ফুটেছে তাঁর ঠোঁটে। 'আপনার কেবিন থেকে চুরি করে এনে আমার পকেটে ঢুকিয়েছে।' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'ইস্, কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিল!'

হেসে উঠল অনেকেই।

নাস্তা শেষ। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। আফ্রিকার উপকূল ধরে চলেছে জাহাজ। নাহ্, ছুটিটা দারুণ কাটছে, স্বীকার করতেই হলো।

সেদিন বিকেলে আলজিয়ার্সে পৌঁছল জাহাজ। কয়েক ঘণ্টা শহরে কাটিয়ে এল গোয়েন্দারা।

দেখার মত কিছু গিরিসঙ্কট আছে এখানে। পরদিন সকালে গাড়ি ভাড়া করে তা-ই দেখতে চলল কিছু যাত্রী। কিশোররা অবশ্যই রইল তাদের দলে। বাসের সামনের দিকে বসল ওরা।

'আজ যেখানে যাচ্ছি আমরা খুব সুন্দর জায়গা,' মিস্টার টারময়েল বললেন। 'গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে বইছে বিখ্যাত মাংকি স্ট্রীম। একটা ঝর্না। নাম শুনেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন অনেক বানরের বাস ওখানে।'

টকারের পিঠে হাত রাখল মুসা, 'নটির গলায় চেন লাগাও। স্বজাতিদের দেখলে ঠিক থাকতে পারবে না। পালাবে।'

'পালাবে না। ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।'

গিরিসঙ্কটগুলো সত্যিই দেখার মত। বড় বড় গাছ জন্মে আছে। ডালে ডালে অসংখ্য বানর, চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করছে। মুসার কথা মত নটির গলায় শেকল পরিয়ে দিয়েছে টকার।

হঠাৎ ছুটে যাওয়ার জন্যে শেকল টানাটানি শুরু করল নটি। স্বজাতিদের কাছে যাওয়ার জন্যে নয়। তার নজর অন্যদিকে। বাদাম বিক্রি করছে এক আরব বালক। ওগুলো দেখেই লোভ সামলাতে পারছে না বানরটা।

রাফিকে দেখে মুখ ভেঙচাতে ভেঙচাতে গাছ থেকে নেমে এল দুটো দুষ্টু বানর। একটা তার লেজ ধরে টানতে লাগল, আরেকটা কান। এরকম বিপদে আগে পড়েনি কুকুরটা। ঘাবড়ে গিয়ে এক জায়গায় চক্কর দিতে শুরু করল। হ্যাঁচকা টানে টকারের হাত থেকে দড়ি ছুটিয়ে নিয়ে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল নটি। তার চেয়ে অনেক বড় বানরগুলোর সঙ্গে লেগে গেল ঝগড়া। থাপ্পর মেরে বসল একটার কানে। আরেকটা আক্রমণ করতে আসতেই লাফিয়ে সরে গেল।

মজার দৃশ্য। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল কয়েকজন ট্যুরিস্ট, তাদের মাঝে হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের যাত্রীও রয়েছে।

আগে আগে ছিল জিনা, বানরগুলো যে রাফিকে আক্রমণ করেছে প্রথমে দেখতে পায়নি। চেঁচামেচি শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে এই অবস্থা। চিৎকার করে বানরগুলোকে গাল দিতে দিতে ছুটল। ওদিকে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিল আরও একজন, মিস টিটাং। বিশাল এক বানর তার পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে। মহিলা একেবারে একা, কাছাকাছি কেউ নেই। সবাই ছুটেছে কুকুর-বানরের লড়াই দেখতে।

দাঁত-মুখ খিঁচাল বদমেজাজী বানরটা। তারপরই লাফ দিল। আঁচড়ে-কামড়ে একাকার করে দেবে বিদেশিনীকে।

বিস্ময়কর একটা ব্যাপার ঘটল। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে একপাশে সরে গেল মিস টিটাং। খপ করে চেপে ধরল বানরটার একটা রোমশ হাত। অদ্ভুত কায়দায় নিজের শরীরটাকে মোচড় দিতেই পিঠের ওপর চলে এল জানোয়ারটা। মাথার

ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে মারল প্রচণ্ড এক আছাড়। আস্তে করে ছেড়ে দিল হাতটা। এক আছাড়ই যথেষ্ট। জীবনে অনেক লড়াই করেছে বানরটা, জিতেছে, হেরেছে, কিন্তু এমন আজব মার আর খায়নি। আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে গিয়ে গাছে উঠেই ডালে ডালে লাফিয়ে ছুটে পালাল। ত্রিসীমানায় রইল না আর।

তাজ্জব হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। মহিলার চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়েছিল। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। জিনা আর টকার ঘটনাটা দেখতে পায়নি। রাফি ও নটিকে বানরের আক্রমণ থেকে মুক্ত করতে ব্যস্ত ছিল ওরা।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'কাণ্ডটা কি করল দেখলে? এ তো জুডোর প্যাঁচ!'

'হ্যাঁ!' বিড়বিড় করে বলল বিস্মিত রবিন, 'কে ভাবতে পেরেছিল ওরকম একজন মহিলা এমন মার জানে! এখন তো তাকেই সন্দেহের তালিকায় এক নম্বরে ফেলতে হয়! কি বলো, কিশোর?'

মাথা নেড়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'হ্যাঁ, হুয়ান রডরেজকে চিত করে দেয়ার ক্ষমতা তার আছে!'

গিরিসঙ্কট দেখা শেষ করে আবার গাড়িতে ফিরল গোয়েন্দারা। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, মিস টিটাঙের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। পিটারকে জানানো হলো সেকথা। শুনে সে-ও চিন্তিত হলো। একমত হলো নজর রাখার ব্যাপারে। জিনা আর টকার বলাবলি করতে লাগল, আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল মহিলাকে। জুডো-কারাতে যে চীনারা এক্সপার্ট হয়, ভাবলেই মিস টিটাঙের ওপর সন্দেহ জোরদার হত।

আট

আলজিরিয়া আর তিউনিসিয়া দেখার পর টারময়েল ঘোষণা করলেন, জাহাজের পরবর্তী স্টপেজ হবে কারথেজ। প্রাচীন শহরটার একেবারে পায়ের কাছে গাল্ফ অভ তিউনিসে নোঙর ফেলল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। অগুনতি পাম গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেইন্ট লুই গির্জার সাদা বাড়ি।

'অনেক পুরানো শহর এটা,' পিটার বলল। 'খ্রীষ্টের জন্মের আটশো আটাত্তর বছর আগে এর গোড়াপত্তন করেছিলেন রানী ডিডো।'

শহর দেখাতে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হলো পিটার। খুশি হলো ওরা। পৃথিবীর বহু জায়গায় গেছে লোকটা, অনেক কিছু দেখেছে, অনেক জানে।

প্রায় সবাই এখানে নামতে ইচ্ছুক। বিখ্যাত ধ্বংসস্তূপগুলো দেখতে চায়।

'শোনো,' চুপি চুপি সঙ্গীদের বলল কিশোর, 'যাদের আমরা সন্দেহ করি কেবল তাদের ওপর নজর রাখবে। অন্যেরা বাদ। মনে থাকে যেন। অহেতুক অন্য লোকের পিছে সময় নষ্ট করতে যাবে না।'

'আমি মিসেস টিটাঙের ওপর চোখ রাখব,' টকার বলল।

'রাখো। বাকি যারা থাকে তাদের ওপর নজর রাখব আমরা। কাউকে চোখের আড়াল করা চলবে না।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন তুলল মুসা, 'বাকি থাকে নয়জন। লোক আমরা চারজন। একেক জনের ভাগে পড়বে দুজনের বেশি। সেই দুজন যদি হঠাৎ করে দুদিকে রওনা দেয় তখন?'

'তা জানি না। তবে রাখতেই হবে। সবাই মোটামুটি একই জিনিস দেখতে যাবে তো, হঠাৎ করে আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।'

'আমি মিসেস রোজের ওপর চোখ রাখতে পারব,' পিটার বলল। 'তাঁর গাইড হতে অনুরোধ করেছেন আমাকে। সারাক্ষণ সঙ্গে থাকতে অসুবিধে হবে না।'

'মনে হচ্ছে সময়টা ভালই কাটবে আমাদের,' জিনা বলল।

গরম খুব বেশি এখানে। পিয়ানার মত অত আরামে হাঁটতে পারল না কেউ। একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরের ঢোকার মুখে এসে আর পারলেন না জিউসেপ অ্যারিয়ানো। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ করে বসে পড়লেন একটা গাছের ছায়ায়, পাথরের ওপর। খানিক দূর থেকে যে তাঁর ওপর নজর রাখা হচ্ছে খেয়ালই করলেন না। সিগারেট বের করে ধরিয়ে আরাম করে টানতে লাগলেন।

যার যার মত ঘোরাফেরা করে গাড়িতে ফেরার সময় চিৎকার করে উঠলেন পিয়ানোবাদক, 'হায় হায়, আমার ঘড়ি! হারালাম কি করে!'

প্লাটিনামের তৈরি ঘড়িটা, অনেক দামী, জানালেন তিনি।

'শেষ কখন দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একটা মন্দিরের কাছে বসেছিলাম। তখন।'

'অনেকক্ষণ বসেছেন, দেখেছি। বোধহয় ওখানেই হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে। চলুন, খুঁজে দেখি।'

মন্দিরটার দিকে দৌড় দিল সে। অন্যেরা ছুটল পেছনে। যেখানে বসেছিলেন পিয়ানোবাদক, সেই পাথরটার কাছে এসে ওটার আশেপাশে খুঁজতে শুরু করল। ঘড়ি পাওয়া গেল না। তবে পাথরের একটা খাঁজে গোঁজা ছোট কার্ড পাওয়া গেল।

অবশ্যই কালো হাতের কার্ড। নিজের ওপরই রেগে গিয়ে বলল কিশোর, 'আমাদের নাকের নিচ দিয়ে ঘড়িটা নিয়ে গেল! কিছুই করতে পারলাম না। ঘড়ি যত দামীই হোক, কত আর বেশি হবে? হীরা-টীরার কাছে কিছু না। আসলে আমাদের বোকা বানিয়ে মজা পাওয়ার জন্যেই কাজটা করেছে কালো হাত।'

'তার মানে আরেকজনের নাম তালিকা থেকে কাটতে পারছি আমরা?' রবিনের প্রশ্ন। 'মিস্টার অ্যারিয়ানো বাদ?'

'কেন?' মুসা বলল। 'আরও তিনজনের তো জিনিস চুরি গেছে, তাদেরকে তো বাদ দিইনি। অ্যারিয়ানোকেই বা দেব কেন?'

'এখানে বসে যখন জিরাচ্ছিলেন,' কিশোর বলল, 'তখন তাঁর কাছে কেউ এসেছিল কিনা জিজ্ঞেস করা দরকার।'

পিয়ানোবাদক জানালেন তেমন কেউই আসেনি তাঁর কাছে, কেবল মিস রোজ আর পিটার বাদে। মহিলাকে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখাতে নিয়ে এসেছিল ম্যাজিশিয়ান। ঢোকার পথে তাঁর সঙ্গে একটা কি দুটো কথা বলেছেন মহিলা। কি মনে পড়তেই প্রায় চিৎকার করে উঠলেন অ্যারিয়ানো, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, আরও দুজন

এসেছিল। মিস্টার আবে আর তার সেক্রেটারি জিম ক্যাম্পার। আমার পাশে থেমেওছিল। ভুলে গিয়েছিলাম। ইস্, এত ভুলো মন আমার!'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। আসলেই কি ভুলো মন, না ভান করছেন? কতটা ভরসা রাখা যায় এই লোকের কথায়?

একটা অনুমান ভুল হয়ে গিয়েছিল তার। জাহাজ থেকে নেমেই ছড়িয়ে পড়েছিল যাত্রীরা। ফলে সন্দেহভাজনদের নয় জনের ওপরই ঠিকমত নজর রাখা সম্ভব হয়নি। কেবল টকার সফল হয়েছে, কারণ মাত্র একজনের পিছু নিয়েছিল সে। মিস টিটাগুের সঙ্গে ছায়ার মত লেগেছিল। জোর দিয়ে বলছে, মহিলা কালো হাত হতেই পারে না।

'শেষের দিকে তো বিরক্তই হয়ে গিয়েছিল মহিলা,' টকার বলল। 'খোলাখুলিই বলেছে, আমি তাকে অনুসরণ করছি এটা তার ভাল লাগছে না। আর যেন না করি। তারপরেও করেছি, গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকিনি আর, তবে দূর থেকে করেছি। চোখের আড়াল করিনি। তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় এখন।'

গাড়িতে ফিরে এল গোয়েন্দারা। ওদেরই অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার, উঠতেই ছেড়ে দিল গাড়ি।

কারথেজের কাছেই আরবদের ছোট একটা গ্রাম আছে। মিস্টার টারময়েলের নির্দেশে সেখানে গাড়ি নিয়ে চলল পারসার। ওখানেও দেখার জিনিস আছে। তবে আসল কারণ এক ধরনের বিশেষ চা খাওয়ানো, তার নাম মিন্ট টী।

সন্দেহের তালিকাটা বের করে মিস টিটাগুের নামটা কেটে দিল রবিন।

তার পাশেই বসেছে কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'তার ওপর খুব একটা সন্দেহ ছিল না আমার। কালো হাত একজন মহিলা, এটা আর বিশ্বাস করতে পারছি না এখন। তবু শিওর হতে চেয়েছিলাম।'

জানালার পাশে বসেছে জিনা। কিশোরের পাশে। কথাটা তার কানেও গেল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যত যা-ই বলো, মিসেস রোজের ওপর থেকে এখনও সন্দেহ যাচ্ছে না আমার। গ্রামটায় গিয়েই আমি তার পিছু নেব। মহিলা নাকি খুব জ্বালিয়েছে পিটারকে। অভিযোগের পর অভিযোগ, একটা মুহূর্ত নিস্তার দেয়নি যতক্ষণ সঙ্গে ছিল। শেষে মহা বিরক্ত হয়ে পিটার বলেছে, অন্তত মিনিট পনেরো তাকে রেহাই দিতে। সরে গেছে। ওই পনেরো মিনিট মহিলা কি করেছে সে বলতে পারবে না। কাজেই আমরাও বলতে পারছি না। সে জন্যেই ঠিক করেছি, এবার আমি নিজে ওর পিছু নেব। দেখি, কি ভাবে রেহাই পায়!'

গ্রামে পৌছল গাড়ি। উঠে গিয়ে মিস রোজের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল জিনা। বলল, সে তাঁর সঙ্গী হতে চায়।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মিসেস রোজ। 'আমার সঙ্গী হবে? অবাক কাণ্ড! উদ্দেশ্যটা কি বলো তো?'

না না, কোন উদ্দেশ্য নেই, তাড়াতাড়ি বলল জিনা। আসলে ছেলেদের সঙ্গ আর ভাল লাগছে না।

সন্দেহ গেল না মহিলার। জিনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল। কি ভাবল কে জানে। হঠাৎ হাত নেড়ে ঘাড় কাত করে বলল, 'বেশ, আসতে চাইলে এসো। তবে কোন রকম ঝামেলা করবে না, বলে দিলাম।'

করবে না, কথা দিল জিনা। মনেপ্রাণে চাইছে, আরেকবার আঘাত হানুক কালো হাত। তাহলে আর কিছু না হোক, মিস রোজকে অন্তত সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারবে। সন্দেহ যত কম লোকের ওপর সীমিত করে আনতে পারে ততই সুবিধে।

যেখানেই জাহাজ থামে, তীরে নামে, সেখানেই একটা করে অঘটন ঘটে। পুলিশের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে যাত্রীরা। কোথায় এসেছে কদিন আরামে থেকে একঘেয়েমি কাটিয়ে শরীরটাকে চাঙা করবে, তা না, আরও খারাপ হচ্ছে সব কিছু. সেটা থেকে যদি মানুষগুলোকে বাঁচানো যেত, ভাল হত, ভাবছে জিনা।

একটা কাফেতে মিন্ট টী খেয়ে বেরিয়ে পড়ল যাত্রীরা, যা দেখতে এসেছে দেখার জন্যে। মিস রোজের সঙ্গে রইল জিনা। ওদের আগে আগে রয়েছে রাফি। লেজ নাড়তে নাড়তে খুশি মনে হাঁটছে। দলের একজন ভেবে তাকে যে সঙ্গী করা হয়েছে তাতেই বোধহয় এতটা আনন্দ। মিসেস রোজের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে। অহেতুক বকা খেতে চায় না।

এমনই একজনের সঙ্গী হয়েছে জিনা, যাকে দুচোখে দেখতে পারে না। পিটারের মত ধৈর্যশীল মানুষরাই টিকতে পারে না তাঁর সঙ্গে, সে কি করে টিকবে? মনকে বোঝাতে বোঝাতে চলেছে সে, কিছুতেই রাগবে না, রাগলেও সেটা প্রকাশ করবে না, যত কষ্টই হোক থেকে যাবে মহিলার সঙ্গে। জানতেই হবে মিসেস রোজই কালো হাত কিনা। অবশ্য তার জন্যে আরেকটা চুরির ঘটনা ঘটতে হবে।

বাস থেকে নামার পর থেকেই সেই যে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করেছে মহিলা, করেই চলেছে, করেই চলেছে। সে সব মুখ বুজেই সহ্য করছে জিনা। একটা জায়গায় এসে খাড়া উঠে গেছে পুরানো আমলের সিঁড়ি। মিস রোজ বায়না ধরে বসল, ওপরে উঠে দেখবে। ওপর থেকে চারপাশের অনেক দৃশ্য দেখা যাবে। তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হলে চাহিদা পূরণ করতেই হবে জিনাকে। উঠতে শুরু করল। কয়েক ধাপ উঠেই মহিলা আর নিজে নিজে উঠতে পারে না, বলল জিনার কাঁধে ভর দিয়ে উঠবে। কাঁধও পেতে দিল জিনা। কিশোররা এই অবস্থা দেখলে এখন হতবাক হয়ে যেত। কিন্তু দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র অনীহা দেখাল না সে।

ওপরে যখন উঠল, একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছে জিনা। ধরতে গেলে তার কাঁধে ঝুলে থেকেই ওপরে উঠেছে মহিলা। রাগের চোটে একবার মনে হলো দেয় ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে। অনেক কষ্টে সংযত করল নিজেকে।

সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তখন জিনা, মহিলার অত্যাচার আর সইতে পারবে না বলে যখন মনে হলো, তখনই ঘোষণা করলেন তিনি, অনেক দেখা

হয়েছে, এবার বাসে ফিরে যেতে চান।

গাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে যাত্রীরা। কি ব্যাপার? তাড়াতাড়ি পা চালাল জিনা। পেছন থেকে ডাকতে শুরু করলেন মিসেস রোজ, কানেই তুলল না সে। আসল সময়টা পার করে দিয়েছে, এখন আর মহিলার সঙ্গে থাকার প্রয়োজন নেই।

জিনাকে দেখে হাত তুলে তাড়াতাড়ি যেতে ডাকতে লাগল টকার আর মুসা।

দৌড় দিল জিনা। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, ব্যাপার কি? কিছু হয়েছে?'

'জিনা,' মুসা জানাল, 'ডিক ড্যানের ওপর হামলা হয়েছে!'

'দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি!' মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল টকার, 'বেচারা! গায়ের জ্যাকেট খুলে হাতের ওপর ভাঁজ করে নিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। জ্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে গেল। লোকটাকে চিনতে পারেননি তিনি, কারণ ওর মুখে মুখোশ ছিল, নাচের দিন রাতে মিস্টার আবে যেমন পরেছিলেন। জ্যাকেটটা নিয়েই দৌড়ে চলে গেল লোকটা। পিছে পিছে দৌড় দিলেন মিস্টার ড্যান। মোটা মানুষ, তেমন দৌড়াতে পারেন না। লোকটা সাংঘাতিক জোরে ছুটতে পারে। পালিয়ে গেল। সেদিকে এগিয়ে এক জায়গায় জ্যাকেটটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন তিনি।'

'কিন্তু তাঁর মানিব্যাগটা খোয়া গেছে পকেট থেকে,' টকারের বক্তব্য শেষ করে দিল রবিন। 'পকেটে কি পেয়েছে জানো?'

'জানি। কালো হাতের একটা কার্ড।'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো বার বার বলছি,' মিস্টার টারময়েলের দিকে তাকিয়ে আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার আবে, 'আমার দেহতল্লাশি করা হোক! করছেন না কেন? আমি চোর হলে আমার কাছেই পাবেন ব্যাগটা। আমি আবারও বলছি, সার্চ করুন আমাকে!'

'আমি তো আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না,' যাঁর ব্যাগ খোয়া গেছে সেই ডিক ড্যান বললেন কর্কশ গলায়, 'খামোকা চিৎকার করছেন কেন? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করার চেয়ে চলুন পুলিশের কাছে যাই।'

জানানো হলো পুলিশকে। সেই একই ফল, সবাইকে আরেক দফা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া লাভ কিছুই হলো না। সবার সামনে তাঁর দেহতল্লাশি করতে জাহাজের গোয়েন্দা মিস্টার বটব্যালকে বাধ্য করলেন মিস্টার আবে। মানিব্যাগটা পাওয়া গেল না। মেজাজই খারাপ হয়ে গেছে মিস্টার বটব্যালের। তাঁর নাকের ডগায় একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে চলেছে চোরটা, অথচ কিছুই করতে পারছেন না তিনি। নিজের ওপরই মহাখাপ্পা হয়ে গেছেন।

গাড়িতে উঠে কিশোর আর রবিনের প্রায় কানে কানে বলল জিনা, 'মিসেস রোজের নাম কেটে দাও। অবশ্য কাটতে নাহলেই খুশি হতাম। এমন জ্বালান জ্বালিয়েছে, উফ্!'

'তাহলে আর রইল আটজন,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'সাতজন পুরুষ এবং একজন মহিলা।'

তিউনিসে চলেছে গাড়ি।

পেছন থেকে টকার বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, এখন কিন্তু ঘন ঘন হামলা চালাচ্ছে কালো হাত। সবাইকে ঠকিয়েই যেন মজা পাচ্ছে। ঘড়ি, মানিব্যাগ, এসব চুরি করছে টাকার জন্যে নয়, মজা করার জন্যে। সবার সঙ্গে রসিকতা করছে; মিস্টার বটব্যাল, ক্যাপ্টেন, অন্যান্য যাত্রী, এমনকি আমাদের সঙ্গেও।'

'তিউনিসে কি ঘটবে বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল। 'তবে ঘটবে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

কাছাকাছিই বসেছেন মিস রোজ। জিনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিউনিসে গিয়ে আমার সঙ্গে থাকবে?'

'জ্বী না! আরও যাই আপনার সঙ্গে!' শেষ কথাটা বলার সময় কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল জিনা, মিসেস রোজ বোধহয় বুঝলেন না, তবে একেবারে কাছে বসা পিটার ঠিকই শুনল। মুচকি হাসল সে। জিনার রাগ এখনও যায়নি মহিলার ওপর থেকে। হাসল আরেকটা কারণে। মহিলার গলা শুনলেই কুঁকড়ে যায় বেচারা রাফি। সেটা দেখলে আরও রাগ হয় জিনার। কি করে জানি নটিও বুঝে গেছে তার বন্ধু কুকুরটা মিস রোজকে দেখতে পারে না। তাই মহিলা কথা বললেই এখন সে তাঁর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচায়।

কিশোর কোন কথা বলছে না। চোখ বাইরের দিকে। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

আরবদের গ্রামটা থেকে তিউনিস বেশি দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল। সেখানে পৌছল গাড়ি। যাত্রীরা নামল। আফ্রিকা হোটেলে চলল খাঁটি তিউনিসিয়ান খাবার খাওয়ার জন্যে।

হোটেলটা শহরের ঠিক মাঝখানে। অতি আধুনিক ছয়তলা বাড়ি। লিফট আছে চারটে। লোক সমাগম বেশ ভালই, আসছে, যাচ্ছে। লাউঞ্জ পাঁচতলায়, ডাইনিং রুম দোতলায়।

যাত্রীদের অনেকেরই খুব পিপাসা পেয়েছে। সোজা চলে গেল তারা কোল্ড ড্রিংক খেতে। বাকি যারা রইল তাদের কেউ বসল লাউঞ্জে, কেউ ঘুরতে গেল বিশাল রিসিপশন এরিয়ায়। ছাতে ঢাকা চত্বরের মত জায়গা। মাঝখানে একটা ফোয়ারা থেকে পানি ঝরছে, শীতল রেখেছে ঘরের আবহাওয়া। কাচের বাক্সে নানা রকম বাহারী জিনিস সাজানো রয়েছে বিক্রির জন্যে। যার ইচ্ছে কিনতে পারে।

বারের সামনের উঁচু টুলে এসে বসল গোয়েন্দারা। বড়রা কেউ নেই এখানে। সবাই বসেছে দূরে সোফায় কিংবা ইজিচেয়ারে, যেখানে আরাম অনেক বেশি, শরীর ঢিল করে দেয়া যায়।

কোল্ড ড্রিংক খেতে খেতে আলোচনা করতে লাগল গোয়েন্দারা।

'আমার বিশ্বাস,' টকার বলল, 'মিস্টার আবেই কালো হাত।' কোন ফাঁকে যে তার কাঁধ থেকে নেমে কাঠের ডিশে সাজিয়ে রাখা জলপাই চুরি করতে চলে গেছে দুষ্টু নটি, খেয়ালই নেই তার।

মুসা বলল, 'না-ও হতে পারেন। চোরটার শরীর-স্বাস্থ্যের সঙ্গে মিস্টার আবের কিছুটা মিল হয়তো আছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনিই কালো হাত।'

'যাই হোক, এই প্রথম কালো হাতকে সশরীরে দেখা গেল,' জিনা বলল।

'হ্যাঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মিস্টার ড্যানের বর্ণনা অনুযায়ী কালো হাত লম্বা, পাতলা একজন লোক। মিসেস সোয়ানসনের সঙ্গেও কিন্তু অনেকটাই মিলে যায়।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তালিকা থেকে আরেকজনকে বাদ দিয়ে দেয়া যায়। মিস্টার ভিক ড্যান। কারণ তিনি মোটা, খাটো।'

'দেয়া যেত,' বলল কিশোর, 'যদি প্রমাণ পেতাম তিনি সত্যি কথা বলছেন। কি করে শিওর হব তাঁর ওপর আদৌ হামলা হয়েছে কিনা? একমাত্র তিনিই কালো হাতকে দেখেছেন দাবি করছেন। যদি মিথ্যেই বলে থাকেন, লোকটার বর্ণনা যে তাঁর মনগড়া নয় সেটাই বা কি করে বুঝব?'

'তা-ও বটে,' মাথা দোলাল রবিন।

'তারমানে,' তিক্ত কণ্ঠে মুসা বলল, 'যে গোলক ধাঁধায় ছিলাম আমরা সেখানেই ঘুরে মরছি! দূর!' ধাঁধার জটিলতা বোঝাতেই যেন হাতের খালি বোতলটা ঠকাস করে কাউন্টারে নামিয়ে রেখে আরেকটা ড্রিংক দিতে ইশারা করল বারম্যানকে।

'তবে একটা কথা...'

কথাটা শেষ করতে পারল না কিশোর। চিৎকার করে উঠল বারম্যান, 'সর্বনাশ, রেড লাইট!' কাঁপা হাত তুলে দেখাল সে, তার পাশে দেয়ালে জ্বলছে-নিভছে একটা লাল আলো।

'খাইছে! মানে কি এর?' জানতে চাইল মুসা।

'অ্যালার্ম! সতর্ক সঙ্কেত! বোতাম টিপেছেন ম্যানেজার!' কথা আটকে যাচ্ছে বারম্যানের মুখে। ঢোক গিলল দুবার। 'সারা হোটেলেই ঘণ্টা বেজে ওঠার কথা! বাজছে না, তারমানে তার কেটে দেয়া হয়েছে!'*চোর, চোর, ডাকাত পড়েছে, ডাকাত!* বলে চিৎকার শুরু করল সে।

নয়

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে বারম্যান। আরেকটা বোতাম টিপে দিয়েছে। এটার তার কাটা হয়নি। ঝনঝন করে অ্যালার্ম বেল বাজতে শুরু করেছে সারা হোটেলে। মৌচাকে ঢিল পড়েছে যেন। চতুর্দিকে হই হই রব, চেঁচামেচি, ছোটাছুটির শব্দ। হোটেলের গেস্টরা, যাঁরা কিছুই বুঝতে পারছেন না, একে ওকে জিজ্ঞেস করছেন, কিন্তু কোন জবাব পাচ্ছেন না।

'পুলিশ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'এক্ষুণি পুলিশকে ফোন করা দরকার!'

পুলিশকে ফোন করতে গেল কে যেন। আসতে সময় লাগবে। তারা আসার আগেই জেনে গেল গোয়েন্দারা কি ঘটেছে। ম্যানেজারের অফিস কোথায় জিজ্ঞেস

করে জেনে নিল কিশোর। ছুটল সেদিকে। পেছনে তার দলবল। পথে দেখা হয়ে গেল মিস্টার বটব্যাল, মিস্টার আবে ও পিটারের সঙ্গে। তাঁরাও সেখানেই চলেছেন। আরেকটু এগোতে তাদের সঙ্গে যোগ দিল হোটেলের রিসিপশনিস্ট।

হাঁ হয়ে খুলে আছে অফিসের দরজা। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল বেহুঁশ হয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে আছেন ম্যানেজার আবদাল তারিক। রবিন আর জিনা গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তাঁর পাশে। রিসিপশনিস্ট ফোন করল ডাক্তারকে।

ম্যানেজারের হুঁশ ফেরানো হলো। কি হয়েছিল জানালেন তিনি। খাবার বিক্রি, ঘর ভাড়া, এসব বাবদ সেদিন যা আয় হয়েছে, সেই টাকার হিসেব মিলিয়ে, টাকা গুণে আলমারিতে তুলে রাখতে যাবেন, হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কেউ। বাড়ি মেরে তাঁকে বেহুঁশ করে ফেলল। জ্ঞান হারানোর আগে অ্যালার্ম বেলের বোতামটা কোনমতে টিপে দিতে পেরেছিলেন। বোতামটা তাঁর ডেস্কের নিচে লুকানো আছে।

আলমারি খালি। একটা টাকাও নেই। পড়ে আছে কালো হাতের একটা কার্ড। ডাকাতিটা যে করেছে গর্ব করে জানিয়ে গেছে আবার সেটা।

অবশেষে পুলিশ এল। তাদেরকে সব কথা জানালেন ম্যানেজার। ডাকাতের চেহারা দেখতে পাননি। মুখোশ পরা ছিল। লম্বা, হালকা-পাতলা শরীর, আরবী পোশাক পরে এসেছিল।

সঙ্গীদের একপাশে ডেকে নিয়ে গেল কিশোর। বলল, 'জটিল করে তুলেছে পরিস্থিতি। যাদেরকে সন্দেহ করি তাদের যে কেউ ঢোলা আলখেল্লা দিয়ে গা ঢেকে চলে আসতে পারে। নিচে কি পরেছে বোঝার জো থাকবে না।'

'লোকটা লম্বা, পাতলা,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'ভিক ড্যানের আরেকজন সমর্থক পাওয়া গেল। একই কথা বলেছেন দুজনে। এখন তাহলে তাঁর নাম কেটে দেয়া যায়।'

হাসি ফুটল জিনার মুখে। 'হ্যাঁ, আরেকজন কমল।'

তাদের কারও দিকে তাকাল না কিশোর, বিড়বিড় করল, *'হারাধনের দশটি ছেলের রইল বাকি সাত!'*

পরদিন সকালে হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের যাত্রীরা তিউনিসের বাজার দেখতে বেরোল। উঁচু উঁচু লম্বা ফুটপাত মত তৈরি করে তাতে পণ্য নিয়ে বসেছে অনেক দোকানি। নানা রকম জিনিস পাওয়া যায় সেখানে, বেশিরভাগই শস্তা জিনিস। টকারের কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে গম্বুজের মত চূড়াওয়ালা একটা খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ল নটি, দরজা টেনে দিল নিজে নিজেই। বানরটার কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করতে লাগল লোকে।

বাজারের মধ্যে এই ঘোরাঘুরি ভাল লাগছে না কিশোরের। তার মন জুড়ে রয়েছে কালো হাত। এমন সব সাংঘাতিক কাণ্ড করে চলেছে লোকটা, অথচ কেউ তার টিকির নাগালও পাচ্ছে না। পুলিশ না, মিস্টার বটব্যাল না, এমন কি ওরা নিজেরাও না।

'আমাদের কাজে কোথাও একটা ফাঁক রয়ে যাচ্ছে,' ভাবল সে। 'একজন একজন করে সন্দেহ থেকে বাদ দিচ্ছি আমরা, এটা খুব দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এভাবে হবে না। অন্য কিছু করতে হবে।'

তিউনিস দেখা শেষ হলে আবার জাহাজে চড়ল যাত্রীরা। গালফ অভ কোয়েবসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। শেষ বিকেলে সেখানে পৌঁছল জাহাজ। সন্ধেটা জাহাজেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল যাত্রীরা। ওদের সঙ্গেই চলেছে কালো হাত, এ ব্যাপারে এখন আর কারও কোন দ্বিমত নেই, সে কথা ভুলে থেকে যতটা সম্ভব আনন্দে কাটাতে চাইল তারা। আবহাওয়া ভাল, সুন্দর বাতাস, ডিনারের সময় চমৎকার বাজনা বাজতে লাগল।

খাওয়ার পর পরই ডেকে চলে এল গোয়েন্দারা। আকাশে অসংখ্য তারা। সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল কিশোর। অন্যেরা কথা শুরু করল। শুরুতেই আলোচনায় ঢুকে পড়ল কালো হাত।

'সন্দেহের তালিকায় এখনও রয়েছেন,' রবিন বলল, 'হুয়ান রডরেজ, মিস্টার আবে, জিউসেপ অ্যারিয়ানো, রিচার্ড হুফার, জিম মার্টিন ও মিস্টার সোয়ানসন।'

হাই তুলল টকার। 'অনেক তো ডাকাতি করল। ডাঙায় অনেক ছোটাছুটিও করল। আমার মনে হয় এবার একটু রেস্ট নেবে কালো হাত। জাহাজে আর কোন ঝুঁকি নেয়ার চেষ্টা করবে না…' হাই তুলল আবার। 'আমার ঘুম পাচ্ছে। জিনা, যাবে নাকি?'

'এত সকালে গিয়ে কি করব? শুতে ইচ্ছে করছে না।'

'চলো, পিটারের সঙ্গে কথা বলিগে,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'কাল আবার ম্যাজিক দেখানোর কথা। নতুন কিছু করছে কিনা দেখিগে চলো।'

'কি আর দেখব?' কিশোরের যেতে ইচ্ছে করছে না।

'এখানে বসে থেকেই বা কি করব?'

রবিন বলল, 'চলো, যাই। আসলেই এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না।'

'কিছুই করার নেই কথাটা ঠিক না,' কিশোর বলল। 'কালো হাতকে ধরতে পারিনি আমরা এখনও। সন্দেহভাজনদের ওপর নজর রাখতে পারি ইচ্ছে করলে। স্মোকিং রুমে দাবা খেলছেন রডরেজ আর ডিক ড্যান। আপাতত উঠবেন বলে মনে হয় না। অন্যদের ওপর…'

'সোয়ানসনরা স্যালুনে কেরিআন্টির সঙ্গে কথা বলছেন,' টকার জানাল।

'ভাল তো, আমাদের লোক কমে গেল। বাকি যাঁরা আছেন তাঁদের ওপর নজর রাখার সুবিধে হয়ে গেল। মিস্টার আবে, রিচার্ড হুফার, জিম মার্টিন আর জিউসেপ অ্যারিয়ানো। তবে টকারের সঙ্গে আমি একমত, আজ আর কিছু করার চেষ্টা করবে না কালো হাত।'

'তাহলে আর নজর রেখেই কি হবে?' মুসা বলল, 'তার চেয়ে ওই যে বললাম, চলো পিটারের সঙ্গেই বসে আলাপ করিগে।'

উসখুস করল কিশোর। গাল চুলকাল। বলল, 'বেশ। তবে বেশিক্ষণ বসব না,

আগেই বলে দিচ্ছি। বেরিয়ে এসে সন্দেহভাজনরা কে কি করছেন দেখব একবার।'

তাতে আপত্তি করল না কেউ।

ডেক থেকে নেমে এসে পিটারের কেবিনের দিকে চলল ওরা। গ্যাঙওয়েতে পুরু করে পাতা কার্পেট, পায়ের আওয়াজ ঢেকে দিচ্ছে। আগে আগে চলেছে টকার। একটা মোড় ঘুরেই যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'ভিক ড্যানের ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে একটা লোক!'

চুপ হয়ে গেছে সবাই। গ্যাঙওয়ের মৃদু আলোয় দেখল, দরজার সামনে ঝুঁকে তালা খোলার চেষ্টা করছে একটা লোক। লম্বা, পাতলা শরীর। গাঢ় রঙের স্যুট পরনে। মুখে মুখোশ।

ওকে ধরা দরকার। সে, মুসা আর রবিন মিলে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লোকটার ওপর, ভাবল কিশোর।

কিন্তু সব নষ্ট করে দিল নটি। কিঁচকিঁচ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল।

ঝট করে সোজা হয়ে ফিরে তাকাল লোকটা। মুখোশের ফুটো দিয়ে তার চোখ দেখা গেল, ম্লান আলোতেও ঝিক করে উঠল চোখের তারা। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ওভাবে, তারপরই ঘুরে দৌড় দিল উল্টোদিকে। হই হই করে তার পেছনে ছুটল গোয়েন্দারা।

সবার আগে রয়েছে মুসা। তার পেছনে কিশোর, তার পেছনে রবিন এবং অন্যেরা। তবে কয়েক পা এগিয়েই সবাইকে ছাড়িয়ে চলে গেল রাফি। ঘেউ ঘেউ করতে করতে তাড়া করল লোকটাকে।

'আর পালাতে পারবে না,' জিনা বলল। 'রাফি ওকে ধরে ফেলবেই!'

শেষ মাথায় আরেকটা রাস্তা গ্যাঙওয়েকে ভেদ করে আড়াআড়ি চলে গেছে। ওখানে এসে লোকটাকে দেখা গেল না। নিশ্চয় কোন একটা পথ ধরে গেছে। কিন্তু কোনটা?

কুকুরটাকেও দেখা যাচ্ছে না।

'রাফি!' চিৎকার করে ডাকল জিনা। 'কোথায় তুই?'

ডান দিক থেকে এল জবাব।

ছুটল ওরা সেদিকে।

কিন্তু কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল পিটার আসছে এদিকেই। লেজ নাড়তে নাড়তে খুশি মনে তার সঙ্গে আসছে রাফি।

'খাইছে!' দারুণ হতাশ হয়েছে মুসা, 'এটা কি হলো!'

'আমিও তো সে কথাই জানতে চাই,' পিটার বলল। 'কি হয়েছে? এত চেঁচামেচি করছ কেন? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ?'

কি হয়েছে জানাল মুসা।

শুনে পিটারও অবাক। কুঁচকে গেল ভুরু। বলল, 'তাই নাকি! আমি তো একটা গাধা! সব ভজঘট করে দিলাম! ঘর থেকে সবে বেরোচ্ছি, দেখি তীরের মত ছুটে যাচ্ছে রাফি। আমার গায়ের ওপরই গিয়ে পড়ল। ভাবলাম, জাহাজের বেড়ালগুলোকে তাড়া করেছে. বেড়ালের তো আর অভাব নাই। ধরে ফেললাম ওকে।

এখন তো বুঝতে পারছি অন্যায় করেছি।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'এখন আর ওসব ভেবে লাভ কি? যে চালাকের চালাক লোকটা, এতক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে!'

'তবু চেষ্টা করতে দোষ কি?' সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে বলে যেন লজ্জাই পাচ্ছে পিটার। 'চলো একবার খুঁজে দেখি। তোমরা ওদিকে যাও, আমি এদিকে। দেখাই যাক না কোন সূত্রটুত্র ফেলে গেল কিনা ব্যাটা।'

কিশোরের খুব একটা আগ্রহ নেই। তবু গ্যাঙওয়েতে ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ। জানত কিছু পাবে না, পেলও না।

'ভিক ড্যানের ঘরের তালা খোলার চেষ্টা করেছে, সত্যিই দেখেছ?' পিটার জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল টকার।

'চলো তো, দেখি।'

আঁচড় লেগে আছে তালার গায়ে। কেউ যে খোলার চেষ্টা করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'ক্যাপ্টেনকে জানানো দরকার,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। 'মিস্টার ড্যানকেও বলতে হবে।'

মিস্টার রডরেজের সঙ্গে তখনও গভীর মনোযোগে দাবা খেলছেন ভিক ড্যান। জানা গেল, ডিনারের পর সেই যে এসে বসেছেন দুজনে, একটা মিনিটের জন্যেও উঠে যাননি কোথাও। কাজেই নির্দ্বিধায় আরও একটা নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল রবিন। হুয়ান রডরেজের নাম।

আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকল স্যালুনে। না, সোয়ানসনরা আছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কথা বলছেন মিসেস পারকারের সঙ্গে। কিশোরকে ওভাবে ঢুকতে দেখে অবাক হলেন জিনার আম্মা। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালেন।

ইশারা করল তাঁকে কিশোর।

সোয়ানসন দম্পতিকে 'এক্সকিউজ মী' বলে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন কিশোরের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'আস্তে বলবেন, প্লীজ! একটু আগে মিস্টার ড্যানের তালা ভাঙার চেষ্টা করেছে কেউ। সোয়ানসনরা কি এতক্ষণ আপনার সঙ্গেই ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'একবারের জন্যেও উঠে যায়নি?'

'এক সেকেণ্ডের জন্যেও না। ডিনারের পর এসে বসেছে আমার সঙ্গে, তখন থেকেই গল্প করছি আমরা।'

'গুড। থ্যাংক ইউ,' বলে ঘুরে দৌড় দিল আবার কিশোর। ফিরে তাকালে দেখতে পেত অবাক হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন কেরিআন্টি, মাথা নাড়ছেন আনমনে।

বন্ধুদের কাছে চলে এল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জেনে এলাম।

সোয়ানসনরা ওখানেই আছেন, বেরোননি একবারও

'তার মানে আরও দুজন বাদ,' রবিন বলল।

'সন্দেহের তালিকায় আর কজন আছে?' জানতে চাইল পিটার।

'মাত্র চারজন,' লিস্টের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন। 'জিউসেপ অ্যারিয়ানো, রিচার্ড হুকার, জিম ক্যাম্পার ও মিস্টার আবে।'

'খুব ভাল!' হাসল পিটার, 'অনেক কমে এসেছে। সুবিধে হয়েছে আমাদের। আমরা এখন দলে ভারি। আমরা ছয়, ওরা চার। নজর রাখা পানির মত সহজ এখন। আরও দুজোড়া চোখকে বাদই দিলাম, মিস্টার বটব্যাল, এবং রাফি।'

ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। কথাই বলছে না। ব্যাপারটা মুসা আর রবিনের চোখ এড়াল না। জিজ্ঞেসই করে ফেলল মুসা, 'কি ব্যাপার, অমন চুপ হয়ে গেলে কেন?'

জবাব দিল না কিশোর।

পিটার বলল, 'তুমি কিছুই বলছ না; ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'ব্যাপার কি ভাল করেই জানেন আপনি!' বলেই বোধহয় মনে হলো কিশোরের, এত রুক্ষ ভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। বলল, 'রাগ লাগছে। বার বার আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে লোকটা, আমরা কিছুই করতে পারছি না। মনে মনে হাসাহাসি করছে আমাদের নিয়ে। আর আজকের ব্যাপারটা রীতিমত একটা দুর্ভাগ্য। হাতে পেয়েও ধরতে পারলাম না, পালাল।'

'পালিয়ে যাবে কোথায়?' কিশোরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই যেন হেসে বলল পিটার। 'ধরা পড়তেই হবে। তোমাদের মত গোয়েন্দা…'

'গোলমালটা আসলে নটিই করেছে,' হাসল কিশোর। ওভাবে কথা বলেছে বলে লজ্জাই পাচ্ছে যেন এখন। 'ও চেঁচিয়ে না উঠলে কালো হাতের আজ আর বাঁচতে হত না। যাকগে যা হবার হয়েছে। সুযোগ আরও আসবে।'

'হ্যাঁ, আমিও সেই কথাই বলি। অযথা মন খারাপ করছ।'

দশ

মিস্টার বটব্যাল চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। কিন্তু এগোতে পারছেন না একটুও। ভিক ড্যানের কেবিনে যে চুরির চেষ্টা হয়েছিল, বেশিরভাগ যাত্রীই সেটা জানল না। সুতরাং কোন রকম হই চই হলো না জাহাজে।

পরদিন সকালে ভাল মেজাজ নিয়ে তীরে নামল যাত্রীরা। একটা মরূদ্যান দেখতে যাবে।

খুব মনোরম একটা জায়গা। প্রচুর ডালিম গাছ জন্মে আছে। সবুজ পাতার মধ্যে লাল লাল ফুল। পাথরের একটা ছোট ডোবায় অনেক ওপর থেকে ঝরে পড়ছে ঝর্নার পানি। ওখানে ডোবাডুবি করছে কিছু আরব বালক। একটা খেলা পেয়ে গেছে ট্যুরিস্টরা। পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে পানিতে, ডুব দিয়ে সেগুলো তুলে আনছে ছেলেগুলো।

দেখার জন্যে হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের অনেক যাত্রীই ভিড় করে এসেছে। হঠাৎ

চিৎকার করে উঠল এক মহিলা, 'চোর, চোর! আমার ব্যাগ নিয়ে গেল!'

ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর। দেখল আরবী পোশাক পরা হালকা-পাতলা একজন মুখোশ পরা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। 'কালো হাত, কালো হাত!' বলে সে-ও চেঁচিয়ে উঠল। 'জলদি ধরো ওকে! এবার আর পালাতে দেয়া হবে না! এই রাফি, ধর ধর!'

নটি কি বুঝল কে জানে, টকারের কাঁধ থেকে একলাফে গিয়ে পড়ল রাফির কাঁধে। কান চেপে ধরে বসল। পরমুহূর্তেই ছুটতে শুরু করল কুকুরটা।

খোলা জায়গায় কত জোরে আর দৌড়াবে চোরটা? কয়েক লাফেই তাকে ধরে ফেলল রাফি। পিঠের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ব্যাগ খসে পড়ল লোকটার হাত থেকে। নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ছাড়ল না ওকে রাফি, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল চোরটাকে নিয়ে। নটিও বসে নেই। থাবা দিয়ে লোকটার পাগড়ি খুলে দিয়ে চুল খামচে ধরে টানতে লাগল।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল চোরটা। আরবীতে কি কি সব বলতে লাগল কিছু বোঝা গেল না।

'খাইছে!' তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা। 'কালো হাত যে অ্যারাবিয়ান কল্পনাই করতে পারিনি! আরবী বলছে! ইংরেজিও তো জানে না!'

অনেকেই দৌড়ে এসে ঘিরে ফেলল চোরটাকে। বুকের ওপর চেপে আছে রাফি। তাকে ওভাবেই থাকতে বলল জিনা।

চোরটার পাশে বসে পড়ল মুসা, 'হ্যাঁ, এইবার মুখোশটা সরাও তো দেখি বাপধন। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছ। আর একটা শয়তানী করেছ কি পিটিয়ে ভর্তা বানাব।'

তার ইংরেজি মনে হলো বুঝল না লোকটা। তেমনি পড়ে রইল।

রেগেমেগে টান দিয়ে শেষে তার মুখোশ খুলে নিল মুসা।

সাংঘাতিক উত্তেজনার একটা মুহূর্ত। চোখ গরম করে সবার দিকে তাকাচ্ছে লোকটা। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের যাত্রীদের অপরিচিত। এই তাহলে কালো মুখোশ! এত যন্ত্রণা দিয়েছে তাদেরকে!

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল কিশোর, 'এই লোক কালো মুখোশ নয়!'

স্থানীয় সাধারণ একটা ছিঁচকে চোরকে ধরেছে ওরা।

রবিন, মুসা, জিনা আর টকারেরও মন খারাপ হয়ে গেল। কালো মুখোশকে ধরতে পেরেছে বলে কি খুশিটাই না হয়েছিল ওরা। ভেবেছিল একটা ঝামেলা গেছে। যায়নি, সেই আগের মতই রয়েছে।

জাহাজে ফিরে চলল ওরা।

গালফ অভ কোয়েবসে নোঙর বাঁধা রয়েছে এখনও হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। দুপুরের পর থেকে এত গরম পড়ছে, জাহাজে যারা ছিল তারা বাইরে বেরোনোর আশা বাদ দিয়ে কেবিনেই শুয়ে পড়েছে। এত গরমে দুই প্রফেসরকে কাজ করতে দেননি কেরিআন্টি। বাংকে শুয়ে ঘুমাতে বাধ্য করেছেন।

মরুদ্যান দেখা শেষ করে জাহাজে ফিরেই তার কেবিনের দিকে চলে গেল পিটার। কিন্তু বদ্ধ ঘরে আটকে থাকার কথা ভাবতেই ভাল লাগছে না ছেলেমেয়েদের। কিন্তু কি আর করা, রোদের মধ্যে তো আর ঘোরাফেরা করা যাবে না।

'এক কাজ করা যায়। স্ক্র্যাবল খেলতে পারি,' রবিন বলল।

'মন্দ বলোনি,' এই খেলাটা কিশোরেরও পছন্দ। 'তোমরা যাও, আমি বোর্ড নিয়ে আসি। এই রাফি, যাবি নাকি, আয়।'

ভয়াবহ গরম। ডেক থেকে গ্যাঙওয়েতে নেমে আরামের নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বাইরের উজ্জ্বল আলো থেকে আবছা অন্ধকারে নেমে প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না তার। আস্তে আস্তে সয়ে এল অন্ধকার। সামনে সাদামত কি যেন চোখে পড়ল। ও, সাদা কোট পরা একজন স্টুয়ার্ড, ভিক ড্যানের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে।

নাক ডাকার শব্দ আসছে কেবিন থেকে, মনে হচ্ছে গর্জন করছে কোন ক্রুদ্ধ জানোয়ার। ঘুমাচ্ছেন ড্যান। মুচকি হাসল কিশোর। দরজাটা আস্তে করে ভেজিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল স্টুয়ার্ড।

হঠাৎ হাসি মুছে গেল কিশোরের। চকিতে বুঝে ফেলেছে ঘটনাটা কি ঘটেছে। এতই সাধারণ আর স্বাভাবিক ভাবে ঘটেছে, শুরুতে সে-ও ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে স্টুয়ার্ডকে কোন প্রয়োজন নেই ভিক ড্যানের, কারণ তিনি ঘুমাচ্ছেন।

'এই এই, শুনুন!' বলতে বলতে স্টুয়ার্ডের পেছনে দৌড় দিল কিশোর।

কিন্তু থামল না লোকটা। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরেও তাকাল না। বরং দৌড়াতে শুরু করল। হারিয়ে গেল গ্যাঙওয়ের মোড়ে।

'চোর, চোর!' বলে চিৎকার শুরু করল কিশোর। 'এই রাফি, ধর ব্যাটাকে!'

দেখতে দেখতে তার চারপাশে সাড়া পড়ে গেল। ঝটকা দিয়ে খুলে যেতে শুরু করল কেবিনের দরজা। বেরিয়ে এল অনেকে। ততক্ষণে মোড়ের কাছে পৌঁছে গেছে রাফি আর কিশোর। প্যাসেজের শেষ মাথায় দেখতে পেল লোকটাকে।

'ধর, রাফি!' আবার চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

চেঁচামেচি করে যে কি ভুলটা করেছে বুঝতে পারল এতক্ষণে। এদিক ওদিক থেকে লোক বেরিয়ে আসছে সরু গ্যাঙওয়েতে। রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল তারা। না পারল সে দৌড়াতে, না রাফি। কি হয়েছে কি হয়েছে বলে হট্টগোল শুরু করল লোকগুলো। তাদের মধ্যে সাদা কোট পরা স্টুয়ার্ডও রয়েছে দু-তিনজন।

নিজের কপালেই চাপড় মারতে ইচ্ছে করল কিশোরের। চোরটারও ভাগ্য ভাল, আর তাদেরও কিছুটা বোকামি রয়েছে।

আবার পালাল কালো হাত!

ফিরে এল রাফি। মুখে করে নিয়ে এসেছে একটা সাদা দস্তানা। খুশিমনে সেটা কিশোরের হাতে তুলে দিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

'বাহ্,' তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন, ভাবছে, 'দস্তানা পরে এসেছিল তাহলে! তার মানে আঙুলের ছাপও ফেলে যায়নি।'

'কি হয়েছে? ব্যাপার কি?' প্রশ্নবাণ চলছে চারপাশ থেকে।

কিশোরকে জবাব দিতে হলো না। ভিক ড্যানের চিৎকার শোনা গেল। সেদিকে দৌড় দিল কিশোর। গিয়ে দেখে খেপার মত হাত নাড়ছেন হীরক-ব্যবসায়ী। লাফালাফি করছেন।

'নিয়ে গেছে, সব নিয়ে গেছে আমার!' চেঁচাতে লাগলেন তিনি। 'আমার অনেকগুলো হীরা ছিল, চুনি ছিল, নিয়ে গেছে! ইস্, কেন যে জাহাজের সেফে রাখলাম না! রাখতে তো বলাই হয়েছিল আমাকে। ভেবেছি, নিজের কাছে রাখাই নিরাপদ। গেল এখন।'

'কোথায় রেখেছিলেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'একটা ক্যানভাসের বেল্টের মধ্যে ভরে সব সময় কোমরে বেঁধে রাখতাম। আজ গরমের জ্বালায় গায়ে রাখতে না পেরে খুলে রেখে ঘুমিয়েছিলাম একটু। এই সুযোগে দিয়ে গেল সর্বনাশ করে! এই যে, তার কার্ড!'

ঘরে তল্লাশি চালালেন মিস্টার বটব্যাল। কোন সূত্রই পেলেন না। দস্তানাটা তাঁর হাতে দিয়ে জানাল কিশোর, কোথায় পেয়েছে।

'এতে কি কাজ হবে বুঝতে পারছি না,' আনমনে বিড়বিড় করলেন বটব্যাল। 'সূত্র হতেও পারে, না-ও পারে।'

'চোরের জিনিস না হলে এটা কিছুতেই তুলে আনত না রাফি,' কিশোর বলল।

'দস্তানা?' পেছন থেকে বলে উঠল পিটার। 'দেখি তো?' কেবিনে ঢুকেছে সে। তার পেছনে মুসা, রবিন, জিনা আর টকার।

দস্তানাটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে পিটার বলল, 'হুঁ, স্টুয়ার্ডদের জিনিস। মনে হচ্ছে পুরো ইউনিফর্মই পরে এসেছিল লোকটা। এই সামান্য সূত্র দিয়ে তাকে ধরাটা সহজ হবে না।'

খবর পেয়ে মিস্টার টারময়েলও এসে হাজির হলেন। দস্তানাটা ভাল করে দেখে বললেন, 'না, এটা স্টুয়ার্ডদের নয়, অনেক ভাল জিনিস। দেখুন,' বটব্যালের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন তিনি, 'ভাল করে দেখুন। এরকম জিনিস আমি স্টুয়ার্ডদেরকে সাপ্লাই করিনি। করলে নিশ্চয় চিনতাম।'

আরেকবার যাত্রীদের কেবিন আর মালপত্র সব ঘাঁটাঘাঁটি করা হলো। রেগে আগুন হয়ে গেলেন মিসেস রোজ। হুমকি দিতে লাগলেন জাহাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে দেবেন তিনি। তাঁকে শান্ত করার মত কথা খুঁজে পেলেন না ক্যাপ্টেন। কি বলবেন? তিনি নিজেই ভীষণ লজ্জিত। যাত্রীদেরকে এভাবে দাওয়াত দিয়ে এনে হয়রান করতে কারোই বা ভাল লাগে।

গরম গরম কথা চলছে, এর মাঝে আচমকা এসে পড়ল নটি। হাতে মলাটের একটা ছোট বাক্স। কিচিরমিচির করতে লাগল।

'তুই আবার কোত্থেকে আনলি?' হাত বাড়াল টকার, 'দেখি, দে, কি আছে দেখি?'

বাক্সটা খুলেই চিৎকার করে উঠল সে, 'আরি, ভিজিটিং কার্ড! কালো হাতের!'

স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই।

'কোথায় পেল? পেল কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠলেন বটব্যাল।

বানরটাকেই জিজ্ঞেস করুন। সবাইকেই তো ধরে ধরে খালি জিজ্ঞাসাবাদই করেন, নটিকেও করুন, বলতে ইচ্ছে করল মুসার, কিন্তু করল না।

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দুবার চিমটি কাটল কিশোর। টকারকে বলল, 'এক কাজ করো। বাক্সটা আবার দাও নটির হাতে। যেখান থেকে এনেছে সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখতে বলো। যদি বোঝাতে পারো, একটা কাজ হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' বুদ্ধিটা টারময়েলেরও পছন্দ হলো। 'নিয়ে গিয়ে যদি ঠিক জায়গায় রাখতে পারে, বোঝা যাবে কোথায় আছে চোরটা।'

বিচিত্র একটা মিছিল চলল বানরটার পিছু পিছু।

গ্যাঙওয়ে ধরে চলেছে নটি। তাতে বাক্স। পেছনে তিন গোয়েন্দা, টকার, জিনা, রাফি, পিটার, মিস্টার বটব্যাল, মিস্টার টারময়েল আর অবশ্যই ক্যাপ্টেন।

সোজা একটা কেবিনে গিয়ে ঢুকল নটি। একটা খোলা ড্রয়ারে বাক্সটা রেখে ফিরে তাকাল খুশি মনে। তার ধারণা হলো, এই কাজের জন্যে বাহবা পাবে, আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে তার মনিব।

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা। ওটা জিউসেপ অ্যারিয়ানোর কেবিন। জিজ্ঞেস করতে তো রেগেই উঠলেন পিয়ানোবাদক, 'একটা বানর এসে কি করল না করল তাতেই আমাকে প্রশ্ন করতে এসেছেন! আপনাদের বিরুদ্ধে কেস করব আমি! পয়সা দিয়ে জাহাজে উঠে এত হেনস্তা!'

'কিন্তু কার্ডটা তো আপনার ঘরের ড্রয়ারেই এনে রাখল···'

'তাতে কি? তাতে কি! ওটা তো একটা চোর! একখান থেকে জিনিস এনে আরেকখানে রাখে!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন শান্তশিষ্ট মানুষটা। 'আপনার পকেটেও তো কার্ড ঢুকিয়ে দিয়েছিল! তাতে কি আপনি কালো হাত হয়ে গেছেন?'

কি জবাব দেবেন ক্যাপ্টেন? সবাইকে নিয়ে মাথা নত করে বেরিয়ে এলেন।

আবার রওনা হলো জাহাজ। এরপর নোঙর ফেলবে সিসিলির সিরাকাস বন্দরে।

দ্বীপটার দিকে এগিয়ে চলেছে হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। ওপরের ডেকে লাইফবোটটার কাছে এসে বসেছে তিন গোয়েন্দা, জিনা, টকার ও পিটার। জায়গাটাকে ওদের হেডকোয়ার্টার বানিয়ে ফেলেছে।

'পুরো ব্যাপারটা ভাল করে একবার খতিয়ে দেখা দরকার,' জিনা বলল। 'কতটা এগিয়েছি আমরা বুঝতে হবে। উপায় একটা বেরিয়েও যেতে পারে।'

'শুরু করো তাহলে,' কিশোর বলল। 'রবিন, তোমার লিস্টটা বের করো তো।'

নোটবুক বের করল রবিন। শুধু যে লোকের নাম লিস্ট করেছে তা-ই নয়, কিছু কিছু নোটও লিখে রেখেছে। শুরু থেকে যত জিনিস চুরি হয়েছে, যত ঘটনা ঘটেছে সব লিখে রেখেছে।

'আমরা যে লোকটার পেছনে এভাবে লেগেছি, আহা, যদি জানত,' হেসে

বলল মুসা, 'তাহলে অতটা দুঃসাহস দেখাতে পারত না।'

'তা বটে,' মাথা দোলাল জিনা।

'কেন, তিন গোয়েন্দাকে কি চেনে নাকি?' হাসল রবিন।

'চিনলে,' টকার বলল, 'সত্যি, অতটা দুঃসাহস দেখাত না। পুলিশের বাঘা বাঘা গোয়েন্দা যে সব রহস্যের সমাধান করতে পারেনি সেগুলো করে বসে আছো তোমরা। যে অপরাধী তোমাদের ভয় পাবে না, সে বোকা।'

'তাই নাকি?' পিটার বলল, 'তিন গোয়েন্দার এতটাই ক্ষমতা?'

'নিশ্চয়ই। কিশোর পাশাকে আপনি চেনেন না…'

'হয়েছে হয়েছে, থামো,' হাত নেড়ে টকারকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'আসল কথাই বাদ পড়ে যাচ্ছে। তিন গোয়েন্দার গুণগান পরে করলেও চলবে। আপাতত কালো হাতকে ধরার ব্যবস্থা করা দরকার। রবিন, শুরু করো।'

নোটবুক দেখে বলতে লাগল রবিন, 'যাদের কাছ থেকে চুরি করেছে কালো হাত তাদের নাম…' মুখ তুলল সে, 'মিস টিটাংকেও ধরব?'

'ধরো।'

'বেশ। মিস টিটাং, মিসেস সোয়ানসন, হুয়ান রডরেজ, ডিক ড্যান, তিউনিসের হোটেল ম্যানেজার আবদাল তারিক, এবং সব শেষে আরেক বার ডিক ড্যান। এই লোকটারই সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে চোরটা। সন্দেহের তালিকায় ছিল, তারপর কেটে দিয়েছি যাদের নাম তারা হলেন মিস টিটাং, হুয়ান রডরেজ, ডিক ড্যান, মিসেস রোজ ও মিসেস সোয়ানসন।'

'তার মানে,' আঙুলে গুণে গুণে বলল পিটার, 'জিউসেপ অ্যারিয়ানো, মিস্টার আবে, জিম ক্যাম্পার ও রিচার্ড হুফার, এই চারজনেরই কেউ কালো হাত?'

রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টকার। হুফার আর তাঁর সেক্রেটারিকে চোখে পড়ল। ফিরে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আমার বিশ্বাস, ওই দুজনই যত নষ্টের মূল। একজন পঙ্গু হয়ে হুইলচেয়ারে বসে থাকে, আরেকজন ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। অদ্ভুত একটা জোড়া।'

এগারো

সিরাকাসে পৌঁছল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। জাহাজ থেকে দেখেই জায়গাটা ভারি পছন্দ হয়ে গেল সবার। ওখানে কয়েকদিন থাকবে জাহাজ। দেশের ভেতরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে যাত্রীদেরকে। কিন্তু গরম এতই বেশি, সুযোগটা কাজে লাগানো বোধহয় কঠিন হবে। রোদের মধ্যে বাইরে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে জাহাজের আরামদায়ক কেবিনে থাকাটা অনেক আরামের। তবে যারা বেরোতে চায় না তাদের সংখ্যা খুবই কম। চায় যারা তারাই দলে ভারি।

ডিক ড্যানের হীরা লুট করার পর আর কিছু করেনি কালো হাত। মনে হচ্ছে, আপাতত আর কিছু করবে না। কারণ কদিনে লুটপাট যা করেছে তাতে অনেক টাকা হয়ে গেছে। এর পরেও যদি করে, তাহলে ধরে নিতে হবে চুরি করাটা লোকটার নেশা। যাই হোক, কালো হাতের নীরবতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল

যাত্রীরা। সিরাকাসে ভালই কাটল দিন।

তারপর যেদিন সিসিলি ছাড়ার দিন এল, সেদিন বিকেলে ঘটল একটা ঘটনা।

সেদিন বিকেলে একা একাই শহরে বেরিয়েছে ছেলেমেয়েরা। সিরাকাসের পথে পথে ঘুরছে। অনেক দোকানপাট। বিচিত্র দৃশ্য। একেবারে আধুনিক দোকানের পাশেই হয়তো দেখা গেল পুরানো আমলের দোকান। যেন সাংঘাতিক দুঃসাহস নিয়ে মোকাবেলা করছে আধুনিকতার। পুরানো রঙ, পুরানো সজ্জা নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করছে আধুনিক পৃথিবীতে।

অনেক সুন্দর সুন্দর স্কার্ফ আছে। কেনার জন্যে পছন্দ করছে জিনা। এই সময় বলে উঠল কিশোর, 'দেখো, লোকটাকে?'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'জিউসেপ অ্যারিয়ানো! বেরোনোর তো কথা না। ঘুমাবে না বলল?'

'আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?' রবিন বলল, 'দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছে। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা নাকি? অমন করছে কেন?'

'ভয় করছে নাকি কোন কিছুর?' টকারের প্রশ্ন। 'চোর চোর একটা ভাব না?'

'চলো পিছু নিই,' কিশোর বলল। 'দেখি কোথায় যায়? রাফি, যা-ই ঘটুক, খবরদার কোন শব্দ করবি না।'

কিছুটা দূরত্ব রেখে পিয়ানোবাদককে অনুসরণ করে চলল গোয়েন্দারা।

'হাতে একটা পার্সেলও তো দেখা যাচ্ছে,' জিনা বলল। 'পোস্ট অফিসে নিয়ে যাচ্ছে নাকি?'

'গেলেই বুঝব...'

মুসাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই টকার বলল, 'ওই প্যাকেটে কি আছে না দেখেই বলে দিতে পারি। মিস্টার রডরেজের চুনি বসানো আঙটি, ভিক ড্যানের হীরা, দুজনের মানিব্যাগ, মিসেস সোয়ানসনের হার, মিস টিটাঙের ব্রোচ...তার মানে এই লোকই কালো হাত।'

'ধরতে পারলেই বুঝব,' মুসা বলল।

'ধরে ফেললেই হয়। গিয়ে জিজ্ঞেস করি, প্যাকেটে কি আছে? আমাদের সামনে খুলুন। না খুলে কি পারবে?'

'ওরকম করে বলার কোন অধিকার নেই আমাদের,' জিনা বলল। 'ধরে চড় মেরে দিলেও কিছু করতে পারব না।'

চুপ হয়ে গেল টকার। ঠিকই বলেছে জিনা।

দ্রুত হাঁটছে কিশোর। মাথায় চিন্তার ঝড়। প্যাকেটটাতে কি আছে জানার জন্যে ব্যাকুল। খুলে দেখার একটা উপায় খুঁজছে। কি আছে ওর মধ্যে? কোথায় পাঠাবে?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। 'বুদ্ধি একটা পেয়েছি!'

'কী?' জানার জন্যে তর সইছে না মুসার। 'জলদি বলো। আরে বলো না, চলে গেল তো!' পোস্ট অফিস বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে যাচ্ছেন অ্যারিয়ানো।

'না যাবে না। এসো আমার সঙ্গে।'

তাড়াতাড়ি একটা কাফেতে এসে ঢুকল কিশোর। পাবলিক টেলিফোন আছে ওখানে।

'এখানেই থাকো তোমরা। ইচ্ছে হলে বসে বসে কিছু খেতেও পারো। আমি আসছি। মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না।'

কিন্তু মিনিটখানেকের অনেক বেশিই লেগে গেল। খুশি খুশি লাগছে কিশোরকে।

'সেরে এসেছি,' বলল সে। 'যে কোন মুহূর্তে জেনে যাব প্যাকেটটার মধ্যে কি আছে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল সবাই তার মুখের দিকে।

'তোমার এই নাটক করার স্বভাবটা আর যাবে না কোনদিন!' কপাল চাপড়ে বলল মুসা। 'মানুষকে ঝুলিয়ে রেখে কি মজা পাও?'

'আসলে তোমাদের ধৈর্য একেবারেই নেই…'

'অত ধৈর্যের ধার ধারি না!' রেগে গেল জিনা। 'হয় বলো, নয়ত গেলাম! তোমার সঙ্গে থাকারই আমাদের দরকার নেই!'

'আহ্‌হা, অত রাগ করছ কেন,' হাসল কিশোর। 'উঠো না, বলছি বলছি। পুলিশকে ফোন করেছিলাম। বললাম, একজন লোক একটা বোমা নিয়ে ঢুকেছে পোস্ট অফিসে। সন্ত্রাসী। লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললাম তার হাতের প্যাকেটে বোমাটা আছে। এতক্ষণে নিশ্চয় রওনা হয়ে গেছে পুলিশ।'

হো হো করে হেসে উঠল মুসা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে লাগল ওয়েইটার।

জিনা বলল, 'নাহ্, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান! এত উপস্থিত বুদ্ধি আমি আর কারও দেখিনি…'

'আসল ব্যাপারটা দেখো,' জানালার দিকে ইঙ্গিত করল কিশোর।

'কি দেখব?' টকারের প্রশ্ন।

'অ্যারিয়ানো বেরোয় কিনা।'

'বেরোলে কি হবে? হাতের প্যাকেটে কি আছে সেটা তো পুলিশ জানবে,' টকার এখনও বুঝতে পারছে না, 'আমরা জানব কিভাবে?'

'দেখোই না কিভাবে জানো?'

জানালা দিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। অ্যারিয়ানো আর বেরোয় না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে সঙ্গীদেরকে বসতে বলে আবার উঠে গেল কিশোর। পোস্ট অফিসে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, প্যাকেটের মধ্যে বোমাটা পাওয়া গেছে কিনা।

রেগে গিয়ে একটা কণ্ঠ জানাল, বোমাটোমা কিছু নেই। ওতে আছে কয়েকটা বই, সিসিলির ইতিহাস। একজন বন্ধুকে পাঠাচ্ছেন মিস্টার অ্যারিয়ানো। কে ফোন করেছে জানতে চাইল কণ্ঠটা।

লাইন কেটে দিল কিশোর। প্যাকেটটায় তাহলে চোরাই মাল নেই।

আগের জায়গায় ফিরে আসতেই রবিন জানাল, 'এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন অ্যারিয়ানো। খুব চটেছেন বোঝা গেল।'

'চটবেই,' হেসে বলল কিশোর। 'অহেতুক ওরকম হেনস্তা হতে হলে তুমিও চটতে।' প্যাকেটে কি আছে জানাল সে।

হতাশ হলো জিনা। 'তার মানে আবার আগের অবস্থা...'

'বোকামিটা তো আমরাই করেছি,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'দামী হীরা-জহরত ওভাবে পার্সেল করে পাঠায় না কেউ। সন্দেহ হলেই খুলে দেখতে পারে কাস্টমসের লোক। জিনিসগুলো তখন যাবে। কালো হাতের মত চালাক একজন লোক এই বোকামিটা করতে যে যাবে না এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল আমাদের। ভাবলে অহেতুক এই ঝামেলাটা আর করতে হত না।'

'করলে করেছি,' টকার বলল, 'আমার ভালই লেগেছে।'

'চলো, যাই।'

হোয়াইট অ্যাঞ্জেলে ফিরে দেখা গেল মহা হুলস্থুল কাণ্ড। আবার আঘাত হেনেছে কালো হাত। *এবার মিসেস রোজকে কৃপা করেছে সে,* জানাল একজন স্টুয়ার্ড। একনাগাড়ে অভিযোগ করে চলেছেন মহিলা। এবং এই একবার তাঁকে দোষ দিতে পারল না জিনা। হীরা, চুনি, দুই রকমের নীলা, দুই রকমের পান্না, ও পোখরাজ বসানো সাতটা দামী আংটি ছিল তাঁর, সপ্তাহের একেক দিন একেকটা পরতেন, সব নিয়ে গেছে চোরটা।

'যাক, দিনটা একেবারে বেকার যায়নি,' কিশোর বলল।

'কার জন্যে?' মুসা বলল, 'কালো হাতের জন্যে, না আমাদের?'

'আমাদের। আমরা অ্যারিয়ানোর পিছু নিয়েছিলাম, এদিকে তখন মিসেস রোজের সর্বনাশ করছে কালো হাত। সুতরাং লিস্টি থেকে আরেক জনকে বাদ দেয়া যায়।'

'জিউসেপ অ্যারিয়ানো,' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

নোটবুক থেকে পিয়ানোবাদকের নামটা কেটে দিতে দিতে রবিন বলল, 'মিস্টার আবে, রিচার্ড হুফার ও জিম মার্টিন।'

বিড়বিড় করল কিশোর, *'হারাধনের দশটি ছেলের রইল বাকি তিন।'*

সেদিন সন্ধ্যায় মেসিনা প্রণালীতে ঢুকল জাহাজ। সিসিলির পূর্ব উপকূল ধরে যাবে। কালো হাতের কাজ-কারবার এখন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে যাত্রীদের। অতটা মনমরা হয়ে নেই আর তারা।

রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। তাদের সঙ্গে আছে পিটার। হাত তুলে দেখাল শ্যারিবৃডিসের ঘূর্ণিপাক আর স্কাইলা-র ডুবো পাহাড়। প্রাচীন গ্রীক আর রোমান নাবিকদের কাছে এই জায়গাগুলো ছিল একটা আতঙ্ক। পারতপক্ষে এর ধারেকাছে ঘেঁষত না। এড়িয়ে চলত। 'তবে আধুনিক জাহাজের কোন ক্ষতি করতে পারে না ওগুলো,' পিটার বলল। 'আমাদের ভয় নেই।'

খুব আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনছে গোয়েন্দারা। তবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ওখানে। সারাটা দিন প্রচুর পরিশ্রম করেছে। ক্লান্ত লাগছে। সকাল সকালই ঘুমাতে গেল ওরা।

পরদিন সকালে উঠে দেখে ইটালির নেপলসে পৌঁছে গেছে জাহাজ। কয়েক দিন এখানকার উপকূলে ঘোরাফেরা করবে। নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খুশি হতে পারল না কিশোর। বলল, 'যাত্রার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা। এখনও চোরটাকে ধরতে পারলাম না। মাত্র আর কয়েকটা দিন আছে হাতে। এখনও কিছু করতে পারলাম না। ও কি আমাদের চেয়ে চালাক?'

'সত্যি কথা বলব?' মুসা বলল, 'মনে তো হচ্ছে। এবার বোধহয় সফল হতে পারব না আমরা। একটা চোরের কাছে হারতে হবে।'

'আমি তা মনে করি না,' প্রেরণা জোগানোর জন্যে বলল জিনা, 'তিন গোয়েন্দা কখনও হারেনি, এবারও হারবে না। অত মন খারাপ করছ কেন, কিশোর? তোমার বুদ্ধির ছুরিগুলো ব্যবহার করো না, কিছু একটা বের করে ফেলতে পারবেই।'

'হাউ!' জিনার সঙ্গে একমত হয়ে বলল রাফি।

হাসল কিশোর। 'ঠিকই বলেছিস, রাফি, এভাবে হার স্বীকার আমরা করব না। বুদ্ধির খেলায় হারাতেই হবে কালো হাতকে।'

ইটালিতে প্রথম দিনে কোন অঘটন ঘটল না। দ্বিতীয় দিনটাও নিরাপদেই কাটল। তৃতীয় দিনে ক্যাপরিতে এল বেড়াতে। সেখানে ঘটল একটা নাটকীয়, মজার ঘটনা।

ইবিজাতে গিয়ে যে ব্রোচটা হারিয়েছিল সেটা পরে এল মিস টিটাং। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ফ্রকের লাইনিঙে আটকে ছিল। আজ খুলে পরতে গিয়ে পেলাম। কালো হাত আমাকে মাপ করে দিয়েছে। আমার দিকে নজর দেয়নি।'

'একটা অপরাধের কথা তাহলে কেটে দিতে হচ্ছে খাতা থেকে,' রবিন বলল।

কিন্তু কাটলে আবার সেটা নতুন করে লিখতে হত তাকে। সেদিন জাহাজে ফেরার পথে মিস টিটাং খেয়াল করল, ব্রোচটা আবার নেই। এবার তার হাতব্যাগে পাওয়া গেল কালো হাতের একটা কার্ড।

নিজের ওপরই খেপে গেল কিশোর, ব্রোচটা কখন চুরি হলো লক্ষ করেনি বলে। আসলে কল্পনাই করতে পারেনি এ রকম একটা কাণ্ড হবে, তাহলে খেয়াল রাখত।

রবিন বলল, 'রিচার্ড হুফারের নামটা তাহলে কেটে দেয়া যায়। আজ তিনি জাহাজ থেকেই নামেননি।'

'কাটলে দুজনের নাম কাটতে হবে,' জিনা বলল। 'হুফার আর জিম। শোনা যায়, একলা অপারেশন চালায় কালো হাত, তার কোন সঙ্গী নেই। যে লোকের চেহারাই দেখেনি কেউ আজতক, সে যে কোনটা করে আর কোনটা করে না নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। হয়তো তার একজন সহকারী আছে। সেটা জিম ক্যাম্পার হতে পারে। হুফার জাহাজ থেকে নামেনি বটে, জিম তো নেমেছিল। বসের হয়ে সে-ই হয়তো কাজটা সেরে দিয়েছে।'

জিনার কথাকে সমর্থন করতেই যেন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটল পরদিন।

নেপল্‌স্‌ উপসাগর পার হয়ে অস্ট্রিয়ার উদ্দেশে চলেছে জাহাজ। বন্ধুদের সঙ্গে

জিনাও সাঁতার কাটছে, এই সময় তার বাদিং স্যুটের একটা ফিতে ছিঁড়ে গেল। কেবিনে আরেকটা বাদিং স্যুট আছে তার, সেটা আনতে চলল। গ্যাঙওয়ে ধরে এগোতে গিয়ে চোখে পড়ল জিনিসটা। রূপার একটা ব্রেসলেট পড়ে আছে। তুলে নিল সেটা। ট্যাগ লাগানো রয়েছে, তাতে জিমের নাম লেখা।

হুফারের কেবিনের বাইরে জিনিসটা পেয়েছে সে। সেটা ফেরত দেয়ার জন্যে দরজায় টোকা দিতে যাবে, এই সময় ভেতর থেকে শোনা গেল রাগত কণ্ঠস্বর, 'ওই মেয়েটাকে বাদ দিতে বলেছিলাম তোমাকে। ব্রোচটা তার প্রিয় জিনিস। অন্যান্য অলঙ্কারের তুলনায় দামও তেমন কিছু না। অত সাধারণ একটা জিনিস আনার ঝুঁকি নিতে গিয়ে ধরা পড়ার কোন মানেই হয় না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অত রাগার কি হলো? ভাবলাম, একটা মজা করি। আপনার একটা কার্ড ছিল আমার কাছে, দিলাম তার ব্যাগে ঢুকিয়ে।'

'গাধা কোথাকার! শোনো, ভবিষ্যতে কোন সময়···'

আর শোনার প্রয়োজন বোধ করল না জিনা। ব্রেসলেটটা যেখানে পেয়েছে সেখানেই ফেলে রেখে দিয়ে ছুটে চলল কেবিনে। কথাগুলো কারা বলেছে বুঝতে পেরেছে সে। রিচার্ড হুফার আর জিম ক্যাম্পার। হুফার হলো কালো হাত, আর জিম তার সহকারী।

ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি বাদিং স্যুটটা পাল্টে নিয়ে আবার দৌড় দিল। চলে এল সুইমিং পুলের কাছে। ওর মুখ দেখেই আন্দাজ করে ফেলল অন্যেরা, কিছু একটা ঘটেছে।

'কি ব্যাপার, জিনা?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'ভূত দেখেছ মনে হয়?'

'ভূত দেখলে এতটা চমকাতাম না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জিনা। আশেপাশে তাকাল সে। অন্যান্য সাঁতারুরা বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে, নিচু গলায় বললে তাদের কথা শুনতে পাবে না। ফিসফিস করে বলল, 'কালো হাতকে পেয়ে গেছি···'

বাধা দিল কিশোর, 'এখানে না। আমাদের হেডকোয়ার্টারে চলো, লাইফবোটটার কাছে। সেখানেই সব শুনব।'

জিনার মুখে সব শোনার পরও চুপ করে রইল সবাই। রাফিও অনড়, এমন কি নটিও কিছু করছে না।

'এই তাহলে ব্যাপার!' নীরবতা ভাঙল মুসা। 'রিচার্ড হুফারই তাহলে যত নষ্টের মূল! ধরা যায় কি করে?'

'চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরতে হবে,' রবিন বলল। 'তারপর সবাইকে বলব।'

'চোরাই মালগুলোও বের করতে হবে,' টকার বলল।

'হ্যাঁ,' নিচের ঠোঁট দু-আঙুলে চেপে ধরে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। 'রিচার্ড হুফার, না?' নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলছে সে। 'বড় চালাক! পঙ্গু সেজে থেকে এই কাণ্ড! ভালই!'

'কিন্তু ধরবটা কি করে?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।

'দিনরাত তাদের পেছনে লেগে থাকব। অপরাধী কে সেটা জানা থাকলে তার অপরাধ ধরতে পারাটা অনেক সহজ।'

কিশোরের আচরণে নিরাশই হলো জিনা। যতটা চমকে দেবে ভেবেছিল, কোন রহস্যময় কারণে ততটা চমকাল না কিশোর। কেন? সে কি অন্য কিছু ভাবছে?

আলোচনা করে ঠিক হলো, পালা করে হুফার আর তাঁর সেক্রেটারির ওপর নজর রাখবে ওরা। একেকবারে দুজন দুজন করে থাকবে। এভাবে সারাক্ষণ নজর রাখতে পারলে এক সময় না এক সময় হাতেনাতে পাকড়াও করে ফেলতে পারবে চোরটাকে।

বারো

আরেকটা ঘটনা দ্বিধায় ফেলে দিল গোয়েন্দাদেরকে। রোমে নেমেছে ওরা। গাড়িতে করে চলেছে অ্যাপিয়ান ওয়ে ধরে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন রিচার্ড হুফার, 'হায়, হায়! নিয়ে গেল, নিয়ে গেল! আমার ব্রিফকেস! অনেক দামী কাগজপত্র ছিল ওর মধ্যে!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ভদ্রলোকের চেহারা।

'বাহ্, দারুণ অভিনয়,' নিচু গলায় বলল মুসা। 'সিনেমায় ঢুকলে নাম করতে পারত। চেহারা দেখেছ? যেন সত্যি সত্যি নিয়ে গেছে।'

হুফারের কাছাকাছিই বসেছে কিশোর। জবাব দিল না। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে নেড়ে নেড়ে সবাইকে দেখাচ্ছেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। কালো হাতের ভিজিটিং কার্ড।

গাড়ির সমস্ত যাত্রীদের কাছে খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু হুফারের ব্রিফকেস পাওয়া গেল না।

'গাড়িতে ওঠার আগেই বোধহয় নিয়ে গেছে,' টারময়েল বললেন, 'আপনি খেয়াল করেননি।' খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন ভদ্রলোক।

'জাহাজ থেকে নামিয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই,' হুফার বললেন। 'মূল্যবান কাগজপত্র, স্টক আর শেয়ার ছিল তাতে। সঙ্গে রাখাটাই নিরাপদ ভেবেছিলাম।'

'আরেকটা নাম বাদ দেয়া গেল,' রবিন বলল। মিস্টার আবে, আসেনইনি, দাঁত ব্যথা করছে বলে জাহাজে রয়ে গেছেন। কাজেই কাজটা তিনি করেননি। বাদ।

এখনও নীরব হয়ে আছে কিশোর। কি ভাবছে, জাহাজে ফেরার আগে জানতে পারল না তার বন্ধুরা। ওপরের ডেকে লাইফবোটের কাছে এসে ঘোষণা করল, 'হুফার কালো হাত নন। তালিকা থেকে তাঁকে আর জিমকে বাদ দেয়া যায়।' তারপর আনমনেই বলল, *'হারাধনের দশটি ছেলের রইল না আর কেউ!'*

অবাক হয়ে গেছে অন্য চারজন। বলে কি? কিশোর পাশা যখন বলেছে নিশ্চিত না হয়ে বলেনি।

জিনা বলল, 'কিন্তু আমি তো নিজের কানে শুনলাম···মিস টিটাঙের ব্রৌচ চুরি করেছে বলে জিমকে ধমকাচ্ছেন। মহিলার ব্যাগে কার্ড রেখে এসেছে জিম, স্বীকার

করেছে।'

'করেছে। কথাবার্তাগুলোই কেমন সন্দেহজনক।'

'মানে? কি বলতে চাইছ?'

'দুজন লোক জোরে জোরে কথা বলেছে, তাই না?'

'হ্যা। স্পষ্ট শুনেছি। শুনতে একটুও অসুবিধে হয়নি।'

'ব্যাপারটা তোমাদের কারও কাছে অদ্ভুত লাগেনি? গোপন কথা বলার সময় কি জোরে কথা বলি আমরা? এই যে এখন বলছি, চেঁচিয়ে বলছি? আর কালো হাতের মত চালাক একজন মানুষ ওভাবে জোরে জোরে কথা বলে নিজের অস্তিত্ব ফাঁস করে দেবে? গ্যাঙওয়ের ধারে কেবিন, ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় যে কেউ শুনে ফেলতে পারে।'

'তাই তো! এটা তো ভাবিনি!' রবিন বলল।

'আরেকটা ব্যাপার, যদি সহকারীকে ধমকাতেই হয় যে কোন সময় সেটা পারত। একেবারে মেপে মেপে জিনা যখন কেবিনের সামনে দাঁড়াল তখন কেন? বড় বেশি কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে না?'

'হচ্ছে,' মাথা দোলাল মুসা।

'তারপর ধরো এই জিমের নাম লেখা ব্রেসলেটের ব্যাপারটা। পড়বি তো পড় একেবারে জিনার চোখে। আর পড়ে রইল কোথায়? যাদেরকে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের কেবিনের দরজার সামনে। যেন একেবারে জিনার চোখে পড়ার জন্যেই।' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। 'আসলে, আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটাই সাজানো।'

'কিন্তু আমি যে দুজনের কথা শুনলাম?' যুক্তি দেখাল জিনা।

'ঠিকই শুনেছ। তবে সেটাও ভুয়া। কালো হাত জেনে গেছে আমরা তদন্ত করছি। কাজেই আমাদের ভুল পথে চালানোর জন্যে, ধোঁকা দেয়ার জন্যে আমাদের নজর অন্যদিকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে।'

'কিন্তু কি ভাবে?' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল মুসা। 'আলোচনাটা চালাল কি করে?'

'সেটাই জানতে হবে এখন আমাদের।' সবাইকে আরও কাছে আসার ইশারা করল কিশোর। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এখানে আসার আগে একটা খবর জেনে এসেছি। মিস্টার হুফার আর জিম নিরপরাধ। জাহাজের বারম্যানের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, জিনা যে সময়টায় ব্রেসলেট পেয়েছে, যাদের কথা শুনেছে বলে ভাবছে, তারা তখন তাস খেলছিল স্মোকিং রুমে।'

'তা কি করে সম্ভব?' টকার বলল, 'আর আছেই তো মাত্র দুজন। তাদেরকেও যদি সন্দেহ থেকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে কাকে সন্দেহ করব? কালো হাত কে? কোন লোকটা?'

'সেটাও জানতে হবে। তার মানে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে আমাদের।'

হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের শেষ স্টপেজ জেনোয়া, ইটালির অনেক বড় বন্দর।

সেখান থেকে আবার সাউথহ্যাম্পটনে ফিরে যাবে জাহাজ। তার আগেই চোরটাকে ধরতে না পারলে আর কোন আশা নেই। মরিয়া হয়ে উঠল গোয়েন্দারা। পিটারকে সঙ্গে নিয়ে পুরানো সন্দেহভাজনদের ওপর কড়া নজর রাখতে আরম্ভ করল। কিশোর বুঝতে পারছে, এভাবে কিছুই করতে পারবে না। কিভাবে করবে সেটাও ঠিক করতে পারছে না।

পালা করে পাহারা দেয় ওরা। রাফিকে নিয়ে রাতে জাহাজের গ্যাঙওয়েতে টহল দেয় তিন গোয়েন্দা। দিনে দেয় টকার ও জিনা। সঙ্গে থাকে নটি। ওদেরকে সাধ্যমত সাহায্য করে পিটার। সব দিকে নজর রাখে, যখন তখন গিয়ে হাজির হয় যেখানে সেখানে। কিন্তু কোন লাভই হয় না। সন্দেহজনক কিছুই নজরে পড়ে না।

কিশোরও হতাশ হয়ে পড়েছে। বলল, 'নাহ্, এভাবে হবে না। অন্য কিছু করতে হবে আমাদের।' কিন্তু কি করবে, কোন উপায় দেখতে পেল না।

জেনোয়া বন্দরে পৌছল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। টারময়েল ঘোষণা করে দিলেন, যাত্রার এই শেষ পর্যায়ে বড় বড় পার্টি দেয়া হবে জাহাজে। ডাঙায় ভ্রমণ সহ নানা রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে। তাঁর ইচ্ছে, চুটিয়ে আনন্দ করুক সবাই।

'প্রথমেই আমরা যাব কলম্বাসের বাড়ি দেখতে,' বললেন তিনি। 'বিখ্যাত সেই ক্রিস্টোফার কলম্বাস, যিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। আশা করি আপনাদের ভাল লাগবে।'

কিন্তু কলম্বাসের বাড়ি দেখে হতাশ হলো গোয়েন্দারা। ওরা আশা করেছিল বিরাট প্রাসাদ বা দুর্গটুর্গ হবে, কিন্তু গিয়ে দেখল শহরের মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর। রাস্তা মেরামতের মজুররা যেমন ছাপরা বানিয়ে থাকে তার চেয়ে ভাল কিছু না। ভাগ্যিস দেয়ালগুলো ছেয়ে আছে সুন্দর আইভি লতায়, নইলে বড়ই করুণ দেখাত বাড়িটার চেহারা।

মুগ্ধ আসলে কেউই হতে পারল না। নিরাশই হলো। গাড়িতে ফিরে এল যাত্রীরা।

'এবার আমরা খাঁটি ইটালিয়ান খাবার খেতে যাব শহরে,' টারময়েল বললেন। 'তারপর যাব বিখ্যাত ক্যাম্পো স্যান্টোতে, পৃথিবীর বৃহত্তম কবরস্থান দেখতে।'

'বাহ্, কি চমৎকার জায়গা!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'দুনিয়ার আর সব বাদ দিয়ে কবর দেখতে যাই, ভূতের আড্ডায়। ওটা একটা জায়গা হলো নাকি?'

'ভয় লাগছে নাকি?' হেসে বলল রবিন। 'অনেক পুরানো কবর তো, পুরানো অনেক ভূতের দেখা মিলতে পারে। এমন সুযোগ হারাতে চাও?'

'চুপ করো!' এই দিনের আলোতেই গায়ে কাঁটা দিল মুসার।

কাছেই বসেছে পিটার। হেসে উঠল। 'ভূতের অত ভয়? আমি নিয়ে যেতে পারলে সাহস পেতে অনেকটা। তবু, ভয়ের কিছু নেই। ভূতটুত কিছু নেই ওখানে।'

'আপনি কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আজ সন্ধ্যায় একটা শো আছে আমার। পারসার বলে দিয়েছে, খুব যেন জমজমাট হয়। তার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে। জাহাজে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমরা সময়মত চলে এসো। শো-টা মিস কোরো না।'

লাঞ্চের পর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল পিটার।

আবার এসে গাড়িতে উঠল যাত্রীরা। পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল বাস। শহর থেকে অনেকটাই দূরে ক্যাম্পো স্যান্টো।

গোয়েন্দাদেরকে অবাক করে দিয়ে এই যাত্রায় যোগ দিয়েছেন দুই প্রফেসর, কারসওয়েল আর পারকার।

'ওদেরকে বের করে আনতে আমার জান বেরিয়ে গেছে,' কেরিআন্টি বললেন। 'তা-ও পারতাম না। কিন্তু কেন যেন মনে হয়েছে ওদের, গোরস্থানটা দেখতে যাওয়া উচিত। ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, অনেক পুরানো কিছু বিখ্যাত লোকের কবর আছে এখানে, কবে জন্ম কবে মৃত্যু, সন-তারিখ লেখা আছে, সে সবই আকৃষ্ট করেছে ওদেরকে, জানতে যাচ্ছে।'

তিনটে পাহাড় জুড়ে রয়েছে ক্যাম্পো স্যান্টো। এতই বিশাল এলাকা নিয়ে কবরস্থানটা, দূর থেকে রাস্তা, গলি, বাগান এসব দেখে শহরই মনে হয়। গেট দিয়ে ঢোকার আগে কি মনে করে ফিরে তাকাল টকার, ওর বাবা কোথায় দেখার জন্যে। এতক্ষণ খুব একটা নজর করে দেখেনি তার বাবাকে, এখন তাকিয়েই চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'সর্বনাশ! এত মোটা হয়ে গেছে জাহাজে বসে বসে!' বলে উঠল সে। 'খেয়ালই করিনি!'

'আমার আব্বাও তো!' জিনাও অবাক। 'হয়েছে কি!'

হাসতে লাগলেন কেরিআন্টি। 'ভয় নেই, সারাক্ষণ বসে বসে স্প্যাগেত্তি খাওয়ার ফল এটা নয়। মোটা হয়ে যায়নি। মিস্টার ডিক ড্যানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।'

বুঝতে পারল না জিনা কিংবা টকার।

আবার হাসলেন আন্টি। 'বুঝলে না? মিস্টার ড্যান পাথর রেখেছিলেন কোমরের ক্যানভাসের বেল্টে। এরা পকেটে রেখেছে মূল্যবান দলিলপত্র। কালো হাতের ভয়ে পারসারের আয়রন সেফকে নিরাপদ মনে করেনি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। যতগুলো পকেট আছে সবগুলোতে ঠেসে ভরেছে কেবল কাগজ আর কাগজ। মোটা দেখাবে না তো কি?'

হা-হা করে হাসতে লাগল মুসা।

'বদ্ধ উন্মাদ!' মুখ বাঁকাল জিনা। 'মাথায় যে কি ঢুকে থাকে খোদাই জানে। ওই হিজিবিজি লেখা কাগজে কি পাবে? কেন চুরি করতে আসবে কালো হাত?'

'হিজিবিজি বলো আর যা-ই বলো, কিছু কিছু মানুষের কাছে ওগুলো হীরার চেয়ে দামী। অনেক জরুরী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফরমুলা আছে ওগুলোতে। দুজনে মিলে অনেক চেষ্টা করে আবিষ্কার করেছে। অনেকেই পেলে লুফে নেবে।'

'এই জন্যেই,' রবিন বলল, 'এই জন্যেই দুজনে ওভাবে বসে থাকে। এত গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফাসুর। তাই তো বলি, যেখানেই যেতে চাই, কোন আপত্তি করে না কেন? বললেই রাজি। আসলে খেয়ালই করে না আমরা কি বলেছি।'

'না, করে না,' হেসে বললেন আন্টি।

বিশাল কবরস্থানে ঢুকল দলটা। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল একজন গাইড। 'এদিক দিয়ে আসুন, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান···হ্যাঁ, এদিক দিয়ে।' ভাল ইংরেজি বলে লোকটা, ইটালিয়ান টান।

ভীষণ গরম। কিছুদূর হেঁটেই ছেলেমেয়েদের মনে হতে লাগল এর চেয়ে জাহাজের কেবিনে বসে থাকাই অনেক আরামের ছিল। বার বার সে কথা বলতে লাগল মুসা, জিনা আর টকার।

কিশোর বলল, 'এসেই যখন পড়েছি, এখন তো আর যাওয়া যাবে না। চুপচাপ হাঁটো। চোখ খোলা রাখো।'

'রেখেছি তো,' মুসা বলল। 'আর কিভাবে রাখব? কিছুই তো···'

'অ্যাই, জলদি এসো,' হঠাৎ বলল টকার। 'আব্বা জ্যাকেট খুলছে। এত গরমে কি আর গায়ে রাখা যায় নাকি। ভুলেই গেছে পকেট বোঝাই যে কাগজ।'

'হ্যাঁ, চলো,' রবিন বলল, 'কাছাকাছি থাকি···'

বলে শেষও করতে পারল না সে, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একটা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর কারসওয়েল। কবরটার একধারে উঁচু বেদিতে দাঁড় করানো একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি—পাখা ছড়ানো দেবদূত। ওটার কাছে চলে গেছেন তিনি, আচমকা লম্বালম্বি দুই ভাগ হয়ে গেল মূর্তিটা। ভেতর থেকে লাফিয়ে এসে প্রফেসরের গায়ে পড়ল মুখোশ পরা একজন লোক।

মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল দুজনে। গোয়েন্দাদের বিমূঢ় ভাবটা কাটার আগেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। প্রফেসরের জ্যাকেটটা নিয়ে দৌড় দিল কবরগুলোর ভেতর দিয়ে। চোখের পলকে হারিয়ে গেল।

'কালো হাত, কালো হাত!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'ধরো ওকে, ধরো!' বলতে বলতেই ছুটল চোরটা যেদিকে গেছে সেদিকে।

কয়েক কদম যাওয়ার আগেই মুসা তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

ধরো ধরো বলা যত সহজ, কালো হাতকে ধরা তত সহজ নয়। কবরগুলোর আশপাশ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। পিছু নিয়েছে মুসা। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। লোকটা তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে দৌড়ায়।

উঁচু উঁচু সমাধি ফলক, নানা রকমের মূর্তি, স্তম্ভের অভাব নেই কবরস্থানে, ওগুলোর কোনটার আড়ালে যে লুকিয়ে পড়ল চোরটা, খেয়ালই রাখতে পারা গেল না। হোয়াইট অ্যাঞ্জেলের যাত্রীরা যারা এসেছে সবাই খুঁজতে লাগল। কয়েকটা মজার ঘটনা ঘটে গেল এই সময়। বাঁয়ে একটা স্তম্ভের আড়ালে নড়াচড়া দেখে তৈরি হয়ে রইলেন ভিক ড্যান। যেই লোকটা বেরোল, অমনি তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে দেখা গেল তিনি মিস্টার আবে। দুজনেই দুজনকে কালো হাত মনে করে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কিশোরের। বার বার হাতে পেয়েও কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না চোরটাকে। এখানে ওকে খুঁজে বের করতে পারত একমাত্র রাফি। কিন্তু কবরস্থানে কুকুর ঢোকানো নিষেধ বলে বাইরে গাড়িতে রেখে আসতে হয়েছে তাকে।

সবাই অনেক খোঁজাখুঁজি করল। পাওয়া গেল না কালো হাতকে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। অবশ্য এতবড় কবরস্থান থেকে খুঁজে বের করাটা শুধু কঠিনই নয়, প্রায় অসম্ভব। হতাশ হয়ে একে একে খোঁজা বন্ধ করল সবাই। মারবেল পাথরের একটা স্তম্ভের গোড়ায় প্রফেসর কারসওয়েলের জ্যাকেটটা দেখতে পেল রবিন। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দেখল, পকেটগুলো খালি। একটা কাগজও নেই। সব নিয়ে গেছে।

'কে যে কাজটা করেছে জানি না আমরা,' নিজেই নিজেকে বলতে লাগল কিশোর। 'যে কেউ হতে পারে। আস্তে সরে গিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে। তারপর মুখোশ লাগিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল ফাঁপা মূর্তিটার ভেতর। সুযোগ মত লাফিয়ে পড়ে জ্যাকেটটা কেড়ে নিয়েই পালিয়েছে।'

গালি তো দিতে জানেন না, তাই হাস্যকর সব কথা বলে চোরটাকে বকতে লাগলেন প্রফেসর কারসওয়েল। জিনার আব্বাও রেগে আগুন। জাহাজে ফিরেই আগে ক্যাপ্টেনের কাছে অভিযোগ করতে ছুটলেন।

হাসতে হাসতে জিনা বলল, 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে ভাবতেই পারে না ওরা। এখন সেটার চেহারা দেখে কেমন হাবুডুবু খাচ্ছে দেখো। এত বুদ্ধিমান মানুষগুলোও কি বোকা হয়, ভাবতেই কেমন লাগে, তাই না?'

তবে তার হাসিতে খুব একটা যোগ দিতে পারল না কেউ। সবাই গম্ভীর হয়ে আছে। রাফিও সবার এই অবস্থা দেখে চুপচাপ হয়ে গেছে। পরিবেশ হালকা করার জন্যে আবার বলল জিনা, 'ও আসলে অমন করছে কেন জানো? চোরটার বে পাছা কামড়ে ধরতে পারল না সেই জন্যে।'

তাতেও বিশেষ সুবিধে হলো না।

তবে সন্ধ্যায় জাদু দেখতে গিয়ে মন অনেকটা হালকা হয়ে এল ওদের। গাঢ় নীল ডিনার জ্যাকেট পরেছে সুদর্শন ম্যাজিশিয়ান। ক্রমাগত হাসছে। পকেট থেকে সাদা দস্তানা বের করে নাটকীয় ভঙ্গিতে পরল, যেন জটিল অপারেশন করতে যাচ্ছে, সাবধানতার প্রয়োজন আছে। তাস আর বল নিয়ে বিস্ময়কর সব খেলা দেখাতে লাগল। তবে সবই এগুলো পুরানো খেলা। তারপর বলল, এবার নিজের আবিষ্কৃত কিছু খেলা দেখাবে এবং তার জন্যে রাফিকেও দরকার হবে।

স্টেজে পাঠানো হলো কুকুরটাকে। গিয়েই বোকা হয়ে গেল যখন তার পায়ের ফাঁক থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে মাথায় বসল একটা পায়রা। তবে পাখিটাকে ধরতে গেল না। ওকে চুপ থাকতে বলা হয়েছে, নির্দেশ পালন করল বুদ্ধিমান কুকুরটা। পিটার তার বন্ধু, কাজেই তার কথা মানতে কোন দ্বিধা নেই তার।

আরও নানা রকম অদ্ভুত খেলা দেখাতে লাগল পিটার। ঘন ঘন হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা।

শো শেষ হলে পিটারকে গিয়ে প্রশংসা করে এল গোয়েন্দারা। তারপর ঘুমাতে চলল।

অন্যেরা শুয়ে পড়লেও কিশোর পারল না। পায়চারি করছে আর ভাবছে ফরমুলা ছিনতাইয়ের ব্যাপারটা।

পরদিন সকালে অবাক হয়ে দেখল তার বন্ধুরা, একরাতেই চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের। তবে চোখের তারা উজ্জ্বল। কিছু একটা হয়েছে, আন্দাজ করতে পারল ওরা। কিন্তু জিজ্ঞেস করল না। কিছু বলার থাকলে নিজে থেকেই বলবে কিশোর, বলার জন্যে চাপাচাপি করার দরকারও নেই, করে লাভও হবে না, জানে ওরা।

নাস্তা শেষ করেই বলল কিশোর, 'চলো, আমাদের হেডকোয়ার্টারে। কথা আছে।'

লাইফবোটের কাছে পা দিয়েই বলতে আরম্ভ করল, 'টকার, তোমার আব্বার যে কাগজগুলো চুরি গেছে সেগুলো বের করতে হলে খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে আমাদের। চোরটাকে ধরে জিনিসপত্রগুলো আদায় করতে না পারলে পরে দেরি হয়ে যাবে।'

'তাকে ধরবে!' অন্যদের মতই হাঁ হয়ে গেছে রবিনও। 'লোকটা কে তাই তো জানি না আমরা!'

'সেই জন্যেই তাড়াহুড়া করতে হবে। আমাদের হাতে আর মাত্র দুদিন বাকি।' এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'সমস্যাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা। মনে জমে আছে অনেক কিছু। এসো, সেগুলো খোলাসা করি।'

ওর এই নাটকীয় কথা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে রবিন আর মুসা। কিছু বলল না। কথা আরম্ভ করেছে যখন শেষও কিশোরই করবে। কিন্তু টকার অতশত বুঝল না, ফস করে বলল, 'কি আর খোলাসা করব? অনেককে সন্দেহ করলাম, সন্দেহ থেকে খারিজও করলাম, তারপর আবার করলাম। এখন আর কাকে যে করব বুঝতে পারছি না। পুরো ব্যাপারটাই এখন পাগলামি মনে হচ্ছে আমার কাছে। কিছুই বলার নেই আমার।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার?'

'নেই,' হাত ওল্টাল রবিন।

মুসা আর রবিনের দিকে ফিরল কিশোর।

চোয়াল ডলল মুসা। 'কি আর বলব, বলো? তবে একজনকে সন্দেহ হয় আমার এখন, পারসার মিস্টার টারময়েল। তাকে সন্দেহ করার কথা কেউ ভাবিনি আমরা। যাত্রীদের সবার সঙ্গে মিশেছেন। চুরি করাটা তাঁর জন্যে সহজ। মিস্টার বটব্যালকেও বিপথে রাখার সুবিধে তাঁর বেশি।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'পারসারকে সন্দেহের বাইরে রাখব আমরা। ডাঙায় যখন ডাকাতিগুলো হয়েছে, তখন তিনি কারও না কারও সঙ্গে ছিলেন। অ্যালিবাই আছে। একটা মুহূর্তের জন্যেও তিনি কখনও একলা হননি। কাজেই তাঁকে বাদ। জিনা, অন্য কারও নাম বলতে পারো?'

দ্বিধা করল জিনা। গাল চুলকাল। 'কি আর বলব? একলা একজন মানুষের পক্ষে এভাবে চুরি করা এবং পার পেয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'আমার বিশ্বাস, কালো হাত একা কোন লোক নয়। অনেকে মিলে একটা

সংঘবদ্ধ দল, যাদের মিলিত নাম কালো হাত। আর কোন ব্যাখ্যা নেই।'

'আরও তো জটিল করে তুলছ,' টকার বলল। 'তাহলে তো ধরে নিতে হয় যাত্রীদের অনেকেই এই দলের লোক।'

'সেটা হলেই বরং সহজ হত,' কিশোর বলল। 'বেশি লোক কাজ করতে গেলে অনেক সময়ই গোলমাল করে ফেলে। ভুল করে, ঝগড়া বাধায়, দলের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করে, এ জন্যেই দলবদ্ধ ক্রিমিন্যালরা একসঙ্গে বেশিদিন টিকতে পারে না। নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করে। কালো হাত যে এতদিন ধরা পড়েনি, তার চেহারা কেমন তা-ও জানে না পুলিশ, তার একটাই কারণ, সে একা।'

কিশোরের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। বলল, 'এত ভণিতা কেন করছ, কিশোর? বুঝতেই তো পারছি তুমি বুঝে ফেলেছ লোকটা কে। দয়া করে আর ঝুলিয়ে না রেখে বলে ফেলো, প্লীজ!'

হাসল কিশোর। বলল, 'বলতে খারাপই লাগছে। প্রথমে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করেনি যে কালো হাত আমাদেরই বন্ধু, যাকে বিশ্বাস করে সব বলে দিতাম আমরা...'

কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিল মুসা, 'খাইছে! পিটার উড।'

তেরো

খবরটা স্তব্ধ করে দিয়েছে সবাইকে। জিনা আর টকারের মুখ দেখে তো মনে হলো কেঁদেই ফেলবে। তারপর একসঙ্গে কথা শুরু করল সবাই ঃ *অসম্ভব! ও আমাদের বন্ধু! ভাল লোক! ও চোর হতেই পারে না! কিশোর, তোমার ভুল হয়েছে!*

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, ভুল আমার হয়নি।'

'কিন্তু সে আমাদের বন্ধু!' জোর দিয়ে বলল টকার।

'বিশ্বাসঘাতক বন্ধু হয় কি করে?'

'বন্ধু হোক বা না হোক আমাদের সাহায্য তো করেছে?' জিনা বলল।

'করেছে তার নিজের স্বার্থে। আমাদের বিশ্বাস অর্জন করে আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখার জন্যে। সে জেনে গিয়েছিল আমরা কে, কি করি, গোয়েন্দাগিরিতে নাম কামিয়েছি, সঅব। আমাদেরকে অন্ধকারে রাখার জন্যে, একই সঙ্গে আমরা কি করছি না করছি জানার জন্যে যেচে এসে খাতির জমিয়েছে আমাদের সঙ্গে। তারপর আমাদের বোকামি দেখে মুচকি হেসেছে।'

এসব অহেতুক তর্কাতর্কির মধ্যে গেল না রবিন। কিশোর পাশা যখন বলছে পিটার উড কালো হাত, ঠিকই বলেছে। জিজ্ঞেস করল, 'তাকে সন্দেহ করলে কি কারণে?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। হেঁটে এল কয়েক কদম। তাকাল সবার মুখের দিকে। 'কারণ একটা নয়, অনেক। ওর ওপর সন্দেহ আমার অনেক আগে থেকেই হয়েছে। গাঢ় হলো যেদিন ডিক ড্যানের পাথর চুরি গেল, সাদা দস্তানাটা পাওয়া গেল। টারময়েল বললেন, ওটা জাহাজের কারও না। স্টুয়ার্ডদেরকে তিনি অত দামী কাপড়ের দস্তানা সাপ্লাই করেন না। কাল সন্ধ্যায় ম্যাজিক শোতে পিটারকে সাদা

দস্তানা পরতে দেখলাম। রাফি যেটা পেয়েছিল, সেটা আর পিটার যেগুলো পরেছে একই ধরনের জিনিস। তার মানে ওটা তারই দস্তানা ছিল।'

এই একটা প্রমাণই যথেষ্ট। থ হয়ে গেছে সবাই। টকার আর জিনাও চুপ, কোন তর্ক করা নেই।

'আরেকটা ব্যাপার মনে করে দেখো,' বলতে থাকল কিশোর, 'রাতের বেলা ড্যানের কেবিনের তালা খুলতে দেখে চোরটাকে তাড়া করলাম আমরা। রাফি ছুটে গেল তার পেছনে। তারপর কি ঘটল? লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল পিটারের সঙ্গে। পিটার বলল, কুকুরটাকে ছুটে যেতে দেখে ডেকেছে সে, আর অমনি ফিরে এসেছে রাফি। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না? কোন কিছুর পেছনে ও তেড়ে গেলে তোমারও তো ওকে ফেরাতে কষ্ট হয়,' জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'অথচ চোরকে তাড়া করে গিয়ে পিটার ডাকতেই সুড়সুড় করে ফিরে চলে এল? পিটারকেই তাড়া করে গিয়েছিল আসলে সে, তারপর যখন দেখল তার পরিচিত মানুষ, নরম হয়ে গেল। কিছু আর করল না। কেবিনে জ্যাকেট আর মুখোশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে রাফিকে নিয়ে ফিরে এল সে।'

'আর বলার দরকার নেই!' দুহাত নাড়তে নাড়তে বলল টকার, 'সব বুঝে গেছি! উফ্, এমন একটা মানুষকে বিশ্বাস করেছিলাম!'

'দাঁড়াও, আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। রিচার্ড আর জিমের কথাবার্তা জিনাকে কি করে শোনাল শুনবে না?'

'বলো বলো,' তাগাদা দিল মুসা।

'জিমের ব্রেসলেটটা চুরি করেছিল সে। জিনাকে আসতে দেখেই কেবিনের দরজায় ফেলে রেখেছিল। আমাদের জন্যে তৈরিই হয়ে ছিল। জিনা না গিয়ে যে কেউই যেতাম আমরা, ওটা ওভাবেই ফেলে রাখত। ওই সময় মিস্টার হুফারের কেবিন খালি ছিল, ফলে সুবিধে হয়ে গিয়েছিল পিটারের জন্যে। কিংবা হয়তো ওরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল সে। জিনাকে দেখেই ব্রেসলেটটা দরজার সামনে ফেলে গিয়ে কেবিনে ঢুকল, কথা বলতে শুরু করল। সে যে একজন ভেনট্রিলোকুইস্ট এ কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম, কাল শো দেখার পর মনে পড়ল। মনে থাকলে আরও আগেই তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যেত আমার কাছে। কারও কণ্ঠস্বর নকল করা, কিংবা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কথা ছুঁড়ে দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়াটা কোন ব্যাপারই না তার কাছে। প্রথম দিন ম্যাজিক দেখানোর সময় কি করেছিল মনে নেই? কথা বলেছিল সে নিজে, আমাদের মনে হয়েছিল রাফি আর নটি কথা বলছে।'

'হুঁ, বুঝলাম, মস্ত ফাঁকি দিয়েছে আমাদেরকে শয়তানটা!' রেগে গেছে জিনা। 'এখন কি করব আমরা? তার মুখোশ খুলব কি করে?'

'কাল রাতে সেটাও ভেবে রেখেছি।'

'কি, বলো না?' অনুরোধ করল রবিন। 'নাকি সময় না হলে বলবে না?'

হাসল কিশোর। 'না বলব, সে জন্যেই তো ডেকে আনলাম এখানে।'

দল বেঁধে পিটারের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। দরজায় টোকা দিল

কিশোর।

দরজা খুলে দিল পিটার। ওদেরকে দেখে হাসল, 'আরে, তোমরা? কেমন আছো?'

'ভাল,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর।

'টকার, তোমার আব্বার মেজাজ কেমন আছে? কাগজগুলো পেয়েছেন? আহারে, এত কষ্ট করে কাজ করেছেন, সব গেল। সত্যি, ভদ্রলোকের জন্যে খারাপই লাগছে আমার।'

'মেজাজ ভালই আছে,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল টকার। কিশোর যদিও বার বার সাবধান করে দিয়েছে লোকটার সামনে কোন অস্বাভাবিক আচরণ করবে না, তবু আর সহজ হতে পারছে না সে।

পিটার যাতে কোন সন্দেহ করে বসতে না পারে সে জন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'প্রফেসরের মেজাজ খারাপ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং কালো হাতকে একটা ধোঁকা দিতে পেরে মহা আনন্দেই আছেন এখন দুই বিজ্ঞানী।'

ভুরু কোঁচকাল পিটার। 'বুঝলাম না?'

'বুদ্ধিমান লোক তো দুজনেই, কি করে জানি আঁচ করে ফেলেছিলেন, তাঁদের কাগজপত্রের ওপর নজর পড়েছে কালো হাতের। কি করবেন কি করবেন ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি বের করে ফেললেন। কালো হাতকে ফাঁকি দেয়া দরকার, নইলে কাগজপত্রগুলো বাঁচাতে পারবেন না। শেষে আজেবাজে কিছু কাগজ পকেটে ভরে কবরস্থান দেখার ছুতোয় বেরোলেন দুজনে। চাইছিলেনই যেন ওগুলো নিয়ে গিয়ে চুপ হয়ে যায় চোরটা। নইলে দেখার এত ভাল ভাল জায়গা থাকতে যাঁরা বেরোননি, তাঁরা বেরোলেন দুপুরের রোদে পুড়ে কবরখানা দেখতে? ভাবলেই হাসি পায়।' পিটারের মুখের দিকে তাকাল কিশোর। ভাল অভিনেতা সে। লোকটাকে ফাঁকি দিতে পারছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'আসল জিনিস কোথায় আছে জানেন? ফরমুলাটাকে অনেক ছোট করে ফেলে লুকিয়ে রেখেছেন জুতোর ভেতরে। কালো হাতের বাপেরও সাধ্য নেই, সেটা আন্দাজ করতে পারে। গাধাটা তো এখন কতগুলো হিজিবিজি লেখাওয়ালা ফালতু কাগজ নিয়েই মহাখুশি। নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছে আর হেসে হেসে বলছে, আহা কি করলাম রে! এই একটি বার দুই প্রফেসরের কাছে ভেড়া বনে গেল সে।'

'কিশোর, আব্বা কিন্তু কাউকে বলতে মানা করেছিল,' এবারও পিটারের দিকে তাকাতে পারল না টকার।

'কাউকে বললাম কোথায়?' অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর। 'পিটার তো আমাদের বন্ধু। কালো হাতকে ধরতে কত সাহায্য করছে আমাদেরকে। তাকে তো বলতেই হবে, নইলে সাহায্য পাব কি করে?'

মাথা নেড়ে পিটার বলল, 'না না, আমাকে বলায় কিছু হবে না।' টকারকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে বলল, 'আমি কাউকে বলব না। ধরে নিতে পারো, আমি শুনিইনি।'

'আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই তো বলা হলো,' রবিন বলল।

'তা কি জন্যে এসেছিলে বললে না? একথা বলতে নিশ্চয় আসোনি?'

'না,' কিশোর বলল। 'আজ রাতে জরুরী মীটিঙে বসব আমরা। কালো হাতের একটা ব্যবস্থা না করলেই আর নয়। রাত দশটার দিকে আপনি চলে আসবেন ওখানে।'

'আচ্ছা,' ঘাড় কাত করল পিটার। 'তো, আমার একটা কাজ আছে এখন, আর কথা বলতে পারছি না…'

'আমাদেরও কথা শেষ। আমরা যাচ্ছি।'

'এই, চলো, সাঁতার কাটতে যাই,' তাগাদা দিল মুসা।

'হ্যাঁ, চলো।'

সবাইকে নিয়ে ফিরে চলল কিশোর। ফিরে তাকালে দেখতে পেত রহস্যময় একটা হাসি ফুটেছে ম্যাজিশিয়ানের মুখে। যেন ব্যঙ্গ করছে ওদেরকে।

সেদিন ডিনারের পর আবার গিয়ে মিস্টার পারকারের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন কারসওয়েল, অন্যান্য দিনের মতই। পারলে আলাপ করে সারাটা রাতই কাবার করে দিতেন দুজনে, কেরিআন্টির জন্যে পারেন না। এই দুই বুড়ো খোকাকে কড়া শাসনে না রাখলে যা ইচ্ছে তাই করবে খুব ভাল করেই জানেন তিনি। তাই বেশিক্ষণ কথা বলতে পারলেন না কারসওয়েল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে আসতে হলো নিজের কেবিনে। কাপড় খুলে, গোসল করে এসে শুয়ে পড়লেন। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক-ডাকা শুরু হয়ে গেল।

রাত একটার দিকে, প্রফেসর যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন আস্তে করে খুলে গেল দরজাটা। ঘরে ঢুকল একটা ছায়ামূর্তি। মুখে মুখোশ। সোজা এগিয়ে গেল পরনের কাপড়গুলো যেখানে খুলে রেখেছেন কারসওয়েল, সেদিকে। ছোট একটা টর্চ জ্বলে উঠল তার হাতে। আলোর রশ্মি গিয়ে স্থির হলো একজোড়া জুতোর ওপর।

নিচু হয়ে জুতোটা তুলে সারতেও পারল না সে, ঝটকা দিয়ে পুরো খুলে গেল কেবিনের একমাত্র দরজাটা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল অনেকগুলো মানুষ। কয়েকটা বড় বড় টর্চ জ্বলে উঠল একসঙ্গে। কে যেন সুইচ টিপে ঘরের আলোও জ্বেলে দিল।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাগুলো। কিছুই করতে পারল না চোরটা। পালানো তো দূরের কথা, সামান্যতম বাধাও দিতে পারল না। ধরা পড়ল।

ঘরে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা, জিনা, টকার, মিস্টার পারকার, কেরিআন্টি, ক্যাপ্টেন বেরিমোর, মিস্টার টারময়েল ও মিস্টার বটব্যাল।

একটানে খুলে নেয়া হলো চোরের মুখোশ।

সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল টকার, 'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস! সত্যিই তোমার ফাঁদে পা দিল তাহলে বোকা গাধাটা…'

পিটারের বিমূঢ় ভাবটা কাটতে সময় লাগল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠল চোখ, 'তুমি…তুমি তাহলে মিথ্যে কথা বলেছ আমাকে…'

'না বলে উপায় কি বলুন?' হেসে বলল কিশোর, 'মিথ্যেবাদীকে মিথ্যে দিয়েই ধরার কায়দাটা বের করলাম শেষ পর্যন্ত।'

এত রাতে হট্টগোল কিসের দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়ল যাত্রীরা। বেরিয়ে সব শুনে তো থ। গোয়েন্দাদের প্রশংসা জানাতে আর ধন্যবাদ দিতে আসতে লাগল সবাই।

তবে এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি কিশোর। চোরাই মালগুলো কোথায় আছে বের না করার আগে স্বস্তি নেই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ডাইনিং রুমে গিয়ে শুনল, মাল কোথায় আছে স্বীকার করেনি পিটার। আরেক বার পুরো জাহাজে তল্লাশি চালানো হলো। বিশেষ করে তার কেবিনে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

আবার মীটিং ডাকল কিশোর। লাইফবোটের পাশে বসে সহকারীদের বলল, 'এই কাজটাও মনে হয় আমাদেরই করে দিতে হবে। শীঘ্রি সাউথহ্যাম্পটনে ফিরে যাচ্ছি আমরা। পুলিশ আসবে। তাদের আগেই যদি মালগুলো বের করে ফেলতে পারি একটা কাজের কাজ হবে।'

'পারব?' জিনা বলল।

'পারব,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাস কিশোরের কণ্ঠে। 'পারতেই হবে।'

সময় আর বেশি নেই। এর মাঝেই কাজটা সারতে হবে।

কাজ ভাগাভাগি করে দিল কিশোর। প্রথমে জাহাজের সেই সব জায়গায় খুঁজবে, যে সব জায়গায় পিটারের যাতায়াত ছিল। তাদেরকে সাহায্য করার লোকের আর অভাব নেই এখন। মিসেস রোজের মত বদমেজাজী মহিলাও সাহায্য করতে চাইলেন ওদের। এগিয়ে এলেন সোয়ানসন দম্পতি, মিস টিটাং, মিস্টার আবে, জিউসেপ অ্যারিয়ানো। ভিক ড্যান বিরাট অঙ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বসলেন, তাঁর পাথরগুলো যে বের করে দিতে পারবে তাকে দেয়া হবে।

ফলে জাহাজের আরও অনেকেই উৎসাহিত হয়ে পড়ল। কিন্তু খোঁজাই সার হলো। জিনিসগুলো বের আর করা গেল না।

'মাত্র আজকের রাত আর কালকের দিনটা আছে,' করুণ হয়ে উঠেছে মুসার চেহারা, 'এর মাঝে বের করতে না পারলে আর লাভ হলো না কিছুই।'

'খোঁজা বন্ধ করব না আমরা,' টকার বলল। 'বের হোক বা না হোক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চালিয়ে যাব।'

সন্ধ্যা হয়ে গেল।

হাল ছেড়ে দিয়ে মুসা বলল, 'আজ আর হলো না। রাতে বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান আছে। সেটা দেখতে গেলে আর খুঁজতে পারব না। থাক, কালকেই খুঁজব।'

'আমারও দেখার ইচ্ছে আছে,' রবিন বলল। ভ্রমণের সমস্ত পথটাই তো কেবল সমস্যার কথা ভেবে কাটাল। শেষ রাতটা অন্তত কোন কিছু না ভেবে কাটাতে চায়, আনন্দ যা হয় সবটা উপভোগ করতে চায়।

তবে টকারের মনটা খারাপ। পিটার যে এমন ভাবে বেঈমানী করবে কল্পনাই করতে পারেনি। তাকে সত্যিই পছন্দ করে ফেলেছিল সে।

কেরিআন্টি একথা শুনে বললেন, 'এটাই জীবন, বুঝলে, এইই হয়। যতই বড় হবে ততই শিখবে। এখন এসব নিয়ে মন খারাপ কোরো না। যাও, সবার সঙ্গে আনন্দ করোগে।'

সেদিন বিকেলে একসঙ্গে ডিনারে বসল সমস্ত যাত্রীরা। খাওয়াটা ভাল জমল। কালো হাত ধরা পড়ায় একটা ভার নেমে গেছে যেন মাথার ওপর থেকে, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে সবাই। এমনকি মিসেস রোজও সবার সঙ্গে ভাল আচরণ করছেন। রাফি আর নটিকে দেখেও বিরক্ত হচ্ছেন না।

বহুবার গোয়েন্দাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন, ডাইনিং রুমে আরেকবার দিলেন। বললেন, তাদের কারণেই যাত্রাটা শেষ অবধি ভাল ভাবে শেষ হতে যাচ্ছে।

লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছেন না জাহাজের ডিটেকটিভ মিস্টার বটব্যাল। ডাইনিং রুমে খেতেই আসেননি তিনি।

কেরিআন্টি খুব গর্বিত। হেসে হেসে কথা বলছেন সবার সঙ্গে। তবে দুই প্রফেসরের কোন ভাবান্তর নেই। তাঁরা আছেন তাঁদের গবেষণা নিয়ে।

'এবার বাজি পোড়ানো হবে,' ঘোষণা করলেন মিস্টার টারময়েল। 'জাহাজের দুজন অফিসার নৌকাতে করে বাজি নিয়ে চলে যাবে দূরে। সেখানে গিয়ে পোড়াবে, যাতে আপনারা সবাই ভাল করে দেখতে পান। বাজি দূর থেকে দেখতেই ভাল লাগে। যান, আপনারা সবাই ডেকে চলে যান।'

নৌকায় করে বাজি নিয়ে চলে গেল দুজন অফিসার। ডেকে এসে আরাম করে ডেক-চেয়ারে বসল যাত্রীরা, কেউ দাঁড়াল রেলিং ঘেঁষে।

'চলো, হেডকোয়ার্টারে চলে যাই,' সঙ্গীদের বলল কিশোর। 'আমাদের ওখানেই আরাম। দেখাও যাবে ভাল।'

সবাই রাজি।

বাজি পোড়ানো শুরু হলো। বিচিত্র আলোয় জ্বলে উঠল যেন অন্ধকার রাত। নানা রঙের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে বাজির পোড়া ছাই ঝরে পড়তে লাগল সাগরে।

টকারের কাঁধে বসে নাকি সুরে কিচকিচ করে চলেছে নটি, বানরের ভাষায় এটাই বোধহয় ঘ্যানর ঘ্যানর। বাজি দেখতে ভাল লাগছে না বোধহয় তার।

তার কথায় কানই দিচ্ছে না টকার।

আরেকটা হাউই শাঁ করে উঠে গেল আকাশে। অনেক ওপরে উঠে ফাটল। বিচিত্র কয়েকটা রঙিন বল তৈরি হলো। ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে নিচে নেমে আসার সময় বুম বুম করে ফাটতে লাগল এক এক করে।

এই বিকট শব্দে ভয় পেয়ে গেল নটি। টকারের কাঁধে মুখ গুজল। গায়ে আলতো চাপড় দিয়ে তাকে অভয় দিল টকার, 'ভয় কি, ও তো বাজিরে?'

সাগরের পানি আর অন্ধকার আকাশ আলোকিত করে, রঙের ফুলঝুরি ছিটিয়ে বাজি পুড়ছে একের পর এক। শেষ বাজির শেষ পটকাটা ফুটল কামানের গর্জন তুলে। কাঁপিয়ে দিল চারদিক।

আর সহ্য করতে পারল না নটি। আতঙ্কে এক লাফ দিয়ে টকারের কাঁধ থেকে

নেমে অন্ধকারেই দিল দৌড়। কোন দিকে যে উধাও হয়ে গেল কিছুই বোঝা গেল না।

'ওকে এনেই ভুল করেছি,' ভয় পেয়ে গেল টকার। 'বেঁধে রেখে আসা উচিত ছিল। এখন কোন দিকে যে গেল খোদাই জানে।'

'চলো, খুঁজে আনি,' মুসা বলল। 'বাজি তো শেষই।'

মই বেয়ে নিচের ডেকে নেমে এল ওরা।

'আমার কেবিনেই ঢুকেছে হয়তো,' টকার বলল। 'দরজা বন্ধ। কোথায় আর যাবে, বাইরেই চুপ করে বসে বসে কাঁপবে।'

কিন্তু সেখানে পাওয়া গেল না বানরটাকে। পুরো একটা ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করল ওরা, যাকে দেখল তাকেই জিজ্ঞেস করল বানরটাকে দেখেছে কিনা। কেউই দেখেনি।

কাঁদো কাঁদো গলায় টকার বলল, 'ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তো, মনে হয় সাগরেই ঝাঁপ দিয়েছে!'

'আমার আসলে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে,' নিজের মাথায় চাপড় মারল কিশোর। 'ঘোলা হয়ে গেছে বুদ্ধি। নইলে মনে থাকে না কেন? রাফিকে দিয়ে খোঁজালেই তো হত। নটি যে গদিটাতে ঘুমায়, সেটা শুঁকিয়ে নিয়ে ওকে বললেই পারতাম। গন্ধ শুঁকে বের করে ফেলত।'

'না শোঁকালেও তো হয়,' আশার আলো দেখতে পেয়েছে টকার, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'গন্ধটা তো ওর চেনাই।'

'না, অত মনে রাখতে পারে না জানোয়ারেরা, ভুলে যায়।'

গদিটা শোঁকানো হলো রাফিকে। তারপর নটিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া হলো।

এত জোরে ছুটল কুকুরটা, ওটার চেন ধরে তাল রাখাই মুশকিল হয়ে গেল কিশোরের। সবাই ছুটছে তার পেছনে। 'আরে আস্তে, আস্তে বা, অত তাড়াহুড়া করছিস কেন?' বলল সে।

প্রথমে নিচের ডেকে চলে এল রাফি। তারপর রওনা হলো ওপরের ডেকে, গোয়েন্দাদের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারে।

'ওদিকে যাচ্ছে কেন?' অবাক হলো রবিন। 'ও বুঝতেই পারছে না মনে হয়।'

'দেখাই যাক না কি করে,' জিনা বলল। 'রাফি তো সাধারণত ভুল করে না।'

লাইফবোটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল কুকুরটা। ওপর দিকে তাকিয়েহউ! হউ! করল দুবার। লাফিয়ে উঠে নৌকাটায় দুই পা তুলে দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দিল তেরপলের নিচে। আবার ডেকে উঠল হউ! হউ!

তীক্ষ্ণ ভীত একটা কিচিরমিচির শোনা গেল। দ্রুত এসে একটান দিয়ে তেরপলের কানাটা সরিয়ে দিয়ে ভেতরে তাকাল কিশোর আর টকার। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ল না। হাত ঢুকিয়ে দিল টকার, ডাকতে লাগল, 'নটি, নটি বেরিয়ে আয়।'

জরুরী সময়ে কাজে লাগে লাইফবোট। তখন খাবার কিংবা প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র তোলার জন্যে সময় না-ও মিলতে পারে। সে জন্যে আগে থেকেই সব কিছু রেখে দেয়া হয় নৌকায়। একটা খাবারের বাক্স হাতে ঠেকল টকারের। তার ওপর বসে আছে বানরটা। নড়ে উঠে লাফ দিতে গিয়ে উল্টে ফেলে দিল একটা পানির বোতল।

নটিকে বের করে আনল টকার। গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আদর করে বলতে লাগল, 'একেবারে বোকা তুই, বুঝলি। বাজির শব্দে মানুষ অমন ভয় পায়? বোকা ছেলে…'

'মানুষ কোথায় দেখলে,' হেসে বলল মুসা। 'ও তো বানর।'

'ওই হলো। মানুষ তো আগে বানরই ছিল।'

'ওই থিওরি এখন আর বিশ্বাস করেন না অনেক বিজ্ঞানী,' সুযোগ পেয়েই বিদ্যে ঝাড়তে শুরু করে দিল রবিন। 'তবে, আমাকে জিজ্ঞেস করলে উল্টোটা বলতে পারি। মানুষের যা স্বভাব চরিত্র দেখি, তাতে বলা যায় বানর থেকে মানুষ হয়নি, মানুষ থেকেই বরং বানর হয়েছে…এই কিশোর, তুমি আবার চুপ করে আছো কেন? কি ভাবছ?'

'অ্যাঁ!…না, কিছু না। কি যেন একটা ধরি ধরি করেও ধরতে পারছি না। চলো, যাই। অনেক রাত হয়ে গেল।'

ফিরে চলল ওরা। মই বেয়ে নামতে গিয়ে থমকে গেল কিশোর। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'এই, চলো তো আবার!'

'কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। আবার উঠতে আরম্ভ করেছে। ওপরের ডেকে উঠে সোজা চলে এল লাইফবোটের পাশে। তেরপলের কানা তুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। হাতড়ে হাতড়ে বের করে আনল পানির বোতলটা, যেটা ফেলে দিয়েছিল নটি। এক ঝাঁকি দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!' নতুন আবিষ্কার করে আর্কিমিডিস বোধহয় এভাবেই চিৎকার করেছিলেন, *'ইউরেকা! ইউরেকা!'*

সবাই ঘিরে এল তাকে।

'এটাই ধরতে পারছিলাম না, বুঝলে,' কাঁপা গলায় বলল কিশোর। 'বোতলটা কাত হয়ে পড়ে গেল, ভেতরে পানি থাকলে যে রকম শব্দ হয় সে রকম হয়নি, কেমন যেন ঝনঝন করে উঠল। অন্য রকম লেগেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারিনি ব্যাপারটা।'

বোতলের ভেতরে পানি নেই। পাথর কিংবা মারবেল থাকলে যেমন ঝনঝন করে অনেকটা তেমনি শব্দ হলো। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও ভেতরে কি আছে ঠিকই আন্দাজ করতে পারল ওরা।

'জলদি গিয়ে একটা টর্চ নিয়ে এসো,' বলল কিশোর। 'ক্যাপ্টেনকেও ডেকে আনবে।'

বোতলে রয়েছে ডিক ড্যানের পাথরগুলো। একটা বিস্কুটের টিনের মধ্যে পাওয়া গেল অন্যান্য চোরাই মাল; মিসেস সোয়ানসনের হার, হুয়ান রডরিজের চুনি বসানো আঙটি অ্যারিয়ানোর ঘড়ি, মিসেস রোজের সাতটা আঙটি, মিস টিটাঙের

ব্রৌচ। আরেকটা টিনে পাওয়া গেল দুই প্রফেসরের কাগজপত্র।

পরদিন সাউথহ্যাম্পটনে পৌঁছল হোয়াইট অ্যাঞ্জেল। জেটিতে অনেক লোকের ভিড়। যাত্রীদেরকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে অনেকের আত্মীয়-স্বজন। কালো হাতের ধরা পড়ার খবর বেতারে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন। খবরটা প্রচার হয়ে গেছে। ফলে পুলিশ তো এসেছেই, খবরের কাগজের লোক আর উৎসুক জনতাও এসে ভিড় জমিয়েছে জাহাজঘাটায়।

জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই সবার আগে উঠে এল পুলিশ। পিটারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। কালো হাত নামতেই ক্যামেরা নিয়ে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল রিপোর্টাররা। মুখ নামিয়ে রেখেছে পিটার, যাতে ভালমত ছবি তুলতে না পারে।

এক এক করে নেমে যেতে শুরু করল যাত্রীরা।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদেরকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন মিসেস রোজ। মিষ্টি হেসে মিষ্টি সুরে বললেন, 'ও, তোমরা এখানে। আমি ওদিকে খুঁজে মরি। ভাল হলো, দেখা হয়ে গেল। আসছে শনিবার আমার বাড়িতে তোমাদের দাওয়াত। সেদিন আমার জন্মদিন। আসতেই হবে বলে দিলাম।'

মাথা কাত করে ভদ্র গলায় কিশোর বলল, 'আসব, যদি ইংল্যাণ্ডে থাকি। আমেরিকায় চলে গেলে তো আর হবে না।'

'থাকলে আসবেই, কথা দিচ্ছ তো?'

'দিচ্ছি।'

'রাফি আর নটিকে অবশ্যই আনবে। এত ভাল জোড়া আমি আর দেখিনি। ওরকম একটা কুকুর আর বানর যদি থাকত আমার, পৃথিবীতে আর কিছুই চাইতাম না।' জিনার দিকে ফিরলেন তিনি, 'জিনা, সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। কিছু মনে রেখো না।'

কি জবাব দেবে জিনা? মিসেস সিলভার রোজ এই আচরণ করছেন? স্বপ্ন দেখছে না তো! মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না তায়, কোনমতে মাথাটা শুধু একবার কাত করল সে।

নেমে গেলেন মিসেস রোজ।

'আশ্চর্য এক সফর করে এলাম আমরা!' বিড়বিড় করে বলল রবিন, 'ওঠার সময় এক রূপ দেখলাম মানুষগুলোর, নামার সময় আরেক!'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর, 'মানুষ চেনা বড় কঠিন।'

'হউ!' করে খাঁটি বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রাফি। যেন কিশোরের সঙ্গে সে একমত।

—o—

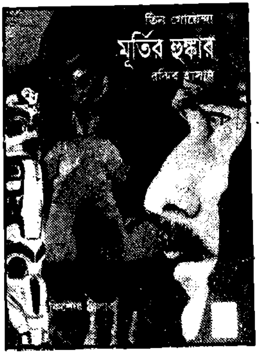

মূর্তির হুঙ্কার

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ১৯৯৪

'খুব মজা হবে এবার, কি বলিস, রাফি?' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল জিনা।

'হাউ!' রাফিয়ান বলল লেজ নাড়তে নাড়তে। জিনার কোন কথার প্রতিবাদ করে না সে, তর্ক করে না। ভীষণ ভালবাসে একে অন্যকে।

স্কুলের হোস্টেল থেকে গোবেল বীচে মাত্র পরশু দিন এসেছে জিনা। হোস্টেলে কুকুর রাখার নিয়ম নেই। কুকুরটা ছিল এখানে। দুজনেই দুজনকে দেখে খুব খুশি।

রাফির গলায় হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগল জিনা, 'ভাব একবার, পুরো দুই মাস ছুটি। আবহাওয়া যা দারুণ রে! ঠাণ্ডাও না গরমও না। কিশোররাও থাকছে আমাদের সঙ্গে, তিনজনেই। কি মজাটাই না হবে, আহ্! যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ওরা।'

খুশির চোটে রাফির সামনের দু-পা তুলে ধরে তাকে নিয়েই বাগানময় নেচে বেড়াতে শুরু করল সে।

গেটে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। কুকুরটার পা ছেড়ে দিল জিনা। 'ওই যে, বোধহয় এল!'

দুজনেই দৌড় দিল গেটের দিকে।

ঠিকই আন্দাজ করেছে। গাড়ি থেকে নামল কিশোর। তার পেছনে রবিন।

'মুসা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'এই যে আমি,' ওপাশ থেকে ঘুরে বেরিয়ে এল মুসা। দুই হাতে দুটো বড় বড় স্যুটকেস। রবিন আর কিশোরের দিকে একটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আরে ধরো না। দুটো কি নিতে পারি নাকি?'

ছুটে গিয়ে কিশোরের হাত চেটে দিতে শুরু করল রাফি। তার মাথায় আলতো চাপড় দিতে দিতে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কেমন আছিস, রাফি? ভাল?'

ভাল যে সেটা বোঝানোর জন্যেই যেন ভাল করে আরেকবার তার হাত চেটে দিল কুকুরটা। তারপর এগোল রবিনের দিকে।

'আন্টি আর আংকেল কেমন আছে?' জিনাকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'খুব ভাল,' হাসল জিনা। 'তোমার জন্যে সুখবর আছে। ইয়া বড় এক কেক,' দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দেখাল সে। 'চিকেন স্যাণ্ডউইচ, স্যামন স্যাণ্ডউইচ, আপেল পাই...'

'উফ্, আর বোলো না, আর বোলো না!' ওকে থামিয়ে দিল মুসা। তার ভঙ্গি দেখে মনে হলো ভারি স্যুটকেসটা হাতে না থাকলে এখনই রান্নাঘরের দিকে দৌড়

দিত।

চা তৈরিই করে রেখেছেন জিনার আম্মা, তিন গোয়েন্দার কেরিআন্টি। কাজেই খাওয়ার টেবিলে বসতে দেরি হলো না।

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে এসে বসল ওরা। ছুটিটা কিভাবে কাটাবে সেই পরিকল্পনা করার জন্যে। ঠিক হলো দুটো কাজ তো অবশ্যই করবে—এক, সাগরে সাঁতার কাটা; দুই, জিনার নৌকাটা নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়া। রবিন বলল, 'আর সাইকেল তো আছেই। যে কোন সময় বেরিয়ে পড়তে পারি। ঘুরে আসতে পারি গাঁয়ের ভেতরে যেখানে সেখানে।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' জিনা বলল। 'সাইকেলগুলো বের করে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলা দরকার। তেলটেলও দিতে হবে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'কিছু মেরামতি থাকলে সেগুলোও সেরে ফেলতে হবে।'

'চলো,' উঠে দাঁড়াল মুসা, 'সেরে ফেলিগে।'

স্টোর রুম থেকে চারটে সাইকেল বের করল ওরা। পুরু হয়ে ধুলো পড়ে আছে। প্রথমেই ন্যাকড়া বের করল সেগুলো মোছার জন্যে।

'গোবেল বীচে অনেক ট্যুরিস্ট এসেছে এ বছর,' জিনা জানাল। 'অ্যানটিক আর স্যুভনির শপগুলো সব জমজমাট। তিন-চার বছর ধরে যেগুলো বন্ধ ছিল, সেগুলোও খুলেছে এবার।'

'আমার খুব অবাক লাগে,' মুসা বলল। 'এই টেলিভিশন-ভিসিআরের যুগে পুরানো বাতিল জিনিস দিয়ে ঘর সাজিয়ে কি আনন্দ পায় লোকে?'

'লোকে যে কোনটায় আনন্দ পায় আর কোনটায় পায় না, লোকেও জানে না,' রবিন বলল।

'আব্বা বলে,' ন্যাকড়া দিয়ে সাইকেল ডলতে ডলতে বলল জিনা, 'আজকাল নাকি অ্যানটিকের ব্যবসা খুব গরম। মুসা ঠিকই বলেছে, বেশিরভাগই বাতিল জিনিস বিক্রি করে ওরা। ওগুলোকে অ্যানটিক শপ না বলে স্যালভিজ শপ বলা উচিত। খালি মানুষকে ঠকায় ব্যাটারা। তবে সব অ্যানটিকই যে খারাপ তা নয়, দেখার মত জিনিসও আছে। গোবেল বীচের বড় দোকানটার কথাই ধরো। ওই যে ওল্ড এজ, মালিক কুপার রেন, তাঁর দোকানেই আছে অনেক কিছু। কাল একটা কেরোসিনের ল্যাম্প কিনতে গিয়েছিল আম্মা। আমাদের আগের বাতিটা খারাপ হয়ে গেছে। জানো তো এখানে ইলেকট্রিসিটির কি ডিস্টার্ব। তুফান হলেই তো গেল, তার-টার ছিঁড়ে সর্বনাশ। সে জন্যে বাতি লাগে। আমিও গিয়েছিলাম আম্মার সঙ্গে। ভদ্রলোক খুব ভাল ব্যবহার করলেন। অনেক কিছু দেখালেন আমাকে।'

'কি জিনিস?' আগ্রহী মনে হলো কিশোরকে।

মুচকি হাসল জিনা, 'দেখতে চাও নাকি?'

'মন্দ কি?'

রবিনেরও যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

'বেশ,' জিনা বলল, 'সাইকেল ঠিকঠাক করে চলো আগে ওখানেই চলে যাই।'

কিছুক্ষণ পর সাইকেলে চেপে দল বেঁধে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা আর জিনা। তাদের পাশে পাশে দৌড়ে চলল রাফি।

ঠিকই বলেছে জিনা, এ বছর ট্যুরিস্টের ভিড় বেশি। কিছু দূর এগোতে না এগোতেই সেটা দেখা হয়ে গেল গোয়েন্দাদের। ছোট্ট গ্রামটা যেন গিজগিজ করছে মানুষে।

'দূর!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা, 'ছুটিটাই মনে হচ্ছে মাঠে মারা যাবে! এত মানুষ থাকলে কি আর কিছু করতে ভাল লাগে? যেখানেই যাব খালি দেখব মানুষ আর মানুষ। স্বস্তিতে সাঁতারও কাটতে পারব না।'

'পারব না কেন?' রবিন বলল, 'সরে যাব দূরে কোথাও।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'সাইকেল তো আছেই। দরকার হয় বনের মধ্যে চলে যাব। বন পেরোলে ওপারেও সাগর পাওয়া যাবে।'

বন শব্দটা রাফির পরিচিত। বন মানেই খরগোশ তাড়ানো আর কাঠবিড়ালীকে ধমক দেয়ার সুযোগ। কাজেই কিশোরকে সমর্থন করে বলল সে, 'হউ! হউ!'

'বড় বেশি কান পাতলা কুকুরটার,' হেসে বলল মুসা। 'সব শোনে। যা-ই বলব, ঠিক শুনে ফেলবে। মন্তব্য করবেই।...অ্যাই, চুপ থাকতে পারিস না?'

চুপ যে থাকতে পারে না সেটা বোঝানোর জন্যেই যেন বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে রাফি বলল, 'হউ! হউ! হউ! হউউউউউউ!'

এত কথার পর আর না হেসে পারা যায়? হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

দোকানটা দেখা গেল। টিনের চালের ওপরে সাইনবোর্ড বসানো। তাতে লেখা, **ওল্ড এজ**। একটা বোর্ড আগের মতই আছে, পরিবর্তন করা হয়নি। তবে দরজার ওপরে নতুন আরেকটা বোর্ড লাগানো হয়েছে। তাতে উজ্জ্বল লাল রঙে অনেক বড় বড় করে **অ্যানটিক** লেখাটা অনেক দূর থেকেও চোখে পড়ে। দোকানের সামনে বেশ ভিড়। প্রচুর লোক ঢুকছে বেরোচ্ছে। অনেকে দাঁড়িয়ে আছে ডিসপ্লে উইণ্ডোর কাঁচের সামনে। ভেতরে সাজানো জিনিসগুলো দেখছে। অনেক পুরানো আসবাব, ফ্লাওয়ার ভাস, অলঙ্কার আর বিচিত্র সব জিনিসে ঠাসা দোকানটা।

বাইরে দাঁড়াল না জিনা। বলল, 'এসো, ভেতরে ঢুকে যাই। কুপারের সঙ্গে ভাল খাতির আমার। প্রচুর কথা বলেন। পেটে কিছুই থাকে না। গড়গড় করে বলে দেন সব। এখানে নতুন দোকান দিয়েছেন, তা-ও ট্যুরিস্ট সিজন ছাড়া খোলেন না। তাঁর আসল ব্যবসা হলিউডে। ওখানেও পার্টনারশিপে একটা অ্যানটিক শপ চালান।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। দোকানের ভেতর অনেক লোক। যেই কয়েক জন একসঙ্গে বেরোল, খালি হলো কিছুটা, ওই সুযোগে চট করে ঢুকে পড়ল ওরা। তিন-চার জন লোকের সঙ্গে বকবক করছেন কুপার রেন। প্রায় বাগিয়ে ফেলেছেন লোকগুলোকে। কি কেনা যায় ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে ওরা। বয়স তিরিশ-বত্রিশ। লম্বা, সুদর্শন, ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। কথা বলার সময় চোখ দুটোও যেন মিটমিট করে হাসে।

'যা বলছি, একদম ঠিক,' খদ্দেরদের বোঝাচ্ছেন কুপার, 'ওই টেবিল আসল। রানী অ্যানির ব্যক্তিগত জিনিস। ঘুণ পোকার কথা বলবেন তো? বলবেন, এত ফুটো কেন? তাতে কি? ফুটোগুলোও তো আসল। রানী বেঁচে থাকতে তাঁর ঘরে থাকতেই খেয়েছে। মেরামত করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু তাতে এর অরিজিন্যালিটি নষ্ট হয়ে যেত, অ্যানটিক ভ্যালু খতম। কেন করব, বলুন? রানী আর বেঁচে নেই আজ। কবর খুঁড়লে হয়তো একআধটা হাড় মিললেও মিলতে পারে। তবে সেটা তো খুঁড়ে বের করতে দেবে না আপনাকে। কিন্তু এই টেবিলে ওই সময়কার ঘুণ পোকার কঙ্কাল কিংবা ফসিল পেতেও পারেন। এই দামে এর বেশি আর কি চান?'

হেসে উঠল খদ্দেররা। ছোট টেবিলটা ওদের পছন্দ হয়েছে। সুন্দর। একজন ঠিক করে ফেলল, কিনবে। দাম যা শুনল তাতে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হলো মুসার। এত দাম দিয়ে ঘুণ পোকার কঙ্কাল কেনার শখ হতে পারে কারও ভাবতেও অবাক লাগে তার।

ওদের চোখের সামনেই গোটা দুই চীনা অলঙ্কার অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি করে ফেললেন কুপার। ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এল। এতক্ষণে গোয়েন্দাদের দিকে নজর দেয়ার সময় পেলেন তিনি।

জিনাকে দেখে হাসলেন। হাত তুলে ডাকলেন কাছে যাওয়ার জন্যে।

তাঁর সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিল জিনা।

'আপনি খুব ভাল সেলসম্যান, মিস্টার রেন,' হেসে প্রশংসা করল কিশোর।

'আমাকে শুধু কুপার বললেই চলবে,' হাসিটা ফিরিয়ে দিলেন অ্যানটিক ব্যবসায়ী। 'ভাল সেলসম্যান হওয়াটা কিছু না। ইচ্ছে করলে তুমিও পারবে। কয়েকটা জিনিস কেবল মনে রাখতে হবে। খদ্দের যা বলবে, তার কোন প্রতিবাদ করবে না। ভুলেও তোমার জিনিসের দোষ বলবে না। আরও দু-চারটা টুকিটাকি ব্যাপার, ব্যস, দুনিয়ার সেরা সেলসম্যান হয়ে যাবে।'

'সবাই তাহলে পারে না কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'পারে না ধৈর্য রাখতে পারে না বলে। কক্ষনো ধৈর্য হারানো চলবে না। ফেলে দেয়া জিনিস রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দাও, তোমার চোখের সামনেই বিক্রি করে দেব সেটা, যে দামে বলবে সেই দামেই। অ্যানটিক শপের এই এক সুবিধা। কোন জিনিসই বাতিল কিংবা ফেলনা নয়। কোন জিনিসেরই নির্দিষ্ট কোন দাম নেই।'

কয়েকটা কথা বলেই কুপারকে পছন্দ করে ফেলল তিন গোয়েন্দা। ভদ্রলোক ব্যবসা বোঝেন। মানুষও ভাল। ওদেরকে দোকান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। নানা রকম জিনিস। সবই ফালতু, এমন বলা যাবে না। একটা মিউজিক্যাল বক্সের ওপর দাঁড় করানো একটা পুতুল। ব্যালে নর্তকীর পোশাক পরানো। ঘড়ি লাগানো আছে। কিছু কলাকৌশল করা আছে ভেতরে। চাবিতে দম দিলেই কিচকিচ শব্দ করে আর মাথা নুইয়ে অভিবাদন করতে শুরু করে। করিয়ে দেখালেন কুপার।

দেয়ালে ঝোলানো কিছু প্রাচীন বর্ম খুব পছন্দ হলো কিশোরের। একটা ব্যাকগ্যামন বোর্ড বাজিয়ে দেখল রবিন। একটা পালতোলা জাহাজের মডেলের

দিকে তাকিয়ে আছে জিনা। ভাল তৈরি হয়েছে মডেলটা।

দোকানে কাস্টোমার ঢুকতে দেখে, ছেলেমেয়েদেরকে 'এক্সকিউজ মি' বলে কাউন্টারের দিকে চলে গেলেন কুপার।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল সময়। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। দোকান বন্ধ করার সময় হয়েছে।

কুপারকে বিদায় জানিয়ে, শীঘ্রি আবার দেখতে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল গোয়েন্দারা। সাইকেলে চড়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে।

সেদিনের পর ঘন ঘন আরও কয়েক দিন ওল্ড এজে গিয়ে কুপারের সঙ্গে দেখা করল ওরা। ভদ্রলোক এতটাই মিশুক আর সুন্দর করে কথা বলেন, যেতে ভালই লাগে ওদের। বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে। এমন কি রাফিয়ানও তাঁকে পছন্দ করে ফেলেছে। কারণ যতবারই দেখা হয়েছে, পকেট থেকে কাগজে মোড়া চিনির টুকরো বের করে কুকুরটাকে খেতে দিয়েছেন তিনি।

মুসা যে মুসা, অ্যানটিক শপের নাম শুনলেই নাক কুঁচকায় যে, সে-ও দোকানটা কিংবা ওটার মালিক সম্পর্কে আর খারাপ বলে না।

রবিন বলল একদিন, 'দারুণ গল্প বলতে পারেন আপনি, কুপার। সাধারণ কথাগুলোকে এত সুন্দর করে আর গুছিয়ে বলেন, গল্প হয়ে যায়। লিখলে ভাল লেখক হতে পারতেন।'

তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে চোখেমুখে কৃত্রিম ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, 'দোহাই তোমার, আর কু-পরামর্শ দিয়ো না। এমনিতেই কাজকর্ম কিছু করি না বলে, বেশি কথা বলি বলে দোষ দেয় আমার পার্টনার। গল্প লিখতে বসলে সোজা আমার সঙ্গে ব্যবসা করা বন্ধ করে দেবে সে। কপাল চাপড়ে বলে, আমি নাকি হিসেবটাও ঠিকমত রাখতে পারি না। জরুরী কাগজপত্র হারাই। বেখেয়াল, সব কিছু ভুলে যাই। একা ব্যবসা করতে গেলে কি যে দুর্গতি হত আমার, তাই কেবল ভাবি। ট্যুরিস্ট সিজনে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে সে রয়ে গেছে হলিউডে। কারণ এখানে অত হিসেব রাখার দরকার হবে না।' হাসলেন কুপার। 'একটা কাজই ভাল পারি আমি। অ্যানটিক চেনা, এবং বিক্রি করা।'

'আমার ধারণা, ওটাই আসল কাজ,' কিশোর বলল। 'যে যে জিনিসের ব্যবসা করে সেটা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ভাল করতে পারবে না।'

ভুরু কোঁচকালেন কুপার। 'করো নাকি তুমি কিছু? কথা শুনে তো মনে হচ্ছে...'

'আপনার মতই পুরানো মালের ব্যবসা করে,' ফস করে বলে দিল মুসা।

'অ্যানটিক!'

'না না,' জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'একটা স্যালভিজ ইয়ার্ড আছে আমাদের। ব্যবসাটা চাচা-চাচীই করেন। আমি মাঝে মাঝে সাহায্য করি।'

'মালটাল ও খুব ভাল চেনে,' রবিন বলল। 'কি করে জানি বুঝে ফেলে কোনটা চলবে কোনটা চলবে না, কোনটার দাম পাওয়া যাবে, কোনটার যাবে না। ওর বুদ্ধি দেখে ওর চাচীও মাঝে মাঝে হাঁ হয়ে যান,' বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো রবিন।

'তোমরা তো কেবল বাড়িয়ে বলার ওস্তাদ,' হাসল কিশোর।

সেদিন থেকে কিশোরকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন কুপার।

চোখের পলকে যেন উড়ে চলে গেল ছুটির প্রথম হপ্তাটা। তারপর একদিন বাগানে বেরিয়ে কথা বলার সময় জিনা বলল, 'একটা ব্যাপার কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।'

কি ঠিক হচ্ছে না!—তিন গোয়েন্দা অবাক। কি বলতে চায় জিনা?

জিনা বলল, 'তোমরা এখানে এসেছ, পুরো একটা হপ্তা হয়ে গেল। তোমাদের পায়ে পায়ে ঘোরে যে জিনিস সেটারই দেখা নেই এখনও। এমন কি গন্ধ পর্যন্ত নেই।'

বুঝতে না পেরে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কথা বলছ?'

'এখনও বোঝনি?'

'না!' বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা।

'গোয়েন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে কি জিনিস যায়? ডিটেকটিভ বইতে লেখা থাকে দেখো না...'

'রহস্য!' বলে উঠল রবিন।

'ও,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মুসা। 'আমি তো ভাবছিলাম না জানি কি?'

'অত অধীর হচ্ছ কেন?' হেসে জিনাকে বলল কিশোর। 'সব সময়ই যে ছুটির সঙ্গে সঙ্গে রহস্য পেয়ে যাব, এমন কোন কথা নেই। মাত্র তো এলাম। এখনও অনেক দিন বাকি। পেয়ে যাব, আশা আছে।'

'বড় বেশি আত্মবিশ্বাস,' জিনা বলল। 'উইল ফোর্স খাটাও নাকি?'

'না। পৃথিবীতে রহস্যের অভাব নেই। সব সময়ই কিছু না কিছু ঘটছে। দেখার চোখ থাকলে, বের করে নেয়ার ক্ষমতা থাকলে ঠিকই বের করে নেয়া যায়।'

'তার মানে,' ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ল জিনা, 'তুমি বলছ রহস্য বেরোবে?' রাফির গলা জড়িয়ে ধরল সে।

'না বেরোনোর তো কোন কারণ দেখি না। আর তিন-চার দিন সময় দেব। এর মধ্যে যদি আপনাআপনি কিছু না বেরোয় তো খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাব, কোথায় আছে রহস্য। এত লম্বা একটা ছুটি তো আর খামোকা নষ্ট হতে দেয়া যায় না।'

'তা বটে,' মাথা দোলাল মুসা। 'তো, এখন যখন হাতে কোন রহস্য নেই, অহেতুক বসে বসে সময় কাটাই কেন আমরা? চলো, সাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিই।'

রসিকতা করল রবিন, 'মরার জন্যে?'

'নাহ্,' মুসাও হাসল, 'দাপাদাপির জন্যে। তোমাদের যদি সাহস থাকে সমুদ্র স্রোতে ভেসে ভেসে আমার সঙ্গে জিনার দ্বীপটাতেও চলে যেতে পারো।' সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

কিন্তু তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না কেউ।

দুই

পরের দুদিন কিছুই ঘটল না। আস্তে আস্তে বিরক্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে

কিশোর। খেয়ে, ঘুমিয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে কত আর সময় কাটানো যায়? ছুটির মাত্র সাত দিন পেরিয়েছে, এখনও অনেক বাকি। নতুন কোন আকর্ষণ না পেলে কাটানোই কঠিন হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিন সকালে নাস্তা খেতে বসেছে সবাই। আংকেল পারকারও বসেছেন ওদের সঙ্গে। তবে বিশেষ কথা বললেন না। জরুরী কাজ থাকায় তাড়াহুড়া করে খাওয়া সেরে উঠে চলে গেলেন। নিজের স্টাডিতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন। টেবিলের ওপরই ফেলে রেখে গেছেন সকালের কাগজটা।

কাগজটা টেনে নিল রবিন। খেতে খেতে চোখ বোলাতে লাগল। হেডিংগুলো দেখতে দেখতে ছোট্ট একটা খবরের ওপর এসে আটকে গেল দৃষ্টি। পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে গেল। চেঁচিয়ে উঠল আচমকা, 'আরি! মজার খবর তো! একটা বলিভিয়ান কাঠের মূর্তি বিক্রি হবে গোবেল বীচের এক অ্যানটিক শপে…'

'এটাতে অত অবাক হওয়ার কি হলো?' কিশোর বললো। 'অ্যানটিকের দোকানে পুরানো কাঠের মূর্তি থাকেই।'

'আমাকে তো কথাই শেষ করতে দিলে না। আমি বলছি ইনটারেসটিং। এই মূর্তিটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে। কথা বলে।'

কেক চিবুতে চিবুতে থেমে গেল মুসার চোয়াল। হাঁ হয়ে গেল। 'কথা বলে! তার মানে কথা বলা মূর্তি!'

'অত হাঁ হয়ে যাচ্ছ কেন?' জিনা বলল, 'তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইলেকট্রনিক কোন যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে কথা বলানোটা কোন ব্যাপারই না।'

'ইলেকট্রনিক যন্ত্র আধুনিক আবিষ্কার,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'মূর্তিটা অনেক পুরানো। তখন ওই যন্ত্র ছিল না।'

'ইলেকট্রনিক যন্ত্র না থাকলেও অন্য যন্ত্র ছিল। ঘড়ি আর কি কি সব ভরে দিয়ে জানি কথা বলানো যায় মূর্তিকে, আমি শুনেছি।'

'সেটা কি ইনটারেসটিং নয়? কাগজে লিখেছে মূর্তিটা একজন মানুষের সমান। দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।'

কিশোরকেও কৌতূহলী মনে হলো। 'আর কিছু যখন করার নেই, গিয়ে দেখতে পারি আমরা। অসুবিধে কি?'

'কোন দোকানে, লিখেছে নাকি?' মুসাও উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

'লিখেছে। গোবেল বীচেরই একটা অ্যানটিক শপ। আমাদের চেনা।'

'চেনা তো সবগুলোই। কোনটা?'

'আন্দাজ করো?'

'অত আর রহস্য করতে হবে না। বুঝেছি। ওল্ড এজ।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ভালই,' কেকের শেষ টুকরোটাও মুখে পুরে দিল মুসা। 'ভাল করে দেখতে পারব। কুপার রেন নিশ্চয় বাধা দেবেন না।'

'আরে না, তিনি কি আর দেন। মূর্তিটার সঙ্গে কথাও বলা যাবে নিশ্চয়।'

'যাওয়া তো উচিত। কথা বলা মূর্তি যখন।'

চুপ করে ওদের কথা শুনছিল কিশোর। বলল, 'তাহলে আর বসে থেকে লাভ কি? দেরি করলে শেষে বিক্রিও হয়ে যেতে পারে। কি বলো, জিনা?'

দুহাত ওল্টাল জিনা। 'কি আর? কাজ যখন কিছু নেই, চলো যাই।'

নাস্তা সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

ওল্ড এজের কাছে পৌঁছে দেখল, ভিড়টিড় তেমন নেই। বেশি সকাল। এখনও এসে পৌঁছায়নি খদ্দেররা। তবে দোকান খোলা হয়েছে।

সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে রেখে দোকানে ঢুকে পড়ল ওরা।

কাউন্টারে খবরের কাগজ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন কুপার রেন। শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালেন। ছেলেমেয়েদের দেখে হেসে কাগজটা একপাশে সরিয়ে বললেন, 'এসো এসো। এত সকালে কি মনে করে?'

গুড মরনিং জানিয়ে জিনা বলল, 'খবরের কাগজে একটা নিউজ দেখলাম। সে জন্যেই এসেছি...'

হাসলেন কুপার। 'ও, কথা বলা মূর্তিটার কথা? ওটাই পড়ছিলাম।' চোখ টিপে রসিকতা করে বললেন, 'কেনার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'কেন?' হাসিটা ফিরিয়ে দিল জিনা, 'না কিনলে দেখতে দেবেন না?'

হাহ্ হাহ্ করে হাসলেন কুপার। 'দেব না কেন? খবরটা পড়েই মনে হচ্ছিল, তোমরা আসবেই। এত তাড়াতাড়ি আসবে, সেটা ভাবিনি।' কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলেন। 'এসো।'

পেছন দিকের একটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে গেলেন তিনি। বিশাল একটা মূর্তি যেন প্রহরীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

'ডিসপ্লে উইণ্ডোতে দেননি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেব। ঝেড়েমুছে একটু পালিশ করে নিয়েছি। এবার দেব।'

অবাক হয়ে কিশোর জানতে চাইল, 'ডিসপ্লেতেই দেননি এখনও! রিপোর্টাররা জানল কি করে?'

'আমি বলেছি ওদেরকে। ভাবলাম, আগেই একটা বিজ্ঞাপন করে ফেলি। সে জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। খবরের কাগজে দেখলে অনেক ট্যুরিস্ট জানবে, ভিড় জমাবে। এই যেমন তোমরা জেনে গেলে।...একটু ধরবে? সামনের ঘরে নিয়ে যাই।'

কুপারকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। ধরে ধরে পেছনের ঘর থেকে মূর্তিটা নিয়ে এল সামনের ঘরে। আলোর মধ্যে এখন ভাল করে দেখতে পারল ওটা।

'কাঠ কুঁদে তৈরি,' কুপার বললেন। 'দেখেটেখে আমার মনে হয়েছে কোন প্রাচীন দেবতার প্রতিকৃতি। বলিভিয়ার লা পাজ থেকে পাঠানো হয়েছে। হঠাৎ এসে হাজির। আমি জানতামই না আসছে। বাক্সের সঙ্গে বিলও নেই। মনে হয় আমার পার্টনার মারফি পাঠিয়েছে। টাকাটা দিয়ে দিয়েছে সে, সে জন্যেই বিলের কাগজ ছিল না। দেখি, সময় করতে পারলেই একটা নোট লিখে জানিয়ে দেব মূর্তিটা পেয়েছি। তাড়াহুড়া নেই। আমেরিকায় আসতে আসতেই নিশ্চয় কয়েক হপ্তা লেগে গেছে, আর কদিন দেরি হলে ক্ষতি হবে না।'

চারপাশে ঘুরে ঘুরে মূর্তিটা দেখছে কিশোর। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের সমান বড়। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। উঁচু কপাল, পাতলা নাক, বড় বড় চোখ। খোদাই করে জ্বলন্ত সূর্যের মত একটা ব্রেস্ট প্লেটও আঁকা হয়েছে বুকে।

'পেছনটা ফাঁপা,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'কেমন আজব না! এরকম জিনিস আর দেখিনি।'

'আমিও না,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'যেন বিশাল একটা মুখোশ। ভেতরে ঢুকলে পুরো শরীর আড়াল করে নেবে।'

'অস্বাভাবিক শুধু এ ব্যাপারটাই নয়,' রহস্যময় কণ্ঠে বললেন কুপার, 'আরও আছে।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল, 'কথা বলতে পারে এটা।'

'ও, মনে আছে তাহলে। দেখবে নাকি?'

'কিভাবে বলে?' আগ্রহে চকচক করে উঠল জিনার চোখ। 'কোন বোতাম-টোতাম টিপতে হয়?'

'না,' মুচকি হেসে বললেন কুপার। 'টেপ রেকর্ডার জাতীয় কোন আধুনিক যন্ত্রও নেই। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। মুসা, তোমার সমানই তো লম্বা। পেছনে গিয়ে দাঁড়াও। যতটা সম্ভব ঘেঁষে দাঁড়াবে। ঠোঁট নিয়ে যাবে ওটার ঠোঁট যেখানে আছে তার পেছনে, ফোকরটাতে।...হ্যাঁ, হয়েছে। এবার কথা বলো। যা ইচ্ছে। আস্তে বলবে, বুঝেছ?'

এসব পুরানো মূর্তিটুর্তির, বিশেষ করে দেবতাদের ব্যাপারে একটা ভয় আছে মুসার। ভূতের ভয়ের মতই অনেকটা। দিনের আলোয় এত লোকের সামনেও ভয় ভয় করতে লাগল তার, তবু মজা করার লোভ সামলাতে পারল না। ফিসফিস করে বলল, 'নতজানু হও সবাই, হাতজোড় করো। আমি বলিভিয়ার দেবতাদের সর্দার বলছি।'

তাজ্জব হয়ে গেল কিশোর, রবিন আর জিনা। বজ্রের মত কণ্ঠস্বর দেবতার। গমগম করে উঠেছে।

মূর্তিটার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে শুঁকছিল রাফি, চমকে উঠে হউ করে এক লাফে পিছিয়ে এল। মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেছে কান, রোম দাঁড়িয়ে গেছে। গোয়েন্দাদের মতই অবাক হয়েছে সে-ও।

চমকে দিতে পেরে মজা পাচ্ছেন কুপার। অবাক হয়ে ওদেরকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে হাসলেন। বললেন, 'তাহলে স্বীকার করছ দেবতার ফুসফুসের সাংঘাতিক জোর? ফোকরটা এক ধরনের মুখোশ, ওর ভেতরে কথা বললে শব্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। অনেকটা মেগাফোনের মত। এর চেয়ে ভাল মেগাফোন এখনকার মানুষও তৈরি করতে পারবে না।'

বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি জিনার। 'কিন্তু কথাগুলো বেরোল কোনখান দিয়ে!'

'এটা শব্দের এক ধরনের বিশেষ ইফেক্ট,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'এই ব্যাপারটা বহুদিন থেকেই জানে মানুষ, প্রাচীন গ্রীসের লোকেরাও জানত। ওরা খুব বিলাসী

ছিল। অনেক নাট্যমঞ্চ ছিল তখন তাদের, সেখানে বিচিত্রানুষ্ঠান হত। অনেক লোক জমায়েত হত বিশাল বিশাল থিয়েটারগুলোতে। সেকালে তো আর লাউডস্পীকার ছিল না। শুধু মুখের কথা সামনে বসা লোকেরা শুনলেও পেছনের লোকেরা শোনে না। তাই কণ্ঠস্বর জোরাল করার জন্যে এক ধরনের মুখোশ ব্যবহার করত তারা।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'আমিও পড়েছি। ওগুলো পরে নিয়ে কথা বললে শব্দ এতটাই বেড়ে যেত, মঞ্চ থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন পেছনের লোকেরা, তারাও শুনতে পেত পরিষ্কার।'

মূর্তির পেছন থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মুসা বলল, 'আমরা এখন লাউডস্পীকার ব্যবহার করি, মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, কিন্তু যত যা-ই বলো, তার মধ্যে একটা যান্ত্রিক ব্যাপার আছে। এই মূর্তিটার মত এত স্বাভাবিক ভাবে শোনাতে পারে না।'

'অ্যানটিক হিসেবে সে জন্যেই দাম বেড়ে যাবে এটার,' কুপার বললেন। 'অনেক অনেক পুরানো জিনিস। ভাল দাম হাঁকতে পারব।'

জিনা গিয়ে দাঁড়াল মূর্তিটার পেছনে। ডাক দিল 'রাফি! রাফি!' বলে।

মুসার মত ফিসফিস করে বলেনি সে। মেঘ ডাকল যেন। প্রচণ্ড শব্দ ছড়িয়ে পড়ল ঘর জুড়ে। কেঁপে উঠল জানালার কাঁচ। আরেকবার চমকাল রাফি। লাফিয়ে উঠল শূন্যে। কেঁউ কেঁউ করে এমন চিৎকার শুরু করল, যেন কেউ তার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে।

হাসতে শুরু করেছে জিনা। হাসি তো নয়, যেন একসঙ্গে ডজনখানেক ঢাক পিটাচ্ছে কেউ। আরও ভয় পেয়ে গেল বেচারা রাফিয়ান। আর ভয় পেলে যা করে তাই করল। আশ্রয়ের জন্যে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল জিনার কাছে, 'ঘাউ! ঘাউ!' করে চেঁচিয়ে যেন বলতে লাগল, 'দোহাই তোমার, আমাকে বাঁচাও! আমার কান শেষ করে দিল!'

হাঁ করে মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কুপার আর তিন গোয়েন্দা। যেন আচমকা কুকুর হয়ে গেছে বলিভিয়ান দেবতাটা। কুকুরের ভাষায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে।

প্রথমে হেসে উঠল মুসা। তারপর রবিন, তারপর কুপার, সব শেষে কিশোর।

ওদিকে যতই চিৎকার করছে রাফি, ততই চিৎকার করছে মূর্তিটাও, একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছে যেন দুজনে।

রাফির এই দুর্দশা দেখে খারাপ লাগল জিনার। বেরিয়ে এল মূর্তির ভেতর থেকে। আতঙ্কিত কুকুরটাকে টেনে সরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'চুপ কর, রাফি! বোকা ছেলে, ও তো তোরই গলা। এত ভয় পাচ্ছিস কেন?'

যেন জিনার কথা বুঝতে পারল কুকুরটা। শান্ত হয়ে এল আস্তে আস্তে। এমনিতে কিছুতেই ভীতু বলা যাবে না রাফিকে, সাংঘাতিক সব বিপদেও ভয়ঙ্কর শত্রুর মোকাবেলা করতে পিছপা হয় না, অথচ মাঝে মাঝে এমন সব হাস্যকর কারণে ভয় পেয়ে যায়, অবাকই লাগে তখন দেখলে। অনেক সময় টিটকারি দিয়ে মুসাকে বলে রবিন, 'তোমার মতই। বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেও আপত্তি নেই,

কিন্তু ভূত দেখলেই কাবু।'

খুব মজা পেয়েছেন কুপার। সবার শেষে হাসি থামল তাঁর। মূর্তিটা সম্পর্কে যা যা জানেন বলতে লাগলেন। তাঁর ধারণা, ইনকাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত এটাকে।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় কয়েকজন কাস্টোমার ঢুকল দোকানে। সোজা এগিয়ে এল মূর্তিটার দিকে। চোখের পলকে ভাবভঙ্গি বদলে গেল কুপারের। পুরো ব্যবসায়ী কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন গোয়েন্দাদের সঙ্গে। যেন ওরা মূর্তি কিনতে আগ্রহী হয়েই এসেছে। কি কি সব সাংঘাতিক গুণাগুণ আছে বলিভিয়ান দেবতার, ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

কুপারের ব্যবসার কাজে বাধা হয়ে থাকতে চাইল না গোয়েন্দারা। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

পরদিন আবার কুপারের দোকানে চলল ওরা। মূর্তিটা বিক্রি হয়েছে কিনা দেখার জন্যে।

পথের মোড়ের কাছে এসেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'খাইছে! দেখো দেখো! মূর্তিটা বাইরে বের করে রেখেছেন কুপার!'

'ঠিকই করেছেন,' জিনা বলল। 'কাস্টোমারের নজরে পড়বে।'

'দাম নিশ্চয় অনেক চান,' রবিন বলল। 'ওরকম একটা অ্যানটিক কিনতে চাইলে অনেক টাকার মালিক হওয়া দরকার।'

'শুধু টাকার মালিক হলেই চলবে না,' মুসা বলল। 'অ্যানটিক পাগলও হওয়া লাগবে। নইলে ওই অকাজের জিনিস আর কে কিনতে যাবে।...আচ্ছা, রবিন, বলিভিয়াতেই কি ইনকাদের রাজত্ব ছিল?'

'হ্যাঁ। এখনকার বলিভিয়া আর পেরুতেই সাম্রাজ্য গড়েছিল ইনকারা। *ইনকা* শব্দটার মানে জানো? রাজা। রাজাকে দেবতার মতই পূজা করত ওরা। আরও অনেক দেবতা ছিল ওদের, অনেক।'

কাঠের মূর্তিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অনেক কৌতূহলী দর্শক। কেউ কেউ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে পেছনে। ফোকরের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলছে। আর অমনি গর্জন করে উঠছে প্রাচীন দেবতা। হাসাহাসি করছে লোকে। আরও অনেককে আগ্রহী আর কৌতূহলী করে টেনে আনছে। বিরাট বিজ্ঞাপন। এটাই চেয়েছিলেন কুপার। আরেকবার স্বীকার করল গোয়েন্দারা, সেলসম্যান হিসেবে লোকটার জুড়ি নেই।

'খুব ভিড় হবে আজ,' দোকানের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'কুপারকে বিরক্ত করাটা উচিত না। চলো, ফিরে যাই। কাল আসব।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল জিনা, 'ঠিকই বলেছ। এই শোনো, মূর্তিটার একটা নাম রাখলে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। 'সব জিনিসেরই নাম থাকে, দেবতার থাকবে না কেন?'

'দেবতার আরও বেশি থাকে। সে জন্যেই তো বলছি। কি নাম রাখা যায়?'

'বকালকাপক।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল জিনা। না, মুসা রসিকতা করছে বলে তো মনে হয় না। 'এটা কি রকম নাম হলো?'

'ঠিকই হলো। একেবারে খাঁটি ইনকা নাম। পেরুভিয়ান নামগুলো ওরকমই হয়।'

'নামটা কিন্তু মন্দ দাওনি,' হেসে বলল রবিন। 'প্রাচীন এক মেক্সিকান বৃষ্টি-দেবতার নাম ছিল টিলালক। সে হিসেবে তোমার নামটাও মানানসই।'

'বাপরে! দেবতার নামের প্রফেসারই হয়ে গেলাম তাহলে? তার মানে ইটালক বিটালক ফুলালক যা বলব তাই নাম হয়ে যাবে?'

'আমরা তো আর ইনকা নই যে বুঝেশুনে রাখব। উচ্চারণ মিলিয়ে একটা কিছু রাখলেই হলো। ডাকতে পারলেই চলবে।'

'বেশ,' হাত ওল্টাল জিনা। 'বকালকাপকই তাহলে রাখা হলো।'

পরদিন এসে কুপারকে দেবতার নাম জানাল ওরা। শুনে তো হেসেই অস্থির অ্যানটিক ডিলার। 'ভাল নাম দিয়েছ হে, সত্যি। দেবতা খুব খুশি হবেন।' বলেই আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

খুব সাড়া জাগিয়েছে বকালকাপক। ট্যুরিস্টরা আগ্রহী হয়ে উঠেছে। দেখতে আসে দেবতাকে, তার ফোকরে মুখ রেখে কথা বলে। রসিকতা করে। রোজই এক ধাপ করে দাম চড়াচ্ছেন কুপার। তার পরেও তাঁর বিশ্বাস, বিক্রি হয়ে যাবেই ওটা।

এভাবে দাম বাড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দারা।

'আসলে,' কুপার বললেন, 'বকালকাপককে এখনই বিক্রি করে ফেলতে চাই না। ওটা একটা বিরাট আকর্ষণ। লোকে দেখতে আসে, অন্য জিনিস কিনে নিয়ে যায়। এমনিতে ওরা হয়তো দোকানেই আসত না। দেবতাকে বিক্রি করতে অসুবিধে হবে না। সীজনের শেষ দিকে বেচব। দেখিই না, কতটা দাম ওঠে।'

পর পর দুদিন আর দোকানে গেল না গোয়েন্দারা। গেল তার পর দিন। এই প্রথম কুপারকে বিষণ্ন দেখল ওরা। দেখে অবাক হলো। এতটাই অস্বাভাবিক লাগল ওদের কাছে, কারণ জিজ্ঞেস না করে পারল না।

শুরুতে কথাই বলতে চাইলেন না অ্যানটিক ডিলার। শেষে যখন বেরিয়ে আসতে গেল গোয়েন্দারা ডেকে ওদেরকে ফেরালেন। বললেন, 'সরি! মনটা বড় খারাপ, বুঝলে। আমি সহজ সরল মানুষ ভাই, সহজ ভাবেই থাকতে চাই। ঝামেলা একদম ভাল লাগে না।'

'কিন্তু হয়েছেটা কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কে আপনাকে ঝামেলায় ফেলল?'

'চিনি না লোকটাকে। বিদেশী। কাল দোকানে এসেছিল। কথায় স্প্যানিশ টান। বকালকাপককে কিনতে চাইল। যখন বললাম, এখন বেচব না, চাপাচাপি শুরু করল। এমন শুরু করে দিল যেন জোর করেই নিয়ে যাবে।'

'খাইছে! কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'কি জানি! বুঝিয়ে বললাম, ওটাকে বিজ্ঞাপনের জন্যে রেখেছি। পরে বেচব। কিন্তু কোন কথাই শুনতে চাইল না। বলল যত দাম বলব তাতেই নেবে।'

'খেপা!' বিড়বিড় করল জিনা।

'তাই,' একমত হলো রবিন। 'অ্যানটিক যারা কেনে, বেশির ভাগই পাগল, দেখেছি আমি। মাথার দোষ না থাকলে এত দাম দিয়ে এসব আলতু-ফালতু জিনিস নিয়ে যায়!'

'এই লোকটাকেও পাগলই মনে হয়েছে আমার,' কুপার বললেন। 'বার বার বলতে লাগল, দাম বলুন দাম বলুন। আপনার যা ইচ্ছে বলুন। বড় বেশি আত্মবিশ্বাস। ওর মনে হয়েছে, টাকায় কি না পাওয়া যায়? চাপাচাপি করতে থাকলে এক সময় না এক সময় বেচতে বাধ্য হব আমি। জোর করেই শেষে দোকান থেকে বের করে দিতে হলো। দোকানে আরও কাস্টোমার ছিল। অনেকেই রেগে গেল আমার ওপর। অপমানটা নিজেদের গায়ে টেনে নিল।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, 'ব্যবসার জন্যে এটা খুব খারাপ। দোকানের বদনাম হয়ে যায়। আর একবার হয়ে গেলে সেটা কাটানো বড় মুশকিল।'

কুপারকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে ছেলেমেয়েরা। তার মন ভাল করার চেষ্টা শুরু করল। কৌতুক বলতে লাগল মুসা। কোন গল্পই গুছিয়ে বলতে পারে না সে। তার কৌতুক বলাটাই আরেকটা কৌতুক। এরপর খুব বেশিক্ষণ আর মুখ গোমড়া করে রাখতে পারলেন না কুপার।

ঘরের এক কোণে একটা স্টোভে সারাক্ষণ চায়ের পানি চাপানো থাকে। চা খুব পছন্দ করেন কুপার। জিনা সেটা জানে। বলল, 'দাঁড়ান, চা বানিয়ে আনি। খাবেন তো?'

'চা খাব না মানে,' ভুরু কোঁচকালেন কুপার, 'কথা হলো নাকি? যাও যাও, জলদি আনো।'

চায়ের কাপ হাতে জিনা ফিরে আসতে আসতে মুখের ভাব পুরোপুরি বদলে গেল কুপারের। হা হা করে হাসছেন তিনি এখন।

হঠাৎ দোকানের ভেতর ঘন্টা বেজে উঠল। লোক ঢুকেছে। কেউ আছে কিনা জানতে চাইছে।

খোলা দরজা দিয়ে দোকানের ভেতরটা দেখা যায়। 'কাস্টোমার এসেছে,' বলে সেদিকে তাকিয়েই যেন বরফের মত জমে গেলেন তিনি। নিচু গলায় প্রায় আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ! সেই লোকটা!'

তিন

'কোন লোক?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সেই লোক! যে কাল বকালকাপককে কিনতে চেয়েছিল!' রাগত কণ্ঠে বললেন কুপার। 'কাল তা-ও অনেক ভাল ব্যবহার করেছি। আজ আর করব না। ঘাড় ধরে বের করে দেব!'

রাগে গটমট করে গিয়ে দোকানে ঢুকলেন তিনি। দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল গোয়েন্দারা। বেশ ধোপদুরস্ত পোশাক পরা একজন লোক

দাঁড়িয়ে আছে দোকানে। লম্বা হালকা-পাতলা শরীর, কালো চুল, সরু গোঁফ, মুখে চওড়া হাসি।

'আবার এলাম বিরক্ত করতে,' চমৎকার ইংরেজি বলে লোকটা, তবে হালকা স্প্যানিশ টান বোঝা যায়। 'মনে হলো আবার আসা উচিত। মূর্তিটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ হবে জিনিসটা। হলঘরে সাজিয়ে রাখবে। এরকম জিনিস অনেক খুঁজেছি আমি। পাইনি।'

'সেটা আপনার ব্যাপার। কিন্তু আমি আপনাকে বলে দিয়েছি এখন ওটা বিক্রি করব না।'

'বিক্রির জন্যেই তো রেখেছেন। কয়েক দিন আগে আর পরে। বিক্রি তো করবেনই, তাই না?'

'করব।'

'কত?'

'দুহাজার ডলার! তবে যখন বেচব তখন।'

চমকে গেল গোয়েন্দারা। ওরকম একটা মূর্তির এত দাম!

ওদেরকে আরও অবাক করে দিয়ে লোকটা বলল, 'আমি আপনাকে এর দ্বিগুণ দেব। এখনই দিন। আমার স্ত্রীকে জন্মদিনে একটা ভাল উপহার দিতে চাই। মূর্তিটা তার খুব পছন্দ হবে।'

'কিন্তু এখন বিক্রি করাটা আমার পছন্দ নয়। আমি যা ঠিক করেছি তাই করব। যত টাকাই দেয়া হোক আমার সিদ্ধান্ত থেকে আমি নড়ব না।'

আরও কয়েক মিনিট কথা কাটাকাটি করলেন দুজনে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আবার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে কুপারের। শেষমেষ গিয়ে দোকানের দরজা টান দিয়ে খুলে মেলে ধরে রাখলেন। 'দুজনেই সময় নষ্ট করছি আমরা। কিছু মনে না করলে এখন যান।'

আর কোন কথা বলল না লোকটা। নীরবে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

দোকানে ঢুকল গোয়েন্দারা। মুখ আবার গোমড়া হয়ে গেছে কুপারের। আরেক কাপ ধূমায়িত চা তাঁর হাতে তুলে দিল জিনা।

খুশি হয়েই কাপটা নিলেন কুপার। 'থ্যাংকস, জিনা।' কাপে চুমুক দিয়ে সবার মুখের দিকে তাকালেন। 'কি জোঁকের জোঁক দেখলে তো! পিত্তি জ্বালিয়ে দেয়! আমার সঙ্গে কেউ মজা করলে একেবারেই সইতে পারি না আমি। চার হাজার দেবে, হুঁহ্! আমিই তো চেয়েছি ডবল। বড় জোর এক হাজার হওয়া উচিত।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। 'মজা করেছে বলে কিন্তু মনে হলো না আমার।'

'আমারও সে রকমই লাগল,' কিশোরের কথায় সায় জানিয়ে বলল রবিন। 'লোকটা সিরিয়াস। দেখলেন না, আপনি দাম হাঁকার পরেও একটি বার দ্বিধা করল না। বরং ডবল দিতে চাইল। টাকা আছে, বোঝা যায়। দিয়ে দিলেই বোধহয় ভাল করতেন।'

মাথা নাড়লেন কুপার। 'তা হয়তো করতাম। এতগুলো টাকা। কিন্তু যতই

।াপাচাপি করছে, সন্দেহ হচ্ছে আমার—এত আগ্রহ কেন?'

এই সন্দেহটা কিশোরের মাথায় আগেই ঢুকেছে। কুপারের মুখ থেকে বেরোনোর পর ঝট করে তাকাল মূর্তিটার দিকে। নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ইনকাদের দেবতাকে।

মুসা বলল, 'হয়তো মূর্তিটার দাম আরও বেশি। সে জন্যেই চার হাজার দিতেও দ্বিধা করেনি লোকটা। এসব অ্যানটিকের দামের তো কোন আগামাথা নেই।'

'জিনিসটা খুব সাধারণ নয় সেটা আমিও জানি,' কুপার বললেন। 'কিন্তু অ্যানটিক চিনি না, এটা বলতে পারবে না। কোনটার কত দাম হওয়া উচিত ভাল করে জানি। এটার জন্যে দুহাজারই অনেক বেশি। অবশ্য এমন কোন বিশেষত্ব যদি থেকে থাকে এটার, যা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি, তো আলাদা কথা।'

মূর্তিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল গোয়েন্দারা।

অবশেষে সরে দাঁড়ালেন কুপার। 'নাহ্, আমি এখন শিওর, আর কোন বিশেষত্ব নেই এটার। ওই লোকটা হয় রসিকতা করতে এসেছিল, নয়ত বদ্ধ উম্মাদ।'

কিশোর কিন্তু এ ব্যাপারে একমত হতে পারল না কুপারের সঙ্গে। তবে বলল না সে কথা।

সেদিনকার মত কুপারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন কেরিআন্টি। সে সব কিনতে চলল। তারপর দুপুর এবং বিকেলটা সৈকতে খেলা করে আর সাঁতার কেটে কাটাবে, ঠিক করাই আছে।

পরদিন সকালে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরোল ওরা। সারাদিন আর বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। সে জন্যে সঙ্গে খাবার নিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে চলে যাবে বহুদূর। যেদিকে খুশি। কোন পরিকল্পনা নেই।

সেদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে জিনা বলল, 'কাল আবার যাব কুপারের দোকানে। মূর্তিটার কি অবস্থা, দেখব।'

'রোজ রোজ গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করছি না তো?' মুসার প্রশ্ন।

'না, তা কেন? বরং আমাদের দেখলে তিনি খুশিই হন।'

'হুঁ,' আনমনে বলল কিশোর। 'তা হন।'

রবিন বলল, 'মূর্তি কিনতে ওই লোকটা আর এসেছিল কিনা খুব জানতে ইচ্ছে করছে আমার।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেরি করে ফেলল ওরা। সুতরাং কুপারের ওখানে যেতেও দেরি হয়ে গেল। দোকানের বাইরে সাইকেল রেখে ঢুকতে যাবে, এই সময় জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ পড়ল মুসার। বলল, 'কাস্টোমার আছে। কুপার কথা বলছেন। বাইরেই দাঁড়াই আমরা। কাস্টোমার বেরোলে তারপর ঢুকব।'

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে জিনা বলল, 'আবার বিরক্ত মনে হচ্ছে কুপারকে।

কাস্টোমারের সঙ্গে আলোচনাটা বোধহয় সুবিধের হচ্ছে না।'

দোকানের দরজা ফাঁক হয়ে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেল কিশোর। ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল। লম্বা, বিশালদেহী একজন লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছেন কুপার। খসখসে রুক্ষ চেহারা আগন্তুকের। গায়ে টকটকে লাল রঙের চেক শার্ট। ওয়াইল্ড ওয়েস্টের কাউবয়দের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। 'খাইছে! পেশী দেখেছ? কাঁধটা তো ষাঁড়ের কাঁধের মত। কাউবয় ছবিতে অভিনয় করতে গেলেই চান্স পেয়ে যাবে।...কুপার মনে হয় আবার রেগে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

জবাব দিল না কিশোর। চুপচাপ দেখতে লাগল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল কাউবয়। গটমট করে হেঁটে আসতে লাগল দরজার দিকে। একলাফে সেখান থেকে সরে চলে এল কিশোর আর মুসা।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। চেঁচিয়ে বলল, 'ভালমত বললাম তো, বেচলেন না! দেখব ওই মূর্তি আপনি কি করে রাখেন!'

'যান, দেখেন গিয়ে!' সমান তেজে জবাব দিলেন কুপার। 'আমার জিনিস আমি বেচব না, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আর কোন কথা নেই।'

বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে রাগত ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কাউবয়। ফিরেও তাকাল না ছেলেমেয়েদের দিকে। সোজা হেঁটে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে এসে ওদেরকে দেখে ফেললেন কুপার। 'আরি, তোমরা। এসো। বকালকাপক বড় বেশি মশহুর হয়ে গেছে, বুঝলে। ওই ষাঁড়টাও এসেছিল কিনতে। কত অফার করেছে জানো? কল্পনাই করতে পারবে না। ছয় হাজার! অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি!'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'আসলেই অদ্ভুত! স্ত্রীকে জন্মদিনের উপহার দেয়ার জন্যে নিশ্চয় খেপে গেছেন স্প্যানিশ ভদ্রলোক। যত টাকাই লাগুক, কিনবেনই।'

মুসা বলল, 'কাউবয়টা স্প্যানিশ নয়...'

'কিন্তু প্রথম লোকটাই পাঠিয়েছে তাকে, আমি শিওর।'

'আমিও,' কিশোরের সঙ্গে একমত হলেন কুপার। 'নিজে এসে যখন পারেনি, অন্যকে পাঠিয়েছে। ভেবেছে, তার ওপর কোন কারণে আমি বিরক্ত, সে জন্যে বেচতে চাইছি না। অন্য লোকের কাছে বেচব। ভুল করেছে সে। আমার এক কথা...' দাঁতে দাঁত চাপতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি। 'এই দেখো, আবার মেজাজ খারাপ করে ফেলছিলাম। নাহ্, ব্যাটারা আর ভাল থাকতে দেবে না আমাকে। জ্বালিয়ে খেল। মারফিই ভাল আছে। এসব যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয় না।...ও যদি শোনে, এত টাকার অফার আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। রেগে আগুন হয়ে যাবে।'

উদ্বেগ এবং উত্তেজনা, দুটোই একসঙ্গে অনুভব করল কিশোর। উদ্বেগ কুপারের জন্যে। দুই দুইজন লোক মূর্তিটা কেনার জন্যে চাপাচাপি করল। একজন তো হুমকিই দিয়ে গেল। আর উত্তেজনা নিজেদের জন্যে। তার মন বলছে, আরেকটা কেস পেতে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

বকালকাপককে ঘিরে ঘুরছে আর ওটাকে শুঁকছে রাফি। সেদিকে তাকিয়ে হেসে বললেন কুপার, 'রাফিও যেন সন্দেহ করে ফেলেছে, রহস্যময় কিছু আছে মূর্তিটাতে। শুরুতে বেচব কি বেচব না যা-ও বা একটু দ্বিধা ছিল, এখন তা-ও নেই। মারফিকে খবর দেব একজন এক্সপার্ট পাঠাতে। মূর্তিটা এসে পরীক্ষা করে দেখে যাবে। এত আগ্রহ যখন লোকগুলোর, নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। সেটা জানা দরকার।'

'মিস্টার কুপার,' রবিন বলল, 'আপনার জায়গায় আমি হলে কিন্তু এরপর আর মূর্তিটাকে বাইরে রাখতাম না।'

আবার হাসলেন কুপার। 'চুরি হওয়ার ভয় করছ তো? হবে না। এত ছোট নয় জিনিসটা যে চোর এসে পকেটে ভরে নিয়ে চলে যাবে।'

কুপারের কথায় সবাই আশ্বস্ত হলেও কিশোর হতে পারল না। চিন্তিতই হয়ে রইল সে। আরেকটা কথা মনে হচ্ছে তার, কোন অ্যানটিক বিশেষজ্ঞই মূর্তিটার রহস্য ভেদ করতে পারবেন না। কারণ আর কোন বিশেষত্বই নেই ওটার। একটা জিনিস থাকতে পারে, গুপ্ত কিছু। নিশ্চয় সেটা দামী কোন জিনিস।

সেদিন বিকেলে গোবেল ভিলার বাগানে বসে সন্দেহের কথাটা বন্ধুদের জানাল সে, 'আমার বিশ্বাস, মূর্তিটার কোন রহস্য আছে। দুই দুইজন লোক এসে অবিশ্বাস্য অফার দিয়ে গেল। এটা রসিকতা হতেই পারে না।'

'আমারও তাই ধারণা,' রবিন বলল।

'আমারও,' বলল মুসা।

'আমারও,' জিনাও একমত।

কি জানি কি মনে হলো রাফির, সে-ও বলল, 'হউ! হউ!'

কিশোর বলল, 'এখন থেকে চোখকান খোলা রেখে চলতে হবে আমাদের। শীঘ্রিই অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে অবাক হব না আমি। কুপার আমাদের সাহায্য চাইবেনই। তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

'ঠিক বলেছ,' প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল অন্য তিনজন।

'হউ! হউ!' আরেকবার বলল রাফিয়ান।

বুধবারে গোবেল বীচের হাটের দিন। সেই গ্রাম এবং তার আশপাশের গ্রামগুলো থেকে লোক আসে বাজার-হাট করতে। গ্রীষ্মের এই সময়টায় ভিড় খুব বেশি হয়, কারণ ট্যুরিস্টরা থাকে। তারা স্যুভনির আর নানা রকম জিনিস কিনতে বাজারে আসে। হাটের দিনে বাজারে যেতে তিন গোয়েন্দারও খুব ভাল লাগে। অস্থায়ী দোকানগুলোর সামনে ঘুরঘুর করে ওরা, নানা পণ্য দেখে। মাঝে মাঝে কেনেও। এই বুধবারে কেরিআন্টির জন্যে চমৎকার একটা ফুলের তোড়া কিনল মুসা। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে রবিন কিনল কিছু পুরানো বই। কিশোর একটা ছোট্ট ছুরি কিনল। জিনা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল একটা গরুর সামনে। ওটা নিয়ে দরাদরি হচ্ছে বিক্রেতা আর কয়েকজন কাস্টোমারের মধ্যে। খুব ইনটারেস্টিং কথাবার্তা।

বাজারে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা চা দোকানে এসে বসল ওরা। ভেতরে

ঢুকল না, বসল চত্বরে বসানো বড় একটা ছাতার নিচে পাতা চেয়ারে। সুস্বাদু স্ট্রবেরি আইসক্রীম খেতে লাগল।

যেখানে বসেছে সেখান থেকে কুপারের অ্যানটিক শপটা দেখতে পাচ্ছে। অনেক ক্রেতা ঢুকছে বেরোচ্ছে। ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল হাটের মানুষ। একটা সময় এতটাই পাতলা হয়ে গেল এক এক করে দোকান বন্ধ করে দিতে আরম্ভ করল অস্থায়ী কিছু দোকানি। তাদের বাড়ি বেশ দূরে, সন্ধ্যার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হলে এখনই রওনা হতে হবে।

কুপারের দোকানেও আর কাস্টোমার ঢুকতে দেখা গেল না। আইসক্রীমের দাম চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল গোয়েন্দারা। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলল। দরজার বাইরে সেই আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে বকালকাপক।

ছেলেমেয়েরা দোকানে ঢোকামাত্রই টেলিফোন বেজে উঠল। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন কুপার, দাঁড়াতে ইশারা করে ফোন ধরতে গেলেন। সেটটা রাখা আছে কাউন্টারের একধারে। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বললেন, 'হালো!...আমি কুপার...'

তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। দেখতে পাচ্ছে, ওপাশের কথা শুনতে শুনতে একটা ছায়া পড়ল অ্যানটিক ডিলারের মুখে।

'কি বলছেন!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'আমি গাড়ি চাপা দিয়েছি! মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনাদের!...আমি যাইইনি তখন ওখানে।...হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যালিবাই আছে, নিশ্চয়! সাক্ষিও হাজির করতে পারব। কাল তো আমি গ্যারেজ থেকেই ভ্যান বের করিনি, চাপা দিলাম কি ভাবে?'

কান খাড়া করে ফেলেছে সবাই। তাকিয়ে আছে কুপারের মুখের দিকে।

আরও মিনিটখানেক রিসিভার কানে চেপে ধরে রেখে ওপাশের কথা শুনলেন তিনি। তারপর বললেন, 'না না, আসতে অসুবিধে কি? দোকানটা বন্ধ করেই চলে আসছি।'

রিসিভার রেখে দিলেন কুপার। ঘাম ফুটেছে কপালে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে তাকালেন গোয়েন্দাদের দিকে। কি হয়েছে জানার জন্যে উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা।

জানালেন কুপার। সিক্স জুলাই লেনে নাকি আগের দিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে একটা বাচ্চাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে একজন ভ্যান ড্রাইভার। শেরিফের লোকের ধারণা, কাজটা কুপারই করেছেন। তাঁকে থানায় গিয়ে দেখা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্যই যাবেন তিনি।

কিশোররাও বিশ্বাস করে না, কুপার এমন একটা কাজ করতে পারেন। নিশ্চয় সাংঘাতিক কোন ভুল হয়ে গেছে।

দেখা করতে যাবেন, কিন্তু থানাটা কোথায় জানা নেই কুপারের। এই এলাকায় এসেছেন, বেশিদিন হয়নি। তাছাড়া থানাটা আগে যে বিল্ডিঙে ছিল, সেখানে নেই এখন। সরিয়ে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দিল জিনা।

মাথা চুলকালেন কুপার। একটু দ্বিধা করে বললেন, 'আরেকটা উপকার চাই আমি তোমাদের কাছে। আজ হাটের দিন। কাস্টোমার আসা এত সকালে বন্ধ হবে না। তোমাদের কেউ একজন কি দোকানে থাকতে পারবে? কেউ এলে বসতে বলবে তাকে। আমি ততক্ষণে গিয়ে থানায় দেখা করে আসতে পারি।'

'নিশ্চয় পারব,' দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। টেলিফোনের ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুলেছে তাকে। সত্যিই কি ঘটেছে জানা দরকার। ভাবছে, মূর্তিটার সঙ্গে এই রহস্যময় ফোনের কোন সম্পর্ক নেই তো? ভেবে নিয়ে বলল, 'চলুন, আমরা সবাই যাই। রাফিকে নিয়ে মুসা থাক এখানে। ওরা দুজনই দোকান পাহারা দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

প্রস্তাবটা প্রায় লুকে নিলেন কুপার। জিনা, কিশোর আর রবিনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

চার

দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে কুপারের স্টেশন ওয়াগনটাকে চলে যেতে দেখল মুসা। পাশে দাঁড়ানো রাফির মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে বলল, 'আমাদেরকে দোকান পাহারা দিতে রেখে গেল, বুঝলি। পাহারাটা আসলে দিতে হবে বকালকাপককে। পারবি না?'

'হউ!' করে বোধহয় *পারবই* বোঝাল রাফি।

একজন কাস্টোমার আসতে দেখা গেল। দেখামাত্র লোকটাকে চিনতে পারল মুসা। সেই কালোচুল বিদেশী, যার কথায় স্প্যানিশ টান, মূর্তিটাকে প্রথম কিনতে এসেছিল। কেন যেন মনে হতে লাগল তার, লোকটা স্প্যানিশ নয়, দক্ষিণ আমেরিকান। বকালকাপকের বাড়ি যে দেশে, সে দেশে। মুসাকে দেখতেই পেল না। চোখ সর্বক্ষণ রয়েছে মূর্তিটার ওপর।

'গুড আফটারনুন, স্যার,' ভদ্রকণ্ঠে বলল মুসা। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি? মিস্টার কুপার একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবেন। আসুন না, দোকানে আসুন। বসুন। তিনি চলে আসবেন।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর হাসল। জবাব দিল, 'গুড আফটারনুন। হ্যাঁ, দোকানে ঢুকতেই এসেছি। উইণ্ডোতে সাজানো ওই যে ব্রোচগুলো দেখব। জিনিসগুলো বেশ ইনটারেসটিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

খুশি হলো মুসা। জিনিসগুলো মোটামুটি দামী। বিক্রি করতে পারলে মন্দ হয় না। খুশি হবেন কুপার। তবে আরেকটা ব্যাপারে কিছুটা হতাশই হলো। বকালকাপকের কথা বলল না লোকটা। বিরক্ত হয়ে গিয়ে ওটা কেনার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে বোধহয়।

'নিশ্চয়, স্যার, আসুন,' ডাকল মুসা। উইণ্ডো থেকে রূপার তৈরি ব্রোচের বাক্সটা নামিয়ে এনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে নিন, দেখুন।'

ব্রোচগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ বাক্স থেকে একটা ব্রোচ বের করে নিল

লোকটা। 'এই যে এটা কিনতে চাই।'

'পাঁচ ডলার,' আন্দাজেই বলে দিল মুসা। ইচ্ছে করে অনেক বেশি বলেছে। দাম জানা থাকলে লোকটা ঠিকই প্রতিবাদ করবে। তখন দরকার হলে কমাবে।

'ফাইন।' পকেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট বের করে দিয়ে লোকটা বলল, 'নাও।'

'ভাঙতি নেই?'

'না। এর চেয়ে ছোট কিছুই নেই।'

মুসার পকেটেও নেই। ক্যাশ বাক্সে তালা দিয়ে গেছেন কুপার, মুসাই বলেছে দিয়ে যেতে। তবে অসুবিধে হবে না। বাজারের অন্য দোকান থেকে ভাঙিয়ে আনা যাবে। রাফি আছে। ততক্ষণ সে দোকান পাহারা দিতে পারবে। লোকটাকে বলল, 'দাঁড়ান একটু। টাকাটা ভাঙিয়ে নিয়ে আসি।...রাফি, তুই থাক।'

লোকটা বলল, 'আমি বাইরেই দাঁড়াচ্ছি।'

বেরিয়ে গেল লোকটা।

মুসাও বেরিয়ে কাঁচের দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

নোটটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল সে। বাজারের মাঝখানটায় যেখানে দোকান সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা, সেখানে এসে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ মাথায় এসেছে কথাটা। লোকটার এই ব্রৌচ কেনার মধ্যে কোন ঘাপলা নেই তো! ইচ্ছে করেই হয়তো দিয়েছে বড় নোট, যাতে ভাঙাতে যেতে হয় মুসাকে। এই সুযোগে কিছু একটা করে বসবে সে! বকালকাপককে চুরি করার সিদ্ধান্ত নেয়নি তো?

কিন্তু মূর্তিটা বেজায় ভারি। একজনের পক্ষে বয়ে নেয়া অসম্ভব। স্বস্তি পাচ্ছে না মুসা। খুঁতখুঁত করছে মন। এভাবে লোকটাকে একা রেখে আসা উচিত হয়নি। আরেকটা ভাবনা এল মাথায়। চলেই যখন এসেছে, একটা সুযোগও পাওয়া গেছে। লুকিয়ে থেকে লোকটা কি করে, দেখাই যাক না।

ফিরে চলল সে। একটা ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে আনা হয়েছে টবে জন্মানো নানা রকম গাছ। ওটার আড়ালে এসে দাঁড়াল। অ্যানটিক শপ থেকে কেউ চোখ রাখলেও তাকে দেখতে পাবে না এখানে।

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। এদিকেই তাকিয়ে আছে। আরও প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড একই ভাবে তাকিয়ে রইল। মুসার মনে হতে লাগল, নাহ্, ভুল করেছে। কোন দুষ্টবুদ্ধি নেই লোকটার মনে। টাকার জন্যেই অপেক্ষা করছে। আবার টাকা ভাঙাতে যাবে কিনা ভাবছে মুসা, এই সময় নড়ে উঠল লোকটা। দোকানের সামনের চত্বর থেকে খানিকটা সরে গিয়ে উল্টোদিকে তাকিয়ে জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগল। লোকটার কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটাকে দেখতে পেল মুসা।

ট্রাকটাকে আগেও দেখেছে সে, আরও কয়েকটা গাড়ি ছিল তখন আশেপাশে। এখন নেই। ধূসর রঙের অতি সাধারণ একটা ট্রাক। নতুনও না, আবার বেশি পুরানোও না। নাম্বার প্লেটটাতে এত ময়লা লেগে আছে, নম্বর পড়া যায় না। চট করে চোখে পড়ার মত গাড়ি নয়।

লোকটা হাত নাড়তেই চলতে শুরু করল ওটা। ঘ্যাঁচ করে এসে থামল কুপারের দোকানের সামনে, একেবারে মূর্তিটার কাছে। লাফিয়ে নামল ড্রাইভার। 'খাইছে!' বলে ছোট্ট একটা চিৎকার প্রায় বেরিয়ে চলে এসেছিল মুসার মুখে, চেপে ফেলল। সেই লোকটা! বিশালদেহী, লাল চেক শার্ট পরা কাউবয়। তার মানে ঠিকই সন্দেহ করেছিল। কালোচুলের সঙ্গীই কাউবয় লোকটা। বকালকাপকের আশা এখনও ছাড়েনি। বড় নোট দিয়ে কায়দা করে মুসাকে সরিয়ে দিয়েছে মূর্তিটাকে চুরি করার জন্যেই। ঠেকাতে হবে! ভাবছে সে। যে করেই হোক ঠেকাতে হবে লোকগুলোকে। মূর্তিটাকে নিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না কিছুতেই।

ঝট করে সোজা হয়েই দৌড় দিল মুসা। দুজনে মিলে ধরে ততক্ষণে মূর্তিটাকে বয়ে নিতে আরম্ভ করে দিয়েছে লোকগুলো। ট্রাকের পেছনে তুলবে। টেলবোর্ড নামানো দেখেই বুঝতে পারল সে। চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। মুঠোবদ্ধ হয়ে গেছে হাত।

'রাফিটা কি করছে!' অবাক হয়ে ভাবছে মুসা। 'কিছু বলে না কেন!'

দোকানের দিকে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিল মুসা। আর কোন দিকে নজর ছিল না। সে জন্যেই ছোট ঠেলাগাড়িটাকে চোখে পড়েনি। আপেল ভর্তি গাড়িটাতে পা লেগে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল সে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, আশেপাশে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে আপেল। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল আপেল বিক্রেতা মহিলা। 'এই ছেলে, দেখো না! দেখতে পাও না! চোখের মাথা খেয়েছ নাকি!'

উঠে দাঁড়াল মুসা। হাঁটু ডলতে লাগল, 'সরি…দেখতে পাইনি!…মাপ করবেন…'

মুসার বিমূঢ় অবস্থা দেখে বোধহয় দয়া হলো মহিলার। নরম হলো কিছুটা। বলল, 'ঠিক আছে, যাও। আপেলগুলো এখনও তেমন পাকেনি। নইলে সব নষ্ট হয়ে যেত। যাও।'

অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছে ভেবে ভয় পেয়ে গেল মুসা। মহিলাকে একটা আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আবার ছুটল দোকানের দিকে। তবে অনেক দেরি করে ফেলেছে। মূর্তিটা তোলা হয়ে গেছে ট্রাকের পেছনে। আবার ড্রাইভারের আসনে উঠে বসেছে কাউবয়। তার পাশে বসেছে কালোচুল। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল ট্রাকের।

ধড়াস ধড়াস করছে মুসার বুকের মধ্যে। অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও। ভাবছে, এ হতে পারে না! কিছুতেই না! তার সামনে থেকে এভাবে মূর্তিটা নিয়ে চলে যাবে…

দোকানের সামনে পৌঁছল অবশেষে। রাফি নিশ্চয় আন্দাজ করে ফেলেছে, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কাঁচের দরজার ওপাশে লাফালাফি আর চিৎকার করছে সে। কেন বেরিয়ে লোকটাকে কিছু করেনি বুঝতে অসুবিধে হলো না আর মুসার। নিশ্চয় দরজার লকটা লাগিয়ে দিয়েছে কালোচুল।

তালা খুলে রাফিকে বের করার সময় নেই। যা করার এক্ষুণি করতে হবে।

চলতে শুরু করল ট্রাক। একটা মুহূর্ত কেবল দ্বিধা করল মুসা। তারপর ছুটে গিয়ে দুই হাতে আঁকড়ে ধরল টেলবোর্ডের কিনারা। প্রায় ঝুলতে ঝুলতে দৌড় দিল

ট্রাকের সঙ্গে। গতি বাড়ছে। আর দৌড়ানো যাবে না। যা থাকে কপালে ভেবে এক দোল দিয়ে শরীরটাকে টেনে তুলে নিল ওপরে। মোড় নিচ্ছে ট্রাক। সামলাতে পারল না সে। কাত হয়ে পড়ে গেল। এক গড়ান দিয়ে সোজা হলো আবার। গতি বেড়েছে গাড়ির। মোড় পার হয়ে এসেছে। ছুটতে শুরু করল তীব্র গতিতে।

মেঝেতে শুয়ে হাঁপাতে লাগল সে। লোকটার চালাকিতে বোকার মত ধরা দিয়েছে বলে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। আরও রাগ হচ্ছে আপেলের গাড়িটা দেখতে পায়নি বলে। ওটাতে বেধে না পড়লে এতটা দেরি হত না, সময়মত পৌঁছে ঠেকাতে পারত লোকগুলোকে। রাফিকে দোকানে না রেখে বাইরে রাখলেও অনেক উপকার হত।

একটাই সান্ত্বনা এখন, বকালকাপককে একেবারে হাতছাড়া করেনি। ওটার পাশেই শুয়ে আছে এখন। কিন্তু তাতে কি সুবিধেটা হবে? দুজন লোকের বিরুদ্ধে সে একা কিছুই করতে পারবে না। এরকম একটা বিপদ যে হবে কল্পনাই করেনি সে। তবে এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। মূর্তিটাকে কি করে বাঁচাবে সে কথা ভাবা দরকার।

কি করবে? এত ভারি মূর্তি সে একা বয়ে নিতে পারবে না। একটা কাজই করার আছে, লোকগুলোর সঙ্গে গিয়ে ওদের আস্তানাটা দেখে আসা। তারপর ফিরে গিয়ে পুলিশকে জানিয়ে দলবল নিয়ে ফিরে আসা। ততক্ষণে যদি অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয় বকালকাপককে, তাহলে উদ্ধারের আশা শেষ।

সেটা তো পরের কথা, এখন নিরাপদে আস্তানাটা দেখে ফিরতে পারাটাই আসল কথা। পারবে তো? না তার আগেই ধরা পড়ে যাবে? দেখা যাক কি হয়।

জিরিয়ে নিয়েছে। আশপাশে চোখ বোলাল এখন মুসা। ড্রাইভারের কেবিন আর ট্রাকের পেছনের অংশের মাঝে শুধু একটা তেরপলের বেড়া। লোকগুলো যদি ওটা তুলে পেছনে না তাকায় তাহলে দেখতে পাবে না। জানবে না, ওদের অজান্তে আরও একজন যাত্রী চলেছে গাড়িতে। কিন্তু যদি কোন কারণে তুলে দেখে?

আরেকটা তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বকালকাপককে। ওটার নিচে ঢুকে গেলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। থাকতে অবশ্য খুব অসুবিধে হবে ওখানে। কিন্তু কি আর করা? ধরা পড়ার চেয়ে অসুবিধে ভোগ করা ভাল।

তারপরেও কথা থাকে। গাড়ি যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ নাহয় ওদের চোখ এড়িয়ে থাকা গেল। কিন্তু আস্তানায় পৌঁছে যখন মূর্তিটাকে নামাতে আসবে তখন লুকাবে কোথায়? ওরা যদি কেবিন থেকে নেমে ঘুরে আসে, তাহলে চুপ করে তেরপল তুলে গিয়ে কেবিনে সীটের ওপর শুয়ে পড়তে পারবে, কিন্তু যদি ঘুরে না আসে? দূর, যা হয় হবে!—ভেবে মন থেকে দূর করে দিতে চাইল ভাবনাগুলো।

কিন্তু ভাবনা কি আর যায়। ভাল বেকায়দাতে পড়েছে, বুঝতে পারছে। অনেকটা ভাগ্যের হাতেই সব কিছু ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর উপায় নেই এখন।

রাস্তা খুব খারাপ এখানে। ভীষণ ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে গাড়ি। মেঝেতে শুয়ে থাকাই কঠিন।

হঠাৎ করে থেমে গেল ঝাঁকুনি। তেরপলের নিচ থেকে সাবধানে মাথা বের করে উঁকি দিয়ে দেখল সে, আবার ভাল রাস্তায় পড়েছে গাড়ি। মসৃণ গতিতে চলেছে। মনে হচ্ছে মেইন রোডে পড়েছে।

কথা বলতে শুরু করল লোকগুলো। এতক্ষণ একেবারে চুপ করে ছিল। কান খাড়া করল মুসা।

'কেমন বুঝলে, হ্যারি? যে ভাবে প্ল্যান করেছিলাম ঠিক সে ভাবেই হলো তো সব কিছু? আমাকে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

কালো চুলওয়ালা লোকটার কণ্ঠস্বর চিনতে পারল মুসা। আরেকটা কথা জানল, কাউবয়ের নাম হ্যারি।

'আমাদের কপাল ভাল, ছেলেটাও রামছাগল, সে জন্যেই কাজটা হয়ে গেল,' বলল হ্যারি। 'তবে ফসকানোর সম্ভাবনাই বেশি ছিল। তোমার কথামত পাবলিক বুদ থেকে কুপারকে ফোন তো করলাম। ভেবেছি, দোকান বন্ধ করে যাবে। কথা শুনে তো মনে হলো ভয়ে প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছে। বন্ধ করেই যেত, কিন্তু গোলমালটা করল ছেলেমেয়েগুলো। কুত্তাসহ ছেলেটাকে দোকানে থাকতে দেখে তো হালই ছেড়ে দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আজ আর নিতে পারব না মূর্তিটা।'

'কিন্তু পারলাম তো। কি ঘটতে পারত সে সব আর ভাবতে যাই কেন এখন?'

'না, এমনি বলছি আরকি। প্ল্যানটা ফেল করতে পারত। ধরো, ছেলেটার কাছে যদি টাকার ভাঙতি থাকত, তাহলেই তো…'

জোরে দুলে উঠল ট্রাক। গাল দিয়ে উঠল হ্যারি। সামনে একটা শুয়োর পড়েছিল। রাস্তার ধারে ছিল ওটা। ট্রাকটাকে আসতে দেখেই যেন হঠাৎ করে ওটার মনে হলো রাস্তা পেরোনো দরকার। সোজা গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড় দিল। ওটাকে বাঁচাতেই স্টিয়ারিং কেটেছে সে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ থাকার পর আবার কথা শুরু করল দুজনে। যা যা করে এসেছে সে সবই আলোচনা করছে। নতুন কিছুই জানতে পারল না মুসা, কেবল দুটো নাম ছাড়া। দ্বিতীয় লোকটার নাম জন। ওদের বসের নাম ডোনাই। নামটা বিদেশী বলে মনে হলো মুসার।

তারমানে একটা অপরাধী দল আছে, যাদের নেতার নাম ডোনাই। চুরি-ডাকাতিই বোধহয় ওদের কাজ। এই যেমন বকালকাপককে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাচীন একটা কাঠের মূর্তি দিয়ে কি করবে লোকটা? এমন কি দামী জিনিস এটা?

আধ ঘণ্টা ধরে একটানা চলেছে ট্রাক। একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে শরীরের নানা জায়গায় ঝিঁঝি ধরে গেছে মুসার। চোখ জড়িয়ে আসছে।

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, জোরে কথা শুনে টুটে গেল, 'ইস্, গরমও পড়েছে আজ! গলাটা শুকিয়ে কাঠ!'

'আমারও,' হ্যারি বলল। 'একটা কোকটোক হলে মন্দ হত না।'

'কোক্ চলবে না। ঠাণ্ডা বিয়ার। সামনের কফি শপটাতেই পাওয়া যাবে। ওখান থেকে বসকেও টেলিফোন করতে পারব। কাজটা যে হয়ে গেছে তাকে জানানো দরকার।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে ব্রেক করল হ্যারি।

তেরপলের নিচে গুটিসুটি হয়ে গেল মুসা, যদি দেখতে আসে লোকগুলো? প্রার্থনা করতে লাগল, খোদা, ওরা যেন বকালকাপক কেমন আছে দেখতে না আসে!

কেবিন থেকে নামতে শুনল দুজনকে। দেখতে এলে ঘুরেই আসবে। শুয়ে থাকার ঝুঁকি নিল না মুসা। নিঃশব্দে তেরপলের নিচ থেকে বেরিয়ে পিছনে গিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সামনের সীটে।

কিন্তু অযথাই কষ্ট করেছে। মূর্তিটাকে দেখতে গেল না লোকগুলো। ওদের জুতোর শব্দ দূরে চলে যাচ্ছে। পিপাসা বেশিই পেয়েছে ওদের।

পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর সাবধানে মাথা তুলল সে। জানালা দিয়ে দেখল, সামনের একটা বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। বাড়ির সামনে অনেক গাছপালা। একটি বারের জন্যেও পেছনে না তাকিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল দুজনে।

ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। কাজে লাগাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি করে লাগাবে? নেবে কি করে মূর্তিটাকে?

বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে।

পাঁচ

'এক কাজ করা যায়,' ভাবছে মুসা, 'মূর্তিটাকে ঠেলে নিচে ফেলে তেরপল দিয়ে ঢেকে তার নিচে লুকিয়ে থাকতে পারি। দুটোর যে কোন একটা ব্যাপার ঘটবে তখন। হয় লোকগুলো দেখে ফেলবে। মূর্তিটাকে আবার ট্রাকে তুলে নেবে। আমিও ধরা পড়ব। আর না দেখলে ফেলে রেখেই চলে যাবে। ফিফটি ফিফটি চান্স। দেখে ফেলতেও পারে, না-ও পারে। নাহ্, এই বুদ্ধিতে হবে না।'

আরেকটা কথা ভাবল সে, 'কফি শপটায় গিয়ে ঢুকতে পারি। দোকানের মালিক আর কাস্টোমারদের সামনে হ্যারি আর জনকে দেখিয়ে চোর চোর বলে চেঁচাতে পারি। কিন্তু যদি বিশ্বাস না করে? নাহ্, এভাবেও হবে না। আরও ভাল কোন বুদ্ধি করা দরকার, যেটা ব্যর্থ হবে না।'

কি করবে? কফি শপে গিয়ে চেঁচালে আরও একটা অসুবিধে আছে। লোকে যদি বিশ্বাস করেও, করবে সবটা শোনার পর। তার আগেই যদি দৌড়ে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়···

সময় বয়ে যাচ্ছে। কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না মুসা। যে কোন মুহূর্তে এখন ফিরে আসতে পারে দুই চোর। তাহলে সুযোগটা হারাতে হবে।

তাই তো! যদি গাড়ি নিয়ে পালানো যায়! ঝট করে চিন্তাটা মাথায় এল মুসার। এই তো পাওয়া গেছে বুদ্ধি!

উত্তেজনায় গোল গোল হয়ে গেল তার চোখ। মূর্তিটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মিস্টার দেবতা, পালিয়েই যাই আমরা, কি বলো? তাড়াহুড়ো করতে পারলে পালাতে পারব, কি মনে হয় তোমার?'

বলতে বলতেই স্টিয়ারিঙের নিচে বসে পড়ল সে। ড্যাশবোর্ডেই আছে

ইগনিশন কী-টা। আবার বলতে লাগল, 'মিস্টার বকালকা, তোমাকে বাঁচানোর এছাড়া আর কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এত ভারি শরীর তোমার, কিছুতেই বয়ে নিতে পারব না। কাজেই ট্রাকের সাহায্য নিতেই হচ্ছে আমাকে।'

ইদানীং গাড়ি চালানো শিখছে মুসা। কার হলে মোটামুটি ভালই পারত, কিন্তু ট্রাকের মত একটা ভারি গাড়ি চালাতে পারবে কিনা জানে না সে। তার যা বয়েস, তাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে না। তবু স্যালভিজ ইয়ার্ডের দুই সহকারী বোরিস আর রোভারকে অনুরোধ করে করে শিখে নিচ্ছে গাড়ি চালানো, পরে যখন সময় হবে সহজেই যাতে লাইসেন্স নিয়ে নিতে পারে। ইয়ার্ডের ঝরঝরে পিকআপটা দুদিন চালিয়েছে, পাশে বসে ছিল বোরিস। ব্যস, ওই পর্যন্তই ট্রাক চালানোর জ্ঞান। এখন কতটা কি পারবে বুঝতে পারছে না। তবু চেষ্টা করে দেখবে। কোনমতে কাছের পুলিশ ফাঁড়িতে গাড়িটা নিয়ে যেতে পারলেই হয়।

ইগনিশন কী-র দিকে হাত বাড়াল সে। হাত কাঁপছে। দ্বিধা করল একবার। একহাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরে আরেক হাতে মোচড় দিল চাবিতে। একই সঙ্গে পা দিয়ে চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। ইঞ্জিনের অবস্থা বেশ ভাল। প্রথম চেষ্টাতেই স্টার্ট হয়ে গেল।

বাঁ পা দিয়ে ক্লাচ খুঁজতে লাগল। মনে হলো, ওটা নেই ওখানে, পাবেই না। কিন্তু পাওয়া গেল অবশেষে। ওটা চেপে ধরে ফার্স্ট গিয়ার দিল। গাড়ি চালানোর এই অংশটুকু সহজ। এইবার আসছে কঠিন অংশ।

অ্যাক্সিলারেটরে ডান পায়ের চাপ বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগল ক্লাচ।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল গাড়িটার পুরো শরীর। মুসার দেহও কাঁপতে লাগল। কয়েকবার হেঁচকি তুলে বন্ধ হয়ে যেতে চাইল ইঞ্জিন, কিন্তু হলো না শেষ পর্যন্ত।

দাঁতে দাঁত চেপে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে রইল সে। চলতে শুরু করেছে ট্রাক।

গিয়ার বদল করে অ্যাক্সিলারেটরে আরেকটু বাড়াল পায়ের চাপ।

গতি আরও বাড়ল গাড়ির। স্টিয়ারিং স্থির রাখতে পারছে না কিছুতেই। একবার এদিকে ঘুরে যাচ্ছে গাড়ির নাক, একবার ওদিক, যেন মাতাল হয়ে গেছে।

দুশো গজও যায়নি, পেছনে শোরগোল শোনা গেল। নিশ্চয় হ্যারি আর জন বেরিয়ে এসেছে। গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করছে। পেছনে ফিরে তাকানো তো দূরের কথা, ঘাড় ঘুরিয়ে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকানোরও সাহস পাচ্ছে না সে। দুই হাতে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরেছে, যেন ওটার ওপরই নির্ভর করছে এখন জীবন-মরণ। দৃষ্টি সামনের পথে।

কিছুদূর এগোল গাড়ি।

মরেছে! আঁতকে উঠল মুসা। সামনে বাঁক! আরও শক্ত করে হুইল আঁকড়ে ধরল সে। তীব্র গতিতে ছুটে আসছে যেন বাঁকটা। মোড় নেয়ার আগে যা যা করা দরকার তার কোনটাই করল না ওর পা। ব্রেক চাপল না, গতি কমাল না। একই গতিতে রেখেই স্টিয়ারিং কাটল সে। চলে এল বাঁকের অন্য পাশে।

উল্টো দিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসছে। ওটার পাশ কাটানোর চেষ্টায়

বাঁয়ে কাটল সে। বেশি কেটে ফেলল। দেখল, একটা বিশাল গাছ ধেয়ে আসছে তার দিকে। হুইল ঘুরিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ব্রেক প্যাডালে পা দিল বটে, কিন্তু চাপ দিতে ভুলে গেল। আর কোন আশা নেই। সোজা গিয়ে গাছের গায়ে বাড়ি মারবে ট্রাকের নাক।

কি করে যে বাঁচল সে বলতে পারবে না। পরে যখন বড়দেরকে বলেছে, তারা বলেছে, কয়েকটা ব্যাপার একসঙ্গে কাজ করে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। সে পাহাড়ী ঢালের ওপর দিকে উঠছিল, তাতে এমনিতেই গাড়ির গতি কমে গিয়েছিল। অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে এনে ব্রেক চেপেছিল। আরও কমে গিয়েছিল গতি। হুইল ঘোরাচ্ছিল হাত দুটো। ফলে শেষ মুহূর্তে সরে গিয়েছিল গাড়ির নাক। সরাসরি আঘাত না হেনে কেবল একপাশের বনেট বাড়ি খেয়েছিল গাছের সঙ্গে।

আচমকাই যেন আবিষ্কার করল মুসা, অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়নি সে। গাড়িতে বসে আছে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘাসে ঢাকা জমিতে। কোন ক্ষতিই হয়নি ওর। একেবারে নিরাপদ।

তবে থামার আগে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি লেগেছে। গড়িয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে বকালকাপক। শুয়ে আছে ঘাসের ওপর।

থরথর করে কাঁপছে শরীর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে মুসা। কানে এল চিৎকার। কাছেই একটা খামারবাড়ি। খেতে কাজ করছিল তিনজন চাষী। দৌড়ে আসছে ওরা। যে গাড়িটাকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার পাশের জমিতে নেমেছে সে, সেই গাড়িটাও থেমে গেছে। সেটা থেকে নেমে ছুটে আসছে একজন পুরুষ, একজন মহিলা, আর একটা ছোট্ট মেয়ে।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, 'ঠিক আছ তুমি? অন্যেরা কোথায়?

'ভালই আছি আমি,' কাঁপা হাতে দরজা খুলল মুসা। 'আর কেউ নেই। আমি একা।'

ভ্রূকুটি করল একজন চাষী। 'তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিল কে? বাবার গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছ বুঝি?'

আরেকজন টিপ্পনী কাটল, 'চাইলে কি আর দেয়? চুরি করেছে।'

'দেখুন,' কেউ তাকে চোর বললে সইতে পারে না মুসা, 'আমি চোর নই। বরং একটা চুরি ঠেকানোর চেষ্টা করতে গিয়েই অ্যাক্সিডেন্ট করলাম।'

'চোরে তাড়া করেছিল তোমাকে? সে জন্যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছ?' ভুরু কুঁচকে বললেন ভদ্রলোক।

'আরে কি বিশ্বাস করছ ওর কথা,' তার স্ত্রী বললেন। 'বানিয়ে বলছে।'

'আম্মা, দেখো দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা মূর্তিটা হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'একটা কাঠের পুতুল! আরিব্বাবা, কত্তোবড়!'

'ওটা পুতুল নয়,' মুসা বলল। 'দেবতার মূর্তি। ইনকাদের দেবতা।'

'তোমার গাড়িতে এল কি করে?' জানতে চাইল প্রথম চাষী। মুসার একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। 'তোমার কথাবার্তা সুবিধের লাগছে না। ধরে পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

পুলিশের কাছে যাওয়ার একান্ত ইচ্ছে মুসার, সেখানেই চলেছিল, অথচ এখন ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। মূর্তিটা যেখানে আছে সেখানেই ফেলে রেখে তাকে নিয়ে যাবে ওরা। এই সুযোগে হ্যারি আর জন এসে ওটাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। এত কষ্টের কোন অর্থই হবে না তখন। বলল, 'পুলিশের কাছেই যাচ্ছিলাম। চলুন, যেতে আমার আপত্তি নেই। তবে দয়া করে একজন এখানে থেকে মূর্তিটা পাহারা দিন।'

চেঁচাতে শুরু করল মেয়েটা, 'আমি থাকি, আমি থাকি! পুতুলটাকে আমিই পাহারা দিই!'

'ডলি, তুমি চুপ থাকো!' ধমক দিলেন তার আম্মা।

'এক কাজ করা যেতে পারে,' ভদ্রলোক বললেন। 'মূর্তিটাকে আমার গাড়িতে তুলে নিতে পারি। ওটাকে সহই ছেলেটাকে থানায় নিয়ে যাই। কি বেরোতে কি বেরোয় কে জানে।' চাষীদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার গাড়ির ছাতে তুলে দেবেন, প্লীজ?'

তিনজনে মিলে ধরাধরি করে গাড়ির রুফ র‍্যাকে তুলে দিল মূর্তিটা। হাঁপ ছাড়ল মুসা। তবে ট্রাকটার ক্ষতি করেছে বলে একটা অস্বস্তি থেকেই গেল। হ্যারি বা জনের গাড়ি হলে কেয়ারই করত না। কিন্তু সে নিশ্চিত, ওটা ওদের নয়, কোনখান থেকে চুরি করে এনেছে। তবে মূর্তিটাকে যে বাঁচাতে পারল, সে জন্যে খুশি।

গাড়িতে উঠলেন ভদ্রলোক। তার পাশে উঠে বসল মুসা। ডলি আর তার আম্মা উঠলেন পেছনের সীটে।

চাষীদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক। তাঁর নাম ওয়ারনার ডেন। বললেন, দুর্ঘটনাটা ঘটতে যেহেতু দেখেছে ওরা, প্রয়োজন পড়লে তাদের ডাকবেন সাক্ষি দেয়ার জন্যে। তারপর তিনজনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হলেন পুলিশ ফাঁড়িতে। ফাঁড়িটা কাছেই, পাশের আরেকটা গ্রামে। যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

যেদিক থেকে এসেছিল মুসা, সেদিকেই চলল গাড়ি। সেই কফি শপটার কাছাকাছি হতেই দেখল, পথের পাশে একটা গাড়ির ধারে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি আর জন। নিশ্চয় লিফট নেয়ার চেষ্টা করছে।

'স্যার, থামুন, থামুন!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'ওই যে দুই চোর! ধরুন, ধরুন ওদেরকে!'

'আমার সঙ্গে চালাকি করে লাভ নেই,' কঠিন কণ্ঠে বললেন ডেন। 'গাড়ি থামাই, আর এই সুযোগে লাফিয়ে নেমে পালাও। সেটি হতে দিচ্ছি না। একবার যখন তুলতে পেরেছি, ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়েই ছাড়ব।'

গাড়িতে বসা মুসাকে দেখে ফেলেছে চোরেরা। ছাতে রাখা মূর্তিটাও দেখেছে। বুঝল, আপাতত ওটাকে ফেরত পাওয়ার আশা নেই আর। তার চেয়ে পালানো ভাল। দাঁড় করানো গাড়ির ড্রাইভারকে লিফট দিতে রাজি করিয়ে ফেলেছে। আর একটা মুহূর্তও দেরি করল না ওরা। তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে উঠে বসল। চলতে শুরু করল গাড়িটা। মুসারা যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে।

মরিয়া হয়ে বলল মুসা, 'মিস্টার ডেন, দোহাই আপনার, বিশ্বাস করুন আমি

মিথ্যে বলছি না! প্লীজ, স্যার, প্লীজ, ঘুরুন! চোর দুটোকে ধরার ব্যবস্থা করুন! ওদের পিছু নিতে পারলে ওদের আস্তানাটা কোথায় সেটাও জানা যাবে।'

হাঁ করে তার কথা শুনছে পেছনে বসা ডলি। সাংঘাতিক উত্তেজিত। দারুণ মজার ব্যাপার। যেন সিনেমায় দেখা ঘটনাগুলো বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু তার বাবা গুরুত্বই দিলেন না, কেবল মুচকি হাসলেন।

'কল্পনা শক্তি তোমার ভালই হে ছেলে,' বললেন তিনি। 'বড় হয়ে চেষ্টা করলে ভাল গোয়েন্দা গল্প লিখতে পারবে। দেখো পুলিশকে বলে, বিশ্বাস করে কিনা।··· ওই যে, এসে গেছি।'

ফাঁড়ির সামনে গাড়ি থামল। লাল-সাদা রঙ করে অনেকগুলো টবে ফুলগাছ লাগানো, সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাড়িটার সামনে। সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু ভেতরে ঢুকে গম্ভীর সার্জেন্টের মুখ দেখে দমে গেল মুসা।

ব্যাপার কি, জিজ্ঞেস করলেন সার্জেন্ট।

বলতে একটা মুহূর্ত দেরি করলেন না ডেন। উগড়ে দিতে শুরু করলেন যা যা ঘটেছে, 'এই ছেলেটা এক ট্রাক নিয়ে পালাচ্ছিল। আমার গাড়িটাতে যে বাড়ি লাগায়নি এটাই বেশি। গাছের গায়ে বাড়ি লাগিয়ে দিয়েছিল আরেকটু হলেই, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। আমি শিওর, ওর বাপের গাড়ি চুরি করে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। কিন্তু গাড়িতে যে মূর্তিটা ছিল, ওটা কোথায় পেয়েছে জানি না। আমার মনে হয় চুরি করেছে। বাইরে চলুন, দেখবেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছি ওটা।'

ডেনের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাইলেন সার্জেন্ট। দেখার পর মুসার দিকে ফিরলেন, 'তোমার কি বলার আছে বলো। খবরদার, একটা মিথ্যে কথা বলবে না। ভাল হবে না।'

'মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই আমার!' রেগে উঠল মুসা। 'মিস্টার ডেন যা বলেছেন, সব ভুল। একটাও ঠিক নয়।'

'কী! আমি মিথ্যে বলেছি! মুখ সামলে কথা বলবে ছেলে···'

হাত তুলে বাধা দিলেন সার্জেন্ট, 'আপনি থামুন, প্লীজ। যা জিজ্ঞেস করার আমিই করছি।' মুসার দিকে ফিরলেন, 'কি নাম তোমার? বাবার নাম কি?'

'আমার নাম মুসা আমান। বাবার নাম রাফাত আমান। ফিল্মের লোক। গোবেল বীচে কার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি সেটাও জানাতে পারি। বিজ্ঞানী জোনাথন পারকার। আশা করি তাঁর নাম শুনেছেন। ওই ট্রাক আমি চুরি করিনি। তবে নিয়ে পালাচ্ছিলাম এটা ঠিক। ওটাতে একটা দামী মূর্তি ছিল। একটা অ্যানটিক শপ থেকে চুরি করেছিল দুই চোর। ওদের হাত থেকে বাঁচাতেই ট্রাকটা নিয়ে যাচ্ছিলাম থানায়। কিন্তু ভালমত চালাতে পারি না বলে অ্যাক্সিডেন্ট করেছি।'

মুসার কথা আর ভাবভঙ্গিতে অবিশ্বাস করতে পারলেন না সার্জেন্ট। তাঁর মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে ছেলেটা।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন ডেন আর তাঁর স্ত্রী।

উত্তেজিত কণ্ঠে ডলি বলে উঠল, 'আব্বা, তোমার ভুলের জন্যেই তো চোর

দুটোকে ধরা গেল না! মুসাকে বিশ্বাস করলে না বলেই তো…'

'তুমি থামো তো,' তাকে থামিয়ে দিলেন তার আম্মা। 'তোমার আব্বা কি আর জানতেন যে ছেলেটা সত্যি কথা বলছে? বলছে কিনা এখনও শিওর না।'

'এখনই জানা যাবে,' সার্জেন্ট বললেন। 'মিস্টার পারকারকে আমি চিনি। ফোন করছি তাঁকে।' মুসার দিকে তাকালেন, 'নম্বরটা বলো।'

নম্বর বলল মুসা। তারপর অনুরোধ করল, 'সার্জেন্ট, দয়া করে আরেকটা ফোন করবেন। অ্যানটিক শপে। মালিকের নাম মিস্টার কুপার।' দোকানের নম্বরটাও দিল সে।

দুই জায়গাতেই ফোন করলেন সার্জেন্ট।

মিস্টার পারকার বললেন, 'এখুনি আসছি।' বলেই লাইন কেটে দিলেন।

তবে কুপার প্রচুর কথা বললেন, ফোন আর রাখতে চান না। শেষে বললেন, জিনা, কিশোর, রবিন আর রাফিকে নিয়ে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাবেন ফাঁড়িতে।

দুজন কনস্টেবলকে ডেকে গাড়ির ছাত থেকে মূর্তিটা নামিয়ে আনতে বললেন সার্জেন্ট।

এইবার শান্তি। একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।

ছয়

মিস্টার পারকারের আগেই জিনাদেরকে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন কুপার। ফাঁড়ির বাইরে গাড়ি থামলে সবার আগে লাফিয়ে নেমে পড়ল রাফি। দৌড় দিল অফিসের দিকে। তার পেছনে ছুটল কিশোর, রবিন আর জিনা।

ঘরে ঢুকেই মুসাকে দেখতে পেয়ে 'হউ হউ' করে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল কুকুরটা। কোন দিকেই নজর নেই তার। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ডলিকে। তাকে ধরার জন্যে ঝুঁকলেন মিস ডেন। তাল সামলাতে না পেরে তিনিও উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, ঠেকানোর জন্যে খামচে ধরতে গেলেন স্বামীর শার্ট। ধাক্কা দিয়ে বসলেন পিঠে। মিস্টার ডেনও ভারসাম্য হারালেন। তিনি পড়লেন গিয়ে সার্জেন্টের ডেস্কে। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন সার্জেন্ট। হাত লেগে টেবিলে রাখা একগাদা কাগজ আর ফাইল ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

সেগুলো তোলার জন্যে এগিয়ে গেল মুসা। তাকে সাহায্য করতে ঝুঁকলেন ডেন দম্পতি। সার্জেন্ট আর তাঁর দুই কনস্টেবলও হাত লাগাল। রাফি মনে করল, এটা কোন ধরনের নতুন খেলা। গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল সে, আর এলোপাতাড়ি লাফালাফি করতে লাগল। বদ্ধ ঘরে সে কি বিকট আওয়াজ! প্রচণ্ড হুড়াহুড়ি। কুপার, রবিন, কিশোর আর জিনাও ঢুকল ঘরে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার সময় কিশোরকে ধরতে গিয়ে তাকেও কাত করে দিলেন কুপার। আবার একটু আগে ঘটে যাওয়া দৃশ্যের পুনরাভিনয় হতে লাগল। চিৎপাত হয়ে পড়তে লাগল একজনের পর একজন।

রাফির আনন্দ দেখে কে। ভীষণ মজা পেয়ে চেঁচানো আরও বাড়িয়ে দিল।

তারপর মনে করল, সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, সবারই গাল-চাটা পাওনা হয়ে পড়েছে। একে একে সেটাই শোধ করতে শুরু করল সে।

অবশেষে সোজা হলেন সার্জেন্ট আর দুই কনস্টেবল। লাল হয়ে গেছে মুখ। কাগজপত্রগুলো আবার তোলা হয়েছে ডেস্কে। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল সব কিছু। কেউ কথা বললে অন্যেরা শুনতে পাবে এখন। মুসাকে ঘিরে এলেন কুপার, কিশোর, রবিন আর জিনা।

কথার ফুলঝুড়ি ছুটল ঃ

'ইস্, কি দুশ্চিন্তাই না হচ্ছিল তোমাকে না দেখে! ওদিকে দেখি রাফিকেও ঘরে আটকে তালা দিয়ে দিয়েছে!'

'তোমার কি হলো তাই বুঝতে পারছিলাম না, মুসা!'

'তারপর দেখি বকালকাপক নেই!'

'বুঝলাম, কেউ ওকে চুরি করে নিয়ে গেছে, আর তুমিও চোরের পিছু নিয়েছ!'

একসঙ্গে কথা বলছে সবাই। স্তব্ধ হয়ে শুনছেন ডেনরা। আর সহ্য করতে না পেরে ডেস্কের ওপর দড়াম করে এক কিল বসিয়ে দিলেন সার্জেন্ট, গর্জে উঠে বললেন ওদেরকে চুপ করার জন্যে। কুপারের দিকে ফিরে বললেন, 'এই বার আপনি সব বলুন তো, স্যার। আমার লোকেরা একটু আগে যে মূর্তিটা নামিয়ে আনল, ওটা আপনারই জিনিস? চুরি হয়েছিল?'

সব কথা খুলে বললেন কুপার। শেষে যোগ করলেন, 'তাহলে বুঝতেই পারছেন কি ঘটেছে। আমাকে দোকান থেকে বের করার জন্যেই ফোন করেছিল চোরটা। আমিও এমনই গাধার গাধা, কোন কিছু না ভেবেই বোকার মত বেরিয়ে দৌড় দিলাম শেরিফের অফিসে।'

শেরিফের অফিসে যাওয়ার পর কি হয়েছে তা-ও জানালেন। দলবল নিয়ে তাঁদেরকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল শেরিফের অ্যাসিসটেন্ট। কেন দেখা করতে গেছেন সেটা শুনে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। বলল, অসম্ভব, সে ফোন করেনি। ওরকম কোন দুর্ঘটনার খবরও জানে না।

'তখন বুঝলাম,' কুপার বলছেন, 'ফাঁকি দেয়া হয়েছে আমাকে। কেউ আমার সঙ্গে চালাকি করেছে। আবার দৌড় দিলাম দোকানে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। মুসাও নেই, মূর্তিটাও নেই। ওটাকে আবার ফেরত পাব আশা করিনি…আসলেই ও খুব বড় গোয়েন্দা…'

'এই গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েই মরবে একদিন' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা রাগত কণ্ঠ।

সব কটা চোখ ঘুরে গেল দরজার দিকে। অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে, কুপারের কথা শুনেছেন। কেউ খেয়াল করেনি। ঘরে ঢুকলেন এখন। কুপারের মত প্রশংসা করলেন না মুসার। প্রশংসার ধার দিয়ে তো গেলেনই না, উল্টে গেলেন রেগে। তাঁর রাগের কারণ, জরুরী গবেষণা থেকে তাঁকে উঠে আসতে বাধ্য করা হয়েছে।

মুসার পক্ষ নিয়ে জিনা বলল. 'তার কি দোষ, আব্বা? তোমার সামনে থেকে

যদি চোরে কোন জিনিস তুলে নিয়ে যেত, তুমি কি করতে? চোরটাকে তাড়া করতে না?'

'আমি কি করতাম সেটা আমার ব্যাপার!' কড়া গলায় বললেন পারকার। 'কিন্তু মুসার যাওয়া ঠিক হয়নি। লোকগুলো নিশ্চয় খুব পাজি। যা খুশি করে বসতে পারত। একলা যাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে ওর?'

'কিন্তু আব্বা, তুমি বুঝতে পারছ না···'

'আমি ঠিকই পারছি! তুই এখন চুপ কর! বেয়াড়া সব ছেলেমেয়ে, কেউ কথা শোনে না! বেতের বাড়ি খায় না তো···'

ফোনের শব্দে বাধা পড়ল তাঁর কথায়। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন সার্জেন্ট। নীরবে ওপাশের কথা শুনলেন। তারপর ধন্যবাদ দিয়ে রেখে দিলেন রিসিভার। 'খবর আছে,' ঘরের সবাইকে, বিশেষ করে মুসাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, ট্রাকের নম্বরটা এনে ভাল করেছ। তোমার অনুমান ঠিক, ওটা চুরি করেই আনা হয়েছে। চোর দুটোর কোন খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। নিশ্চয় লুকিয়ে পড়েছে।' এই প্রথম হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। অনেকটা নমনীয় দেখাল চেহারাটা। পারকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি যত বকাবকিই করেন, স্যার, ছেলেটা একটা কাজের কাজ করেছে। সে ওই ঝুঁকিগুলো না নিলে মিস্টার কুপারের মূর্তিটা যেত।'

'মানুষের চেয়ে মূর্তির দাম বেশি হলো নাকি!' খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার পারকার। 'যদি ছেলেটা মারা যেত? ওর বাবাকে কি জবাব দিতাম আমি?'

চুপ হয়ে গেলেন সার্জেন্ট। পারকারের কথায়ও যুক্তি আছে। কুপারের মুখ লাল হয়ে গেছে। লজ্জা পাচ্ছেন তিনি, বোঝা গেল। তাঁর মূর্তিটার জন্যেই মুসা ঝুঁকি নিয়েছিল, ভাবতে খারাপ লাগছে। সত্যিই তো, যদি মুসার কিছু হয়ে যেত!

কিছু কাগজপত্র রেডি করে সেগুলো পারকার, কুপার, মুসা আর ডেনকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন সার্জেন্ট। আর কোন কাজ নেই এখানে। বাইরে বেরিয়ে এল সবাই। সাহায্য করল কনস্টেবল দুজন, কুপারের মূর্তিটাকে তাঁর গাড়ির ছাতে তুলে দিল।

পারকারের কাছে এসে দাঁড়ালেন কুপার। 'স্যার, অনেক উপকার করেছেন আপনারা আমার। আরেকটা উপকার চাই। করবেন, প্লীজ?'

'কি?' জানতে চাইলেন পারকার।

'কোন অসুবিধে না হলে আমার মূর্তিটা দয়া করে যদি কয়েক দিন আপনার বাড়িতে রাখেন···এখন দোকানে নিয়ে গেলে আবার হামলা আসতে পারে। এটার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ব্যাটারা। আবার চুরি করতে আসবে। কেড়ে নিয়ে গেলেও অবাক হব না। আপনার ওখানে থাকলে জানবেই না কোথায় আছে।'

হাসলেন পারকার। 'না, অসুবিধে নেই। আসুন। আমাদের পিছে পিছে গাড়ি নিয়ে আসুন।' ছেলেমেয়েদেরকে বললেন, 'এই, তোমরা ওঠো।'

সুতরাং তাঁর গাড়ির পিছে পিছে চলল কুপারের স্টেশন ওয়াগন। জিনাদের বাড়িতে পৌঁছে মূর্তিটাকে নামাতে কুপারকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা।

পারকারও হাত লাগালেন। বাগানের ছাউনিতে রাখা হলো মূর্তিটাকে।

নিরাপদে ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়ি ফিরতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কেরিআন্টি। তবে মুসাকে বকা দিতে ছাড়লেন না, 'কি জন্যে যে যাস এসবে জড়াতে! এই, তোদের কি আক্কেল হবে না রে কোনদিন! কি যে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলি!'

'আন্টি, বিশ্বাস করুন,' মুসা বলল, 'আর কোন উপায় ছিল না। একজনের একটা জিনিস চুরি হয়ে যাচ্ছে দেখেও কি চুপ করে থাকা যায়?'

তা যায় না, স্বীকার করলেন আন্টি। বললেন, 'তবু, তোর যদি কিছু হয়ে যেত?'

'হয়নি তো আর,' জিনা বলল। 'ওরকম যদি যদি করলে তো কত কিছুই হতে পারে। অত সব ভাবলে ঘরে বসেও নিরাপদ ভাবা যাবে না,' বলে বাবার দিকে আড়চোখে তাকাল সে।

তবে পারকার আর কিছু বললেন না। তাঁর দায়িত্ব শেষ। সোজা গিয়ে ঢুকলেন স্টাডিতে।

সে রাতে শোয়ার পরেও ঘুম এল না কিশোরের চোখে। মূর্তিটার কথা ভাবছে। কুপার ঠিক করেছেন, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ঘুরে আসার আগে আর ওটাকে শো-তেই দেবেন না, বিক্রি করবেন না। ওটার রহস্যটা কি জানার জন্যে তিনিও কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

কিশোরও কৌতূহলী। ওটার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন হ্যারি আর জনের রহস্যময় বস্ ডোনাই? কে লোকটা? কি আছে মূর্তিটাতে যে ওটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দিনদুপুরে বাজার থেকে চুরি করার ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করল না ওরা?

নাহ্, রহস্যটা ভেদ করতেই হবে!

পরদিন সকাল থেকেই বিষণ্ণ হয়ে রইল আকাশ, বিষণ্ণ করে তুলল ছেলেমেয়েদেরকেও। মেঘলা ওই ধূসর আকাশ কি ভাল লাগে। রোদ নেই কিছু নেই। ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না, তাই ওরকম দিনেও বেরোতে তৈরি হলো ওরা। কিন্তু দরজার বাইরে পা রাখার আগেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হলো। আর কি করে বেরোয়। ঘরে বসে দাবা, কেরম কিংবা লুডু খেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রবিন, মুসা বা জিনার এতে তেমন কোন আপত্তি নেই। তবে কিশোরের ভাল লাগে না এসব খেলা। আর রাফির তো সব চেয়ে পচা লাগে। খেলায় সে অংশ নিতে পারে না। কেবল বসে বসে দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই তার। ঘরের বাইরে বেরোনোর মত আনন্দ আর আছে নাকি!

সেদিন সন্ধ্যায় সিনেমায় যাবেন ঠিক করলেন কেরিআন্টি। স্থানীয় সিনেমা হলে একটা অ্যাডভেঞ্চার ছবি চলছে। লাফিয়ে উঠল ছেলেমেয়েরা।

তবে যাওয়ার সময় একটা গোলমাল বেধে গেল। বাবার সঙ্গে খিটিমিটি করে গাল ফুলিয়ে বসে রইল জিনা। আর তাকে কিছুতেই শান্ত করা গেল না। সিনেমায় গেল না সে। তার না যাওয়ার আরেকটা কারণ, রাফি। সিনেমা হলে ঢুকতে দেয়া

হবে না তাকে। সবাই চলে গেলে একা একা কুকুরটার বাড়িতে থাকতে কষ্ট হবে।

মেয়ের স্বভাব জানা আছে কেরিআন্টির। একবার যখন যাবে না বলে দিয়েছে, আর তাকে রাজি করানো যাবে না। তার একলার জন্যে সবার আনন্দ মাটি করতে চাইলেন না। জিনাকে দুটো বকা দিয়ে রেখে অন্যদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। স্বামীকেও জোর করে কাজ থেকে তুলে বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন।

একলাও থাকতে হবে না জিনাকে, খাওয়ারও অসুবিধে নেই। ফ্রিজে খাবার আছে। সে সব খেতে ইচ্ছে না করলে আইলিনকে বললেই খাবার তৈরি করে দেবে। কাজ সেরে বাড়ি যেতে দেরি হবে আইলিনের। রান্নাঘরে আছে।

ইতিমধ্যেই দুবার এসে জিজ্ঞেস করে গেছে কি রান্না করে দেবে। ঠাণ্ডা খেতে ইচ্ছে হলো না জিনার। তবু বলল, কিছু লাগবে না। কিন্তু আইলিন কি আর শোনে। এক প্লেট ডিম ভাজা, বড় বড় টুকরো করে বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে গরুর মাংস ভাজা, গরম গরম রুটি আর বড় এক প্লেট আপেল পাই বানিয়ে টেবিলে দিয়ে খেতে ডাকল জিনাকে।

খিদে তেমন নেই ওর, কিন্তু খাবারের সুগন্ধে রুচি হয়ে গেল। গরম গরম না খেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে, তাই আর আপত্তি না করে বসে পড়ল। খাওয়ার পর বাসন-প্লেট ধোয়ায় সাহায্য করল আইলিনকে।

কাছে কাছে ঘুরঘুর করছে রাফি। নিচু গলায় তাকে বলল জিনা, 'আরও কেন রয়ে গেলাম, জানিস? আমার ধারণা, আবার আসবে লোকগুলো, মূর্তিটাকে চুরি করতে। কুপার যতই বলুন এখানে রাখলে কেউ জানতে পারবে না, মোটেও তা নয়। কোথায় আছে ওটা জেনে নেবেই চোরগুলো।'

কি বুঝল রাফি কে জানে। কেবল জোরে জোরে দুবার বলল, 'হউ! হউ!'

মেঘলা দিন। দ্রুত অন্ধকার নামল। আইলিনের রান্নাঘরের কাজ শেষ। বসার ঘরে এসে বলল, 'আমার কাজ শেষ। যাব। একলা থাকতে অসুবিধে হবে তোমার?'

'না না, অসুবিধে কিসের। আপনি যান।'

আর কিছু বলল না আইলিন। বেরিয়ে গেল।

সোফায় বসে সামনের টী-টেবিলে পা তুলে দিল জিনা। কুকুরটা বসে আছে তার কাছেই কার্পেটে। লম্বা জিভ বের করে তার দিকে তাকিয়ে কথা শোনার অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছু বলল না জিনা। রাফিও বিরক্ত করল না।

মূর্তিটার কথা ভাবছে জিনা। কি আছে ওটার মধ্যে? দামী কোন রত্ন? নাকি কোন ধরনের প্রাচীন ফর্মুলা? শুনেছে, অনেক বুদ্ধিমান ছিল ইনকারা। অনেক আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছে। সে রকমই কোন কিছু নেই তো ভেতরে, আধুনিক পৃথিবীতেও যার মূল্য অপরিসীম?

হঠাৎ মুখ নামিয়ে রাফির দিকে তাকাল জিনা। বলল, 'রাফি, খামোকা বসে না থেকে চল ছাউনিতে চলে যাই। মূর্তিটার রহস্য জানার চেষ্টা করি। হাতে অনেক সময়। আজ একেবারে খুঁটিয়ে দেখব সব। কিছু থাকলে বের করেই ছাড়ব।'

খুশিমনে উঠে দাঁড়াল রাফি।

ছাউনিতে আলো আছে বটে, তবে খুব অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব। মূর্তিটাকে পরীক্ষা করতে হলে ভাল আলো দরকার। বেশি পাওয়ারের বাল্ব নিয়ে নেবে একটা? না, তার চেয়ে একটা টর্চ নিলেই হবে।

বসার ঘরের দেরাজেই টর্চ আছে। তাতে তাজা ব্যাটারি ভরে নিল সে। তারপর রাফিকে নিয়ে রওনা হলো ছাউনিতে।

বাইরে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেল। আরে, এ কি কাণ্ড! কিছুক্ষণ আগেও তো কালো হয়ে ছিল আকাশ! মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে এখন প্রকৃতি। খুশি হয়ে উঠল তার মন। খানিক আগের গুমোট ভাবটা কেটে গেল তার মনেরও।

ছাউনির কাছে চলে এল রাফিকে নিয়ে। দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। এক মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা। দরজাটা ঠেলে খোলার সময় কিঁচ করে মৃদু শব্দ হলো। কব্জাগুলোতে তেল দেয়া দরকার, ভাবল সে।

দরজা মেলতেই আগে আগে ঢুকে গেল রাফি। জিনা ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা আবার লাগিয়ে দিল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ছাতে ঝোলানো একটি মাত্র বাল্বের ম্লান আলোয় আরও রহস্যময় আরও বিচিত্র লাগছে বকালকাপককে।

'বড় বেশি মুখচোরা স্বভাবের দেবতা তুমি, বকালকা,' টর্চের সুইচ টিপল জিনা। তীব্র আলো ফেলল মূর্তিটার ওপর। 'কি রহস্য আছে তোমার ভেতরে সহজে ফাঁস করবে না, তাই না? তবে আমিও ছাড়ব না। বলো এখন, কোনখান থেকে খোঁজা শুরু করব?'

যেন জবাব আশা করছে মূর্তিটার কাছ থেকে এমন ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

ঠিক এই সময় মৃদু গরগর করে উঠল পাশে দাঁড়ানো রাফি। দরজার দিকে রওনা হলো সে। নিশ্চয় কিছু আঁচ করেছে।

সাত

জিনাও সতর্ক হয়ে গেল। তাহলে যা ভেবেছিল তা-ই ঘটেছে! চোরগুলো জেনে গেছে মূর্তিটা কোথায় আছে। ঠোঁটে আঙুল রেখে শ্‌শ্‌ শব্দ করে সাবধান করল রাফিকে, আওয়াজ করতে নিষেধ করল। টর্চ তো নেভালই, বৈদ্যুতিক আলোটাও নিভিয়ে দিল। চলে এল দরজার কাছে।

অন্ধকারে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল সে। একটা হাত রেখেছে রাফির ঘাড়ে। দাঁড়িয়ে গেছে কুকুরটার রোম। হাতের চাপেই আরেকবার ইঙ্গিত করল তাকে, শব্দ না করার জন্যে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কথা শোনা গেল, 'কুপার গাধাটা ভেবেছিল এত সহজেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে দেবে! এখানেই আছে মূর্তিটা!'

'হ্যাঁ, এখানেই আছে।'

'গাড়িতে করে সবাই চলে গেছে, আমি দেখেছি।'

'তাহলে আর কি। স্কেলিটন কী নিয়েই এসেছি। তালা খুলতে অসুবিধে হবে

না।'

হ্যারি আর জন। দরজার কাছে এসে থামল পদশব্দ। ছাউনির বেড়া পাতলা কাঠের। বাইরের কথা তাই স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া লোকগুলো ভেবেছে কেউ নেই বাড়িতে, তাই কণ্ঠস্বর নামানোরও প্রয়োজন মনে করছে না।

'কাল নিশ্চয় আমাদেরকে ফলো করে এসেছে ওদের একজন,' জিনা ভাবছে। 'মূর্তিটা যে ছাউনিতে রাখা হয়েছে দেখে গেছে। কাজেই সোজা চলে এসেছে এখানে।'

বেকায়দা অবস্থা। একবার ওদেরকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। এখানে এখন তাকে দেখে ওরা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তারপর তাকে বেঁধে কিংবা বেহুঁশ করে রেখে বকালকাপককে নিয়ে চলে যাবে, কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না তার।

ভয় পেলে কিছু করতে পারবে না! নিজেকে ধমক দিল জিনা। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ভেবে বের করো কি করবে।

কিন্তু কি করা যায়? আরেকবার মূর্তিটা এখান থেকে বের করে নিয়ে গেলে আর ফেরত পাওয়ার আশা নেই। যা করার এখানে থাকতে থাকতেই করতে হবে। আমি একা! সঙ্গে আছে কেবল রাফি। আর মূর্তিটা তো প্রাণহীনই, ওটা কোন সাহায্যই করতে পারবে না।

হঠাৎ অন্ধকারেই চকচক করে উঠল তার চোখ। একটা বুদ্ধি বের করে ফেলেছে। বকালকাপক একেবারেই অক্ষম নয়। সাহায্য সে করতে পারবে, এবং ভালমতই পারবে।

সময় নষ্ট করল না জিনা। কাজ শুরু করে দিল। পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল মূর্তিটার পেছনে। তার সঙ্গে এল রাফি। দরজার তালা লাগানো মনে করে বাইরের একজন ইতিমধ্যেই তাতে চাবি ঢুকিয়ে দিয়েছে। মূর্তির যেখানটায় মুখ রেখে কথা বললে শব্দ বেড়ে যায় সেখানে মুখ নিয়ে এসে হাঁক দিল জিনা, 'কে ওখানে? দরজার তালায় খোঁচাখুঁচির শব্দ শুনতে পাচ্ছি! আম্মা, শুনছ? আব্বাকে ডাকো।'

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর আরেক রকম করে নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। দাঁড়াও, বলছি।'

আস্তে কথা বললেই যেখানে গমগম করে উঠে বকালকাপক, সেখানে পেয়েছে হাঁক। বজ্রের গর্জন বেরোল যেন তার মুখ দিয়ে। মনে হলো, সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে তার কথা। ঠিক কোনখান থেকে হয়েছে শব্দটা, বোঝার উপায় নেই।

দরজার ওপাশে কোন শব্দ নেই আর। বরফের মত জমে গেছে লোকগুলো, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অনুমান করল জিনা। স্বর কিছুটা বিকৃত করে কথা বলেছে সে, সেটা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় অনেক বেশি বিকৃত হয়েছে। মানুষ ওরকম শব্দ করতে পারে না, ভাবছে নিশ্চয় হ্যারি আর জন।

'থাক, যাওয়ার দরকার নেই, আব্বা,' আবার বলল জিনা, 'কুত্তাগুলোকে ছেড়ে দিই। কাউকে দেখলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে বলব।'

মূর্তির ফোকর থেকে মুখ বের করে এনে রাফিকে ধরে তুলল সে। অনেক ভারি

কুকুরটা, তুলতে কষ্ট হয়। তবু কোনমতে তুলে ওটাকে নিয়ে গেল প্রায় ফোকরের কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'রাফি, চেঁচা। যত জোরে পারিস।'

কি করতে হবে বুঝে ফেলল কুকুরটা। দারুণ মজার কাজ। এসব করতেই তো তার বেশি পছন্দ। ঘেউ ঘেউ শুরু করল। মনে হতে লাগল, একটা নয়, একাধিক হাউণ্ড রেগে গিয়ে তুমুল চিৎকার জুড়েছে। চোর ধরতে পারলে আর আস্ত রাখবে না আজ।

এত প্রচণ্ড শব্দ, কানের পর্দা যেন ফেটে যাবে। বেশিক্ষণ ওভাবে ভারি কুকুরটাকে তুলে ধরে রাখতে পারল না জিনা। তার ওপর শব্দ। কয়েকবার ডাকতেই ওকে চুপ করতে বলে মাটিতে নামিয়ে দিল।

ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল জিনার। পালাচ্ছে লোকগুলো। মুচকি হাসল সে। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল হাসিটা। ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। ভয় পেয়ে পালিয়েছে চোরগুলো। সহসা আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। তবে বলাও যায় না। চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলেই ভয় কেটে যেতে পারে লোকগুলোর। অস্বাভাবিক আওয়াজ কিসে করল দেখার জন্যে ফিরেও আসতে পারে।

আলো জ্বালাতে আর সাহস করল না জিনা। আর আলো না জ্বেলে মূর্তিটাকে পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। তার চেয়ে এখানেই অন্ধকারে রাফিকে নিয়ে বসে বসে পাহারা দেবে বকালকাপককে, সিনেমা দেখে সবাই না ফেরা পর্যন্ত।

পুরো দুটো ঘণ্টা বসে থাকতে হলো দুজনকে। কিছুই ঘটল না আর।

গেটের কাছে গাড়ির শব্দ হতেই রাফিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জিনা। ছাউনির দরজায় তালা লাগিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে বসে রইল আবার গাল ফুলিয়ে। তার মন যে ভাল হয়ে গেছে একথা বুঝতে দিতে চায় না বাবা-মা'কে। কাজেই মূর্তিটাকে যে আবার চুরির চেষ্টা হয়েছে সে কথাও চেপে যেতে হলো। তবে তাঁরা সরে যেতেই বন্ধুদেরকে ফিসফিস করে জানাল, 'হ্যারি আর জন আবার এসেছিল। বকালকাকে চুরি করতে চেয়েছিল। তাড়িয়েছি ব্যাটাদের।'

'কি করে?' জানার জন্যে আর তর সইছে না মুসার।

'এখানে না। চলো, চিলেকোঠায় চলে যাই।'

ওপরে উঠে এল ওরা। পুরানো কয়েকটা কাঠের বাক্সকে চেয়ার বানিয়ে তার ওপর বসল সবাই। জিনার কাহিনী শোনার জন্যে উত্তেজিত হয়ে আছে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ভয়-টয় পাওনি তো?'

'পাইনি বলাটা ঠিক হবে না,' জিনা বলল, 'তবে আমার নিজের জন্যে নয়। বকালকার জন্যে।'

'বলে ফেলো, বলে ফেলো,' তাগাদা দিল মুসা।

সব খুলে বলল জিনা। কিছুই বাদ না দিয়ে। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

জিনার গল্প শেষ হলে কিশোর বলল, 'শোনো, একথা কিন্তু আংকেল বা কুপার, কাউকে জানানো যাবে না। আংকেল শুনলে অহেতুক রাগারাগি করবেন, হয়তো মূর্তির রহস্য ভেদ করাই বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের। আর কুপার শুনলে দুশ্চিন্তা

করবেন। কাজেই আপাতত কাউকেই কিছু বলব না আমরা। চুপচাপ তদন্ত চালিয়ে যাব।'

'এক কাজ করতে পারি।' পরামর্শ দিল মুসা, 'আরেকটা তালা লাগিয়ে দিতে পারি ছাউনির দরজায়।'

'তাতে তেমন লাভ হবে বলে মনে হয় না,' রবিন বলল। 'ওদের কাছে স্কেলিটন কী আছে। একটা তালা খুলতে পারলে আরেকটাও পারবে।'

'কিন্তু আছে কি মূর্তিটাতে যে এত খেপে গেছে নেয়ার জন্যে!' জিনা বলল।

'আমার ধারণা, জিনিসটাই দামী,' মুসা বলল। 'অ্যানটিক মূল্য অনেক বেশি, কুপার বুঝতে পারছেন না।'

'তা হতে পারে,' রবিনও একমত হলো তার সঙ্গে। 'হয়তো কোন ধনী লোক ওরকম একটা মূর্তি চেয়েছেন কোন ডিলারের কাছে। সেই লোক কুপারের কাছে আছে খোঁজ পেয়ে প্রথমে কিনে নিতে চেয়েছিল। কুপার বেচতে রাজি না হওয়ায় চুরি করারই মতলব করেছে। অ্যানটিকের দামের ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যায় না। অনেক পাগল আছে অতি সাধারণ একটা জিনিসও আকাশ ছোঁয়া দাম দিয়ে কিনে নেয়।'

'আমার তা মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'অন্য কোন ব্যাপার আছে।'

জিনা সুর মেলাল ওর সঙ্গে, 'আমারও না। রহস্যটা কি জানতেই গিয়েছিলাম ছাউনিতে। এই সময় এল চোর দুটো।'

'তাহলে এখন আরেকবার গেলেই পারি?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আমরা এখন লোক বেশি। আবার যদি আসে ব্যাটারা, এবার আর ছাড়া হবে না। ধরে ঠ্যাঙাব।'

'তা যাওয়া যায়,' কিশোরও যেতে রাজি, 'চলো। শব্দ করবে না কেউ। আংকেল আর আন্টিকে জাগানো চলবে না।'

পা টিপে টিপে একসারিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা। বাইরে বেরোল। বাগান পার হয়ে ছাউনিতে পৌঁছতে দেরি হলো না।

টর্চটা জিনার হাতে দিয়ে কিশোর বলল, 'এটা ধরে রাখো। মুসা, রবিন, এসো। ধরো। শোয়াতে হবে মূর্তিটাকে।'

বেজায় ভারি মূর্তি। তিনজনে মিলে তুলে শোয়াতেও ঘাম ছুটে গেল। সবে কাত করেছে, এই সময় রাফি করল এক অকাজ। মুসার পা ঘেঁষে এল। তারপর ভালমত দেখার জন্যে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল তার দুপায়ের ফাঁকে। টলে উঠল মুসা। দুলে উঠল মূর্তিটা। ধরে রাখতে পারল না কিশোর আর রবিন। দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে না আনলে রবিনের পায়ের ওপরই পড়ত।

'হায় হায়!' আঁতকে উঠল কিশোর, 'ভেঙে যায়নি তো! কুপারের কাছে সাংঘাতিক লজ্জায় পড়তে হবে তাহলে!'

কাছে থেকে টর্চের আলো ধরল জিনা। ঝুঁকে বসে দেখতে শুরু করল কিশোর আর রবিন। রাফিকে বকা দিল মুসা। লজ্জা পেয়ে সরে বসল কুকুরটা। আধখানা জিভ বের করে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল তার দিকে। যেন আর একটা

কথা বললেই কেঁদে ফেলবে।

'ব্যাটা ভীষণ চালাক,' মুসা বলল। 'বকাও দেয়া যায় না, অমনি মুখ ভার করে ফেলে।'

হেসে ফেলল জিনা।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'মুসা, রাফিকে ধন্যবাদ দাও! ফেলে দেয়ার কাজই হয়েছে!'

রবিন কি দেখতে পেয়েছে দেখার জন্যে ঝুঁকে এল সবাই। মূর্তির বুকে খোদাই করা ব্রেস্ট প্লেটটা ফেটে গেছে।

'খাইছে!' মুসা বলল, 'সর্বনাশ করে ফেলেছি! ভীষণ দুঃখ পাবেন কুপার। আমাদের কাছে রেখে গেলেন নিরাপদে রাখার জন্যে। আর আমরাই নষ্ট করে ফেললাম।'

কিশোর কথা বলছে না। জিনার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ফাটা জায়গাটায় আলো ফেলল ভাল করে দেখার জন্যে। ভেতরে কি যেন চকচক করছে।

'আরি!' রবিন বলল, 'ভেতরে কি জানি আছে!'

'ধরো,' টর্চটা রবিনের হাতে গুঁজে দিয়ে নতুন কেনা পেননাইফটা পকেট থেকে বের করল কিশোর। ফলাটা খুলে নিয়ে মূর্তিটার বুকের ওপর ঝুঁকল। অন্যেরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। কাঠের ওখানটায় যে ফাঁপা কল্পনাই করেনি ওরা। এখন দেখল, ভেতরে একটা খোঁড়ল আছে। ব্রেস্ট প্লেটটা তার ঢাকনা। এমন নিখুঁত ভাবে বসানো হয়েছিল, বোঝাই যায়নি যে ওটা আলগা। খুব শক্ত করে লাগানো হয়েছিল। অনেক ধকল সহ্য করেছে। ট্রাক থেকে পড়ে নিশ্চয় কিছুটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার পড়ার পর ফাঁক হয়ে গেছে।

সেই ফাঁকের মধ্যে ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। প্রথমে নরম কিছুতে লাগল, তারপর শক্ত কিছুতে।

'একটা চিমটা পেলে ভাল হত,' বলল সে। 'জিনা, আংকেলের কাছে অনেকগুলো দেখেছি...'

'দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।'

'বড় আর শক্ত দেখে এনো। ছোটগুলোতে হবে না।'

স্টাডি থেকে একটা বড় চিমটা নিয়ে এল জিনা। কিশোরের হাতে দিল। চিমটা দিয়ে টেনে প্রথমে তুলার একটা দলা বের করল কিশোর।

'ভেতরে আরও কিছু আছে,' রবিন বলল। 'চকচকে কিছু।'

'তা তো আছেই। শুধু শুধু তুলা ঢোকায়নি। অন্য কিছু আছে, যেটাকে নিরাপদে রাখার জন্যে এই তুলার প্যাড দিয়েছিল।'

'দেখো না আর কি আছে?' মুসা বলল।

আবার চিমটা ঢোকাল কিশোর। চেপে ধরে একটা চকচকে পাথর তুলে আনল। ফাঁকের বাইরে বের করতে পারল না। আলগা নয় পাথরটা। বড় কিছুতে আটকানো। পাথরটা ছেড়ে দিল সে। ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার ওটা।

'বের করতে হলে ব্রেস্ট প্লেটটা খুলতে হবে,' বলল সে।

একটা বাটালি খুঁজে বের করে আনল মুসা। ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে চাড় দিল। খুলে এল ঢাকনাটা। ভেতরে তুলার গদিতে শুয়ে আছে অবিকল একই রকম দেখতে আরেকটা ব্রেস্ট প্লেট। তবে সোনার তৈরি। তাতে দামী দামী পাথর বসানো।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে। রাফিও যেন অবাক, চুপ করে চেয়ে আছে। জ্বলন্ত সূর্যের মত করে তৈরি হয়েছে প্লেটটা। রশ্মিগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সারি দিয়ে বসানো আছে সবুজ আর পানসে রঙের পাথর।

রেফারেন্স বইতে এসব পাথরের ছবি দেখেছে রবিন। বলল, 'পানসেগুলো হীরা, আর সবুজগুলো পান্না।'

'রত্ন লুকানোর দারুণ জায়গা বের করেছে,' মুসা বলল।

'হুঁ,' মাথা দোলাল জিনা, 'এজন্যেই মূর্তিটা নেয়ার জন্যে খেপে গেছে ডোনাই।'

'যা মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'জিনিসটাকে দেশ থেকে বেআইনীভাবে বের করার জন্যেই মূর্তিটাকে ব্যবহার করেছে।'

'কিন্তু এর মধ্যে কুপারের কি ভূমিকা?' রবিনের প্রশ্ন।

'নাহ্, কুপার এসবের মধ্যে নেই,' জিনা বলল।

'তাহলে তাঁর কাছে জিনিসটা পাঠানো হলো কেন?'

'তা-ও তো কথা।'

তিনজনেই জবাবের আশায় তাকাল কিশোরের দিকে।

'আরেকটা রহস্য!' বলল কিশোর। 'কুপার এসবে জড়িত থাকলে প্লেটটা অনেক আগেই সরিয়ে ফেলতেন। তাহলে ধরে নেয়া যায় এটার কথা জানেন না তিনি।'

'তাহলে হয়তো ভুল করে জিনিসটা পাঠানো হয়েছে তাঁর কাছে,' অনুমান করল রবিন। 'আসল ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে। বাক্স আর মোড়কের কাগজ-টাগজগুলো এখনও আছে কিনা কে জানে।'

'মনে হয় না। সেদিন বললেন না, কাগজপত্র আর হিসেব ঠিকমত রাখতে পারেন না বলে বকা শুনতে হয় তাঁর পার্টনারের কাছে। কোন জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারেন না। আর জিনিসের মোড়ক রাখবেনই বা কি করতে? জায়গা নষ্ট হয়, নোংরা হয়ে থাকে। ভুল করে যদি পাঠানো হয়েই থাকে, সঠিকটা বের করা মুশকিল হয়ে যাবে।'

'একেবারেই কি বের করা যাবে না?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'যাবে না বলছি না। চেষ্টা তো করবই।'

'কি ভাবে?'

'চোরগুলোকে ধরতে হবে। তারপর ওদের মুখ থেকে কথা আদায় করতে হবে।'

'কিশোর,' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল রবিন, 'পুলিশকে গিয়ে জানালেই পারি। ওরা সহজেই বের করে নিতে পারবে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'পারবে না। পুলিশকে জানালে খবরের কাগজের লোকেরাও জেনে যাবে। দেবে ছেপে। ডোনাইয়ের চোখ পড়বেই তাতে। দুই সহকারীকে নিয়ে তখন এমন ডুব দেবে, আর পাওয়া যাবে না ওদেরকে।'

'পালাতে তো দেয়া যাবেই না ব্যাটাদেরকে,' জোর গলায় বলল মুসা, 'কিছুতেই না। আমার বিশ্বাস, বড় কোন চোরাচালানী দলের লোক ওরা। সারা দুনিয়ার কাস্টমসকেই নানা ভাবে চালাকি করে ফাঁকি দিয়ে আসছে। চুরি করে বেড়াচ্ছে দামী দামী সব আর্ট। ধরতে পারলে একটা কাজের কাজই হয়।'

'কিন্তু মুসা,' রবিন বলল, 'এসব কাজ আমাদের চেয়ে অনেক ভাল পারবে পুলিশ।'

'এ মুহূর্তে পুলিশের চেয়ে বেশি সুযোগ আমাদের হাতে,' কেসটা হাতছাড়া করতে রাজি নয় কিশোর। 'ফাঁদ পাতব আমরা, এই ছাউনিতেই। বকালকাপককে আরেকবার চুরির চেষ্টা ওরা করবেই। তখনই হাতেনাতে ধরতে হবে ওদেরকে।'

প্ল্যানটা খুলে বলল কিশোর। সবারই পছন্দ হলো বুদ্ধিটা। কাজে লেগে গেল। ঠুকে ঠুকে ব্রেস্ট প্লেটটা লাগিয়ে দিল আবার মুসা। টুকটাক জিনিস দিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র বানিয়ে ফেলল কিশোর। ছোট একটা অ্যালার্ম ঘড়ির সঙ্গে যুক্ত করে বসিয়ে দিল মূর্তির মাথার পেছনে ফোকরের মধ্যে। এমন কৌশল করে রাখল, মূর্তিটাকে ধরে তুললেই বেজে উঠবে অ্যালার্ম। শব্দ বহুগুণ বেড়ে গিয়ে অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। বাড়ির বেডরুমে থাকলেও ঘুম ভাঙিয়ে দেবে ওদের।

'ব্যস, কাজ শেষ,' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কিশোর। 'অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন। চলো।'

ঘরে ফিরে চলল ওরা। সোনার ব্রেস্ট প্লেটটা হাতে করে নিয়ে চলল কিশোর। পরদিন গিয়ে দিয়ে আসবে কুপারকে।

সকালবেলা সব কথা শুনে তো কুপার অবাক। দোকানের পেছনের ঘরে বসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চা খাচ্ছেন আর ওদের কথা শুনছেন তিনি। সবাই চা খায় না, সে জন্যে এক বোতল অরেঞ্জ স্কোয়াশও এনে রেখে দিয়েছেন। যার ইচ্ছে হবে খাবে।

কথা শেষ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে প্লেটটা বের করল কিশোর। 'আমরা যে একটা মিথ্যে কথাও বলিনি এই হলো তার প্রমাণ।'

সোনার অসামান্য জিনিসটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কুপার। অনেকক্ষণ কথা সরল না মুখে। অবশেষে তোতলাতে শুরু করলেন, 'খোদা…এরকম জি-জিনিস জীবনেও দে-দেখিনি!'

তাঁর অবাক হওয়া দেখে না হেসে পারল না গোয়েন্দারা। তবে অবশ্যই মুখ টিপে হাসল, শব্দ করে নয়।

একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে প্লেটটা পরীক্ষা করতে বসলেন কুপার। 'আশ্চর্য! আশ্চর্য কারিগরী! অনেক পুরানো জিনিস, কোন সন্দেহ নেই। পাথরগুলোও সাংঘাতিক! মিউজিয়ামে রাখার মত জিনিস!' নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। 'শহরে নিয়ে গিয়ে ব্যাংকের ভল্টে রাখতে হবে।

এখানে রাখা মোটেও নিরাপদ না।' কিশোরের দিকে তাকালেন। 'কিশোর, আমার মনে হয় পুলিশকে জানানোই উচিত।'

শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'তাহলে চোরগুলোকে আর ধরা যাবে না, এ ব্যাপারে আমি শিওর। ফাঁদ পেতে রেখেছি। ওদেরকে ধরার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।'

ছোটবেলায় কুপারেরও খুব গোয়েন্দা হওয়ার শখ ছিল। অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত। পুলিশকে জানানোর জন্যে আর চাপাচাপি করলেন না কিশোরকে।

কিশোর বলল, 'আমাদের তদন্তে আপনাকে সাহায্য করতে হবে। মূর্তিটা যেদিন এসেছে, সেদিন ওটার সঙ্গে আর কি কি মাল ডেলিভারি দেয়া হয়েছে জানতে চাই। যেসব জিনিস দিয়ে প্যাকেট করে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো কি আছে?'

'না, ফেলে দিয়েছি। তবে অন্য মাল আর যা এসেছে সবই আছে। একটাও বিক্রি হয়নি।'

বকালকাপকের সঙ্গে বলিভিয়া থেকে এসেছে ব্রোঞ্জের তৈরি কিছু কুঁজো। সবাই মিলে খুঁটিয়ে দেখল ওগুলোকে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না।

'একটা ব্যাপার আমার কাছেও অবাক লেগেছে,' কুপার বললেন, 'ওই মূর্তি বা এসব কুঁজোর অর্ডার দিইনি আমি। ভেবেছি, আমার পার্টনার মারফি পাঠিয়েছে। দুদিন আগে চিঠি লিখেছিলাম তাকে, তোমাদেরকে বলা হয়নি। আজ সকালে জবাব এসেছে। এসব জিনিস সে-ও পাঠায়নি।'

'তার মানে ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ভুল করে আপনাকে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। ইস্, কে পাঠিয়েছে এটা যদি কেবল জানতে পারতাম!'

কিন্তু জানাটা সহজ নয়। কোনই সূত্র নেই। প্যাকেটের গায়ে নিশ্চয় লেবেল ছিল, সেগুলোও ফেলে দেয়া হয়েছে। খুঁজে আর বের করা যাবে না।

'চোরগুলো ধরা পড়লে জানা যেতে পারে,' রবিন বলল।

'যদি ধরা পড়ে,' অতটা আশা করতে পারছে না মুসা।

'ফাঁদ তো পাতাই হয়েছে,' জিনা বলল। 'পড়বে না কেন?'

'কি জানি!'

আট

তিন দিন তিন রাত পেরিয়ে গেল। মূর্তিটার ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ দেখাল না চোরেরা। এ কদিনে নতুন কিছুও ঘটল না। কেবল হঠাৎ করে কেরিআন্টিকে নিয়ে মিস্টার পারকারের ইংল্যাণ্ড চলে যাওয়া ছাড়া। একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হচ্ছে সেখানে। দাওয়াত পেয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি করেননি তিনি। ছেলেমেয়েরা আছে বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে। আইলিন তো আছেই। কাজেই আন্টিও খুব একটা আপত্তি করেননি যেতে। আর ছেলেমেয়েরা খুশিই হয়েছে, শান্তিতে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে ভেবে।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। রাতে বেডরুমের বাইরে

গিয়ে বসে থাকে, বারান্দা কিংবা হলঘরে পায়চারি করে, কান পেতে থাকে অ্যালার্ম শোনার জন্যে। কিন্তু সবই বৃথা। ঘন্টা আর শোনা যায় না।

চতুর্থ দিন সকাল থেকে ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল। রেডিও খুলে বসেছিল রবিন। মিউজিকের পর খবর শুরু হলো। খবরের বিশেষ বিশেষ অংশের মধ্যে এমন একটা খবর বলল, কান খাড়া করে ফেলল সবাই। সংবাদ পাঠক বলল ঃ *পেরু এবং বলিভিয়াতে একদল ডাকাতের উৎপাত বড় বেড়েছে। মিউজিয়ামের দামী দামী জিনিস চুরি করে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে ওরা।*

পুরো খবরটা শোনার জন্যে উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা।

প্রথমে বেশি জরুরী কয়েকটা খবর সেরে নিয়ে সেই বিশেষ সংবাদটা পাঠ করতে লাগল সংবাদ পাঠক ঃ *পেরু এবং বলিভিয়াতে একদল ডাকাতের উৎপাত বড় বেড়েছে বলে জানা গেছে। মিউজিয়ামের দামী দামী জিনিস চুরি করে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে ওরা। ইতিমধ্যেই লা পাজ, কাজকো, ও লিমার মিউজিয়াম থেকে অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে রয়েছে ইনকাদের আমলের বেশ কিছু কিউরিও এবং অ্যানটিক। একটা জিনিস তো খুবই দামী। একটা ব্রেস্ট প্লেট, ওটার নাম গোল্ডেন সান। সোনার তৈরি জিনিসটায় অনেকগুলো হীরা আর পান্না বসানো। মাসখানেক আগে চুরি গেছে ওটা। দলটাকে ধরার অনেক চেষ্টা করছে বলিভিয়ান পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে চোরাই মালগুলো পাচার করে দেয়া হচ্ছে ইউরোপ আর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, ওখানকার ধনী আর্ট সমঝদারদের কাছে বিক্রির জন্যে। ইনটারপোলকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।*

এরপর অন্য খবরে চলে গেল সংবাদ পাঠক।

রেডিও বন্ধ করে দিল রবিন।

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল সবাই।

'খাইছে!' অবশেষে মুখ খুলল মুসা, 'আসল ঘটনাটা জানা গেল তাহলে!'

আর দেরি করল না ওরা। বেরিয়ে পড়ল। সাইকেল নিয়ে রওনা হলো কুপারের দোকানে। দোকানের কাছে পৌঁছে দেখল, অনেক ভিড়। গাড়ি বোঝাই করে ট্যুরিস্টরা এসেছে। কাস্টমাররা না বেরোলে দোকানে ঢুকে লাভ নেই, শান্তিতে কথা বলতে পারবে না কুপারের সঙ্গে। সময় কাটানোর জন্যে তাই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পুরানো বইয়ের দোকানের সামনে চলে এল রবিন। পত্রিকাও বিক্রি হয় দোকানটায়। উইণ্ডোতে সাজানো একটা ম্যাগাজিনের কভারে দৃষ্টি আটকে গেল তার। ইনকাদের অলঙ্কার আর রত্ন নিয়ে কভার স্টোরি করেছে। কাকতালীয় মনে হলো রবিনের। একটু আগে রেডিওতে রত্ন চুরির খবর শুনে এল, এখন আবার পত্রিকায় এই জিনিস! ম্যাগাজিনটা হাতে নিল সে। উল্টে লেখাটা দেখে বুঝল, কাকতালীয় নয়। বেশ কিছুদিন থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার মিউজিয়ামে চুরির ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছে পত্র-পত্রিকায়। লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকলে অনেক

পত্রিকা ঘাঁটত, সে-ও জেনে যেত এতদিনে। এখানে এসে ঘাঁটা হয় না বলেই জানতে পারেনি এতদিন। গোল্ডেন সানেরও রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে, দেখেই চিনতে পারল সে। লা পাজ মিউজিয়াম থেকে চুরি গেছে। আরও কিছু জানা যাবে ভেবে ম্যাগাজিনটা কিনে নিল সে।

সত্যিই জানতে পারল। প্লেটটা পুরোটাই সোনার নয়। ভেতরে পাথরের তৈরি আরেকটা গোল চাকতি আছে। তাতে খোদাই করে কিছু মন্ত্র লিখেছিলেন প্রাচীন এক ইনকা পুরোহিত। এবং এই জিনিসটাই গোল্ডেন সানের অ্যানটিক মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

একেক জন একেক দিকে ঘুরতে গিয়েছিল। একটা জায়গায় এসে জমায়েত হলো ওরা। ম্যাগাজিনটা বন্ধুদের দেখাল রবিন। রত্ন চোরদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

খালি হলো কুপারের দোকান। শেষ কাস্টমারটিও বেরিয়ে যাওয়ার পর দোকানে ঢুকল গোয়েন্দারা। খবর শুনে যতটা না খুশি হলেন কুপার তার চেয়ে বেশি চমকে গেলেন। বললেন, 'পুলিশ কেবল এখন খবরটা পেলেই হয় যে জিনিসটা আমি নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে রেখে এসেছি। চোরের দলের সঙ্গে হাত আছে ভেবে সোজা এসে ধরবে আমাকে।'

'ধরে কিছু করতে পারবে না,' কুপারের অস্বস্তি দূর করার জন্যে বলল জিনা, 'আমরা সাক্ষি দেব যে আপনি কিছু করেননি।'

'তাতে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। এখনই গিয়ে পুলিশকে সব জানানো দরকার। তাহলে সন্দেহ কিছুটা কম করবে। ব্যাপারটা আর গোপন রাখার কোন মানে হয় না। লা পাজ মিউজিয়ামকে তার সম্পদ যত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেয়া যায়, সেই চেষ্টাই করা উচিত।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'সেই সঙ্গে চোরগুলোকেও পাকড়াও করতে হবে। ওরা ধরা না পড়ুক, এটা নিশ্চয় চান না আপনি?'

'কি বলতে চাও?'

'সেই পুরানো কথা। পুলিশকে বললে ওদেরকে আর ধরা যাবে না। যা করার আমরাই করতে চাই।'

কুপারকে বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হলো কিশোরকে। শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হলেন কুপার। বললেন, 'বেশ, আর দু-তিন দিন দেখব আমি। তারপর যদি কিছু করতে না পারো, পুলিশকে জানাতেই হবে।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। গোবেল ভিলায় ফিরে চলল। গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। চিন্তিত। গোল্ডেন সানের ব্যাপারে অনেক তথ্য জেনেছে বটে, কিন্তু তদন্ত এগোয়নি। যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে।

কিশোরের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাকে খুশি করার চেষ্টা চালাল জিনা। বলল, 'কেন এতদিন চোরেরা আসেনি জানো? আব্বার ভয়ে। আব্বা চলে গেছে। এখন আসবে দেখো। আজ রাতেই অ্যালার্ম বেজে উঠতে পারে...'

'আর বেজেছে!' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর।

দুজনের কথাই প্রায় ঠিক হলো। সে রাতেই এল চোর, কিন্তু অ্যালার্ম বাজল না। কিছু জানতেই পারল না কেউ।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসেছে ওরা, এই সময় রেগেমেগে আইলিন এসে বলল, 'তোমাদের না কতবার বলেছি বাগানের গেট খোলা রাখবে না? কাল রাতেও রেখেছিলে।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল জিনা। 'কই, কাল তো বিকেল থেকে বেরোইইনি আমরা! টেলিভিশন দেখেছি বসে বসে।'

'খুলল কে তাহলে? নিশ্চয় রাফি। এত পাজি হয়েছে না কুত্তাটা। পাহারা তো দেয়ই না, বসে বসে খায় আর অকাজ করে।' গজগজ করতে করতে চলে গেল সে।

অন্য সময় হলে রাফির এই বদনাম সহ্য করত না জিনা। এখন অন্য কথা ভাবছে বলে সেটা কানে তুলল না। তাকিয়ে আছে বন্ধুদের দিকে। সবার মনেই একটা কথা—গেট খুলে চোর ঢোকেনি তো?

লাফিয়ে উঠে ছাউনির দিকে দৌড় দিল ওরা।

সবার আগে পৌঁছল মুসা। দেখে, হাঁ হয়ে খুলে আছে দরজা। ছুটে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। যা ভয় করেছিল তাই। ঘরে নেই ইনকা দেবতা।

অন্যেরাও এসে দাঁড়াল তার পাশে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে শূন্য জায়গাটার দিকে, যেখানে আগের দিনও ছিল বকালকাপক।

'অ্যালার্ম বাজল না কেন?' আনমনেই বলল কিশোর। 'যন্ত্রটা তো ঠিকই কাজ করছিল। তাহলে?'

জবাব খুঁজে বের করল রাফি। ঘরের কোণে গিয়ে শুঁকতে লাগল। ভেঙেচুরে ফেলে রাখা অ্যালার্ম ঘড়ি আর ছোট যন্ত্রটা বের করে আনল। ওগুলোর পাশেই পড়ে আছে একটুকরো কাগজ। কুড়িয়ে নিল রবিন। নোট লিখে রেখে গেছে চোরেরা। জোরে জোরে পড়ল সে ঃ

> দেবতাকে নিয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে আর লাগতে এলে ভাল করবে না। ঘড়িটার যে দশা করেছি তোমাদেরও সেই দশা হবে। ঘুম ভাঙানোর জন্যে অ্যালার্মের প্রয়োজন হলে আরেকটা ঘড়ি কিনে নিও।
>
> ধন্যবাদ।

রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল জিনা। চোরগুলোকে ধরতে পারলে কি কি করবে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে ফেলল। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'আমাদেরকে চেনে না তো ওরা। তিন গোয়েন্দার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা নেই। তাই এমন করে বলতে পারল। দাঁড়াও, শয়তানের দল! হাসি বের করব আমরা তোমাদের।'

তার রাগ কমানোর জন্যে মুসা বলল, 'নিয়ে তো গেছে শুধু একটা কাঠের মূর্তি। আসল জিনিস তো আমাদের কাছেই রয়ে গেছে। নিয়ে যখন দেখবে ভেতরে কিছু নেই, হাসিটা কার গায়ে লাগবে তখন?'

তাই তো, এভাবে তো ভেবে দেখেনি। অনেকটা নরম হয়ে এল জিনা।

'নিয়ে তো গেছে,' রবিন বলল, 'এখন পড়বে আরও বড় বিপদে। ওদের বস্ ডোনাই ভাববে, ওরাই গাপ করে দিয়েছে প্লেটটা। ঘুম-নিদ্রা হারাম করে ছেড়ে দেবে ওদের।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। তাকে বলল মুসা, 'তুমি কিছু বলছ না যে?'

'অ্যাঁ!···ও, হ্যাঁ, ডোনাই যখন দেখবে প্লেটটা নেই, ঠিকই বুঝে ফেলবে কার কাজ। হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে আমাদের পেছনে।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। এটাও এতক্ষণ মনে পড়েনি কারও।

'এখনই গিয়ে কুপারকে জানানো দরকার,' আবার বলল কিশোর।

সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন অ্যানটিক ডিলার। তারপর সেই পুরানো কথাই বললেন আবার, পুলিশকে জানানো উচিত। চোরেরা আশা করবে, এই কাজটাই এখন করবেন কুপার। তা না করলেই সন্দিহান হয়ে উঠবে। ভাববে, ঠিক ঠিকই প্লেটটা তাঁদের হাতেই পড়েছে।

তাঁর কথায় যুক্তি আছে। সেটার প্রতিবাদ করতে পারল না কিশোর। চুপ করে রইল। যদিও এখুনি পুলিশকে জানানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই।

আরেকটা খবর দিলেন কুপার, 'আজ আবার কি এসেছে জানো?'

মুহূর্তে চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ। 'নিশ্চয় বলিভিয়া থেকে আবার কিছু!'

'হ্যাঁ। পাঁচটা কাঠের মূর্তি। এগুলোও বেশ দামী। মাত্র খুলে রেখে এলাম, তোমরা আসার একটু আগে। ভাল করে দেখারও সময় পাইনি। এসো, সবাই মিলেই দেখি।'

মূর্তিগুলো ছোট ছোট। আকারের তুলনায় বেশি ভারি। কুপার বললেন, 'ভারি কোন কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে। সবগুলোই বলিভিয়ান দেবতা। কাস্টমারদের বেশ পছন্দ এসব জিনিস।'

'এগুলো আসবে আপনি জানতেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'বলিভিয়ায় অর্ডার দিয়েছিলেন?'

'না। কি ভাবছ বুঝতে পারছি। পেয়ে আমিও অবাক হয়েছি। তোমরা না এলেও আমি ভাল করেই দেখতাম। এবার আর ভুল করতাম না।'

'তাহলে এখনই দেখে ফেলি, বকালকার মত কোন গোপন খুপরি আছে কিনা।'

একেকজনে একেকটা মূর্তি তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। হাতের তালুতে রেখে ওজন দেখল, ঝাঁকি দিল, টোকা দিল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগলেন কুপার।

সবার আগে চিৎকার করে উঠল জিনা, 'কান নড়ছে, দেখো, দেখো!'

কান ধরে মোচড় দিতেই ঘুরল ওটা। স্ক্রুর মত প্যাঁচ আছে। ঘুরে ঘুরে খুলতে শুরু করল। মাথার ভেতরেই রয়েছে খুপরিটা। কাত করতেই ঝরে পড়ল বারোটা পান্না।

বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন কুপার। তাকিয়ে রইলেন পাথরগুলোর দিকে। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'দামী কোন গহনা থেকে খুলে নেয়া হয়েছে এগুলো, আমি শিওর। কাটার কায়দা দেখেই বোঝা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার মিউজিয়ামগুলো দেখছি খালি করে ফেলছে চোরেরা।...দেখো, অন্য মূর্তিগুলোও দেখো।'

বাকি মূর্তিগুলোরও কান খুলে বের করা হলো আরও নানা রকম পাথর। হীরা, মোতি, চুনি, পান্নার ছোটখাট একটা স্তূপ হয়ে রইল টেবিলে।

কুপারের দিকে তাকাল কিশোর, 'বেশি দাম দিয়ে মূর্তি কেনার লোক এল বলে, তৈরি থাকুন। ভুল করে আবার মাল পাঠানো হলো আপনার কাছে। সব চোরাই মাল। চোরেরা তাদের মাল ফেরত চাইবেই। খুব সাবধান থাকতে হবে আপনাকে।'

'যারা চুরি করছে, তারা ওস্তাদ লোক, কিন্তু যাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে তারা কাঁচা,' হেসে বললেন কুপার। 'গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সে জন্যেই। চুরি করে কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে ঠিকই বের করে দিচ্ছে, গড়বড় হচ্ছে এখানে এসে।'

'মোড়কগুলো কোথায়? কার কাছে পাঠিয়েছে, নিশ্চয় ঠিকানা লেখা আছে,' উত্তেজিত হয়ে বলল কিশোর।

এবার আর মোড়ক ফেলেননি কুপার। না দেখে ফেলতেনও না।

আরেকটা অ্যানটিক শপের ঠিকানা লেখা রয়েছে। দোকানের নামটা দেখে চিনতে না পারলেও গাঁয়ের নামটা ঠিকই পারল জিনা। গোবেল বে। ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝে ফেলল। বলল, 'কয়েক মাইল দূরে আরেকটা গ্রাম আছে, গোবেল বে। আমাদেরটা গোবেল বীচ। *বে* আর *বীচের* ঘাপলা। আপনি এখানে নতুন দোকান খুলেছেন। ওখানেও নিশ্চয় কেউ আরেকটা নতুন অ্যানটিক শপ খুলেছে। যে পাঠিয়েছে সে ঠিকানা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু যে ডেলিভারি দিয়ে গেছে সে-ও নিশ্চয় নতুন লোক। বে আর বীচ অতটা খেয়াল করে দেখেনি। যেহেতু আপনারটাও অ্যানটিক শপ, ডেলিভারি দিয়ে চলে গেছে। প্রথমবার দেয়ার পর যদি আপত্তি করতেন আপনি, ভুল শুধরে দিতেন, তাহলে আর আসত না। আপনি কিছু বলেননি, চোরেরাও নিশ্চয় কিছু বলেনি, লোকটা ভেবেছে ঠিক জায়গাতেই দিচ্ছে। আরও একবার তাই মাল ডেলিভারি দিয়ে গেছে।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন কুপার, 'এরকম ভুল হতেই পারে। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠালে এ ভুলটা অবশ্য হত না।'

'চোরাই মাল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠানোর সাহস হবে না,' রবিন বলল।

'সে জন্যেই নিজেদের লোক দিয়ে পাঠিয়েছে। সেই লোকটা ফাঁকিবাজ, তাই ভুলটা করেছে।'

'করেছে যখন, ধরাও পড়বে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর। 'ভাল একটা সূত্র পেয়ে গেছি। ব্যাটাদের ধরেই ছাড়ব। আজই যাব গোবেল বে-তে।'

'চলো না লাঞ্চের পরই সাইকেল নিয়ে চলে যাই?' জিনা প্রস্তাব দিল।

তিন গোয়েন্দার আপত্তি নেই।

'সাবধানে থাকবে। খুব সাবধান,' সতর্ক করে দিলেন কুপার।

'তা তো থাকতেই হবে,' হাসি মুখে বলল রবিন। 'ভাববেন না। এসব করে অভ্যাস আছে আমাদের।'

নয়

বাড়ি ফিরে আইলিনকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলল জিনা। সুস্বাদু সব খাবার বানিয়ে রেখেছে আইলিন। গরম গরম প্লেট ভর্তি করে এনে দিল। সাইকেল চালিয়ে এসে খিদেও পেয়েছে। কাজেই সেগুলোর সদ্ব্যবহার করল ওরা। ভরপেট ভারি ভারি খাবার খাওয়ার পর ফ্রুট, সালাদ, পুডিং আর আইস ক্রীম প্রায় খেতেই পারল না কেউ, এমনকি মুসাও না। আফসোস করতে লাগল, বেহিসেবীর মত আগেই অন্য খাবার দিয়ে পেট বোঝাই করে ফেলায়।

তবে বুঝতে পারল খেয়ে ভালই করেছে। সাইকেল চালিয়ে অনেক দূর যেতে হবে। গোবেল বীচ থেকে গোবেল বে আধঘণ্টার পথ। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে যেন শুয়ে আছে ছোট্ট একটা গ্রাম। খুব গরম পড়েছে। জোরে সাইকেল চালালে ঘেমে নেয়ে যেতে হবে। তাই আস্তে আস্তে চলল ওরা।

গোবেল বে-তে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল। একসঙ্গে থাকলে চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। বিভিন্ন দিক থেকে এগোল একটা লক্ষ্যের দিকে।

সবার আগে অ্যানটিক শপটা খুঁজে বের করল জিনা। এসব এলাকা চেনা থাকায় কাজটা মোটেও কঠিন হলো না তার জন্যে। ছোট, নোংরা একটা বাড়িতে দোকান। দরজার বাইরে পড়ে আছে হাজারো জঞ্জাল। চেহারা দেখে মনে হলো না এখানে কোনকালে কোন লোক আসে।

সঙ্গে করে একটা দূরবীন নিয়ে এসেছে জিনা। রাস্তার পাশে ফেলে রাখা পুরানো একটা পানির ট্যাংকের আড়ালে দাঁড়িয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল। একটা মিনিটও পেরোল না, একজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল দোকান থেকে। ভাবভঙ্গিতে মনে হলো ওই লোকটাই দোকানের মালিক।

'লোকটাকে একটুও সুবিধের লাগছে না, কি বলিস রাফি?' ফিসফিস করে বলে পাশে বসা কুকুরটার মাথায় হাত রাখল জিনা। 'হোঁৎকা, পেটমোটা একটা ব্যাঙ! চোখগুলো কেমন দেখেছিস? দেখলে ভয় লাগে। ওই ব্যাটা খুনও করতে পারবে।'

জঞ্জালের মধ্যে মিনিটখানেক কি যেন খুঁজে বেড়াল লোকটা। তারপর গলা বাড়িয়ে হাঁক দিল, দূরে থেকেও শুনতে পেল জিনা, 'এই হ্যারি, এসো তো একটু। একা পারব না।'

'আসছি, মিস্টার ডোনাই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন লোক। দেখেই চিনতে পারল জিনা। সেই লাল চেক শার্ট পরা কাউবয়। আর কোন সন্দেহ রইল না তার। এই দোকানটাই চোরদের আড্ডা।

আপাতত আর কিছু দেখার নেই এখানে। চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে খাপে

ভরছে সে, এই সময় তৃতীয় লোকটাকে দেখতে পেল। রাস্তা পার হয়ে দোকানের সামনে দাঁড়ানো দুজনের দিকে এগোচ্ছে। ধোপদুরস্ত পোশাক পরা জন। গাঁয়ের এই নোংরা পথে ফিটফাট লোকটাকে বেমানানই লাগছে।

এই সময় মুসাকেও আসতে দেখে থামতে ইশারা করল জিনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়াল তার কাছে। কি দেখেছে জানাল।

একে একে কিশোর আর রবিনও এসে হাজির হলো সেখানে।

যা জানার দরকার ছিল, জানা হয়ে গেছে। দোকানের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এল ওরা। তারপর একটা জায়গায় জিরাতে বসল। আলোচনাও চলল একই সঙ্গে।

কিশোর বলল, 'গাঁয়ের লোকের কাছে ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া দরকার। কাছাকাছি আরও দোকান আছে দেখেছি। চলো, আবার যাই।'

কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়ে আবার উঠল ওরা। অ্যানটিক শপ থেকে খানিকটা দূরে একটা দর্জির দোকান দেখে থামল। কথা বলার জন্যে রবিনকে পাঠাল কিশোর। ওরা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

দোকানের মালিক এক বৃদ্ধা। কায়দা করে তার কাছে ডোনাইয়ের ব্যাপারে জানতে চাইল রবিন। মহিলা জানাল, প্রায়ই মাল আসে ডোনাইয়ের কাছে। অনেক মাল। কিন্তু ওগুলো কারও কাছে বিক্রি করতে দেখা যায় না। কোন কাস্টমারই ঢোকে না দোকানে। এই গাঁয়ে দেখারও কিছু নেই, ট্যুরিস্টও আসে না। অ্যানটিক কে কিনবে? গাঁয়ের লোকে ডোনাইয়ের দুর্ভাগ্যে নাকি দুঃখই করে। পয়সা খরচ করে দোকান দিয়ে যদি বিক্রিই করতে না পারল সে *বেচারা* ছাড়া আর কি?

জেনে এসে বন্ধুদেরকে খবরটা জানাল রবিন।

'বেচারা না ছাই,' মুখ ঝামটা দিল জিনা। 'এ গাঁয়ে যে সে সব চেয়ে বেশি ব্যবসা করে একথা তো আর জানে না কেউ। তবে জানবে, শীঘ্রি।'

গোবেল বীচে ফিরে চলল গোয়েন্দারা। খুশি। সফল হয়েছে।

'অ্যাই যে,' ওদেরকে ঢুকতে দেখেই কাউন্টারের ওপাশ থেকে হাত তুললেন কুপার, 'গিয়েছিলে? কিছু করতে পারলে?'

সব কথা জানানো হলো তাঁকে।

'ঠিকই আন্দাজ করেছিলে তাহলে,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন কুপার। 'চোরের আড্ডা তো বের করলে। এখন বোধহয় পুলিশের কাছে যাওয়া যায়?'

'ওরাই যে চুরি করেছে তার কি প্রমাণ আছে? না, এখনও পুলিশকে বলার সময় হয়নি। ওদের ব্যাপারে আরও জানতে হবে আমাদের। চোরাই মালসহ হাতেনাতে ধরতে হবে।' সঙ্গীদের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'আবার গোবেল বে-তে যাব আমরা। রাতে। অন্ধকারে তদন্ত চালাব এবার।'

'বলো কি!' আঁতকে উঠলেন কুপার। 'অমন কাজও কোরো না। দিনের বেলা যাওয়া এক কথা, কিন্তু রাতে…অসম্ভব!'

'কিন্তু যেতেই হবে আমাদের।'

কিশোরের কথার সঙ্গে মুসা যোগ করল, 'আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন। এ

ধরনের কাজ আমরা অনেক করেছি।'

ভাবলেন কুপার। মাথা নাড়লেন, 'বেশ, তাহলে এক শর্তে আমি হ্যাঁ বলতে পারি। আমার ব্যাপারেই তো তদন্ত করছ। জোর করার অধিকার আমার আছে, কি বলো? আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। সাইকেলে করে নয়, আমার গাড়িতে করে।'

কুপারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের আপত্তি না থাকলেও কিশোরের ভাল লাগল না। তবু তিনি ওদেরকে তাঁর ব্যাপারে নাক গলাতে না করে দিতে পারেন এই ভয়ে সরাসরি বলতে পারল না যে সঙ্গে নিতে চায় না।

কুপারকে ঠেকানোর শেষ চেষ্টা করল, 'ভুল করে মূর্তিটা আপনার দোকানে দিয়ে গেল, অথচ ডোনাই এসে কেন সেটা আপনার কাছে চাইল না, বলল না যে ওটা ওর জিনিস, কখনও এ প্রশ্নটা জেগেছে আপনার মনে?'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকালেন কুপার, 'না তো?'

'আমি এখন জানি, কেন। ডোনাই বুঝতে পারছিল না আপনি কিছু সন্দেহ করেছেন কিনা। একজনের মাল আরেকজনের কাছে দিয়ে গেলে সাধারণ ভাবেই সন্দেহ জাগার কথা। আপনার যে জাগেনি এটা কল্পনাই করতে পারেনি সে। বরং ভেবেছে, চাইতে এলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। নিজের পরিচয় ফাঁস করে দেয়ার ভয় আছে। তার চেয়ে অন্য লোক পাঠিয়ে ওটা কিনে নেয়াই ভাল মনে করেছিল। পারেনি যখন, তখন চুরি করেছে। আপনার ওই পাঁচটা মূর্তির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটবে।

'ঠিকানায় যদি ডোনাইয়ের নাম দেয়া হত, তাহলে এই ভুলটা ঘটত না। সে-ই নিশ্চয় নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে নাম দিতে মানা করেছে বলিভিয়ার লোকদের। তাই ওরা শুধু *অ্যানটিক শপ* লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে।

'আপনার কাছে দিয়ে যাওয়ায়, আমার ধারণা, খুশিই হয়েছে ডোনাই। কোন কারণে পুলিশ সন্দেহ করে বসলে আপনাকে ধরবে, সে যে জড়িত এটা জানতেই পারবে না, পার পেয়ে যাবে সে।' সরাসরি কুপারের দিকে তাকাল কিশোর, 'মিস্টার কুপার, আমার বিশ্বাস, দেরি করবে না লোকটা। বকালকাপককে নিতে দেরি করে একবার ছ্যাঁক খেয়েছে তো। আজ রাতেই চুরি করতে আসবে। কাজেই আজকে আপনার দোকানে থেকে পাহারা দেয়াই ভাল।'

মুচকি হাসলেন কুপার। কিশোরের চালাকি বুঝে ফেলেছেন। 'কেন তুমি এত কথা বলছ, খুব ভালমতই বুঝতে পারছি। কিন্তু কোন কিছু করেই আমার গোবেল বে-তে যাওয়া বন্ধ করতে পারবে না। আমি যাবই। একা একা তোমাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। মূর্তিগুলোর কথা বলছ তো? আমার মনে হয় না, এত তাড়াতাড়ি কিছু করবে ওরা। প্রথমে কিনে নেয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে ওদের ঝুঁকি কম। পুলিশের চোখে আমাকে সন্দেহের পাত্র করে তোলার সুবিধে। কপাল গুণে চান্সটা যখন পেয়েই গেছে ছাড়বে বলে মনে হয় না। অগত্যা যদি আমার কাছ থেকে কিনতে না-ই পারে, তখন অন্য চেষ্টা করবে। তার মানে আরও দু-তিন দিন সময় আছে। তারপরেও অবশ্য ঝুঁকি নিচ্ছি না আমি। গোল্ডেন প্লেটটা যেখানে গেছে পাথরগুলোও সেখানেই যাবে। আজই নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে রেখে

আসব। মূর্তিগুলো তখন নিলে নিক না নিলে নেই, কিছু এসে যায় না।'

মনে মনে খুবই হতাশ হলো কিশোর। তবে মুখে সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল, যাক। গেলে সবই যে খারাপ হবে তা নয়। কিছু ভাল দিকও আছে। গাড়িতে করে যেতে পারবে। দিনে অতটা পথ সাইকেল চালিয়েছে, রাতের কষ্টটুকু বাঁচবে। তাছাড়া সময়ও বাঁচবে।

গোবেল ভিলায় ফিরে চলেছে ওরা। ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর, পারকার আংকেল আর আন্টি চলে যাওয়ায় খুব ভাল হয়েছে। নইলে রাতে বেরোনো মুশকিল হয়ে যেত, কৈফিয়ত দিতে দিতেই জান বেরোত। আইলিনকে বোঝানো কিছুই না। তাছাড়া বোঝানোর প্রয়োজন পড়বে বলেও মনে হয় না। গরম পছন্দ করে না সে। তাড়াতাড়ি শুতে চলে যাবে।

কাজেই সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা, কোন রকম ঝামেলা হলো না। সাইকেল নিয়ে চলে এল কুপারের দোকানে। ওদেরই অপেক্ষায় আছেন তিনি। দোকানের ভেতর সাইকেলগুলো তুলে রেখে গাড়িতে উঠে বসল ওরা। গাড়ি ছেড়ে দিলেন কুপার।

গোবেল বে-তে পৌঁছে গাঁয়ের সীমানার কাছে গাড়ি পার্ক করলেন তিনি। গাড়ি থেকে নেমে বললেন, 'তোমরা বসো। আমি ঘুরে দেখে আসি কি অবস্থা। তারপর ভাবব কি করা যায়। বসো, যাবে না কোথাও।'

'আচ্ছা' বলে ফেলতে যাচ্ছিল রবিন, হাত ধরে চাপ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল কিশোর। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কুপার।

'বসেই থাকব নাকি আমরা?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কোন কারণ নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা তো আর তাঁকে কথা দিইনি।'

'কিন্তু এসে আমাদের না দেখলে রাগ করবেন,' জিনা বলল।

'সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যদি বুঝি যাওয়া দরকার কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। তবে আপাতত বসেই থাকছি।'

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তবু কুপারের দেখা নেই।

'কিছু হলো না তো তাঁর?' দুশ্চিন্তা হচ্ছে কিশোরের। 'চলো তো, দেখি।'

গাড়ি থেকে নেমে ঘুমন্ত গাঁয়ের পথ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল পাঁচজনের দলটা। কিছুদূর এগোতেই একটা ছায়াকে নড়তে দেখে ঝট করে সরে চলে এল একটা দেয়ালের পাশে। এগিয়ে এল ছায়াটা। ও, কুপার। নিরাপদেই আছেন।

'অ্যাই, তোমরা নাকি? এখানে কি করছ? গাড়ি থেকে নামলে কেন?'

'আপনার দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল,' কিশোর বলল। 'কি হলো দেখতে যাচ্ছিলাম। অ্যানটিক শপের ওপর নজর রাখছিলেন নাকি? এত দেরি হলো যে?'

'হ্যাঁ। গাড়িতে করে এইমাত্র বেরিয়ে গেল ওরা। এত রাতে ওদের কোথায় কি কাজ খোদাই জানে।'

কিশোর বলল, 'এটাই আমাদের সুযোগ। দোকানে ঢুকব। বকালকাপকের কি অবস্থা দেখি।'

অবাক হলেন কুপার। 'সত্যিই বলছ? চুরি করে দোকানে ঢুকবে?'

'না ঢুকলে দেখব কি করে? গোয়েন্দাগিরিতে চুরি বলে কিছু নেই। রহস্য ভেদ করতে হলে অনেক কিছুই করতে হয়।'

'ঢুকবে কি করে? দরজা ভেঙে? সেটা উচিত হবে না...'

হাসল কিশোর। 'দরজা ভাঙার বোধহয় প্রয়োজন পড়বে না। সব চেয়ে কড়া পাহারা থাকে যে দুর্গে তারও কোন না কোন দুর্বল জায়গা থাকে। আর এটা তো সাধারণ দোকান। সামনের দিক দিয়ে সুবিধে করতে পারব বলে মনে হয় না। পেছন দিকে দেখতে হবে। ঢোকার উপায় একটা বেরোবেই।'

কিশোরের যুক্তির কাছে হার মানতে হলো কুপারকে। বাধা দেয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দিতে পারলেন না।

'দিনের বেলা দেখে গেছি,' কিশোর বলল, 'মূল বাড়ির বাইরেও দুটো ঘর, একটা ছাউনি আর একটা গ্যারেজ আছে। এক সঙ্গে না গিয়ে ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে আমাদের। দোকানের পেছনে গিয়ে একসাথ হব। মিস্টার কুপার, জিনা আর রবিনকে নিয়ে আপনি ডান দিক দিয়ে যান। মুসা, আমি আর রাফি যাচ্ছি বাঁয়ে। রাফি, একদম চুপ থাকবি, টু শব্দও নয়। মুসা, এসো। দেরি করলে কখন আবার চলে আসে চোরগুলো...'

দোকানের পাশের ছাউনির দরজার কড়া নাড়ল কিশোর। ধাক্কা দিয়ে দেখল। তালা দেয়া। বাঁ পাশ ঘুরে পেছন দিকে রওনা হলো। আগে আগে চলল রাফি। কোণ ঘুরতেই আরেকটা দরজা চোখে পড়ল। ওটাতেও তালা লাগানো। দরজার দুপাশে দেয়ালের বেড়া। বেশি উঁচু নয়। ওপাশে বোধহয় চত্বর-টত্বর আছে। সেখানে পুরানো মাল রাখা হয়।

চাঁদের আলোয় মুসার দিকে তাকাল কিশোর। বলল, 'দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও। ওপরে উঠব।'

মুসার কাঁধে ভর দিয়ে দেয়ালে চড়ে বসল সে। ঠিকই আন্দাজ করেছে। সামনে খোলা চত্বর। লাফিয়ে নিচে নেমে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল রাফি আর মুসার ঢোকার জন্যে।

নানা রকম জঞ্জাল ফেলে রাখা হয়েছে চত্বরে। 'আগে এখানেই খুঁজি,' কিশোর বলল।

'কুপারের সঙ্গে আসাতে ভালই হয়েছে বুঝলে,' মুসা বলল। 'সাইকেলে করে এলে বকালকাকে নিতে পারতাম না।'

'নেব কিনা এখনও জানি না। খুঁজে তো বের করি আগে।'

টর্চের আলোয় খুঁজতে খুঁজতে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ মুসা। কিশোরকে ডাকল, 'এই, দেখে যাও। ওই টুকরোগুলো বকালকার না হলে আর কি বললাম...'

কিশোরও দেখল। নিচু হয়ে হাত বোলাল ছোট একটা কাঠের টুকরোয়। মুসার কথা ঠিক। বকালকাপকই। যে কাঠটায় হাত দিয়েছে কিশোর, সেটা ছিল দেবতার পা। আরও অনেকগুলো টুকরো পড়ে আছে একই জায়গায়। মাথাটা কেটে দুটুকরো করা হয়েছে। কাঠের ব্রেস্ট প্লেট আর তার নিচের অংশ কয়েক টুকরো। ওই

জায়গাটার ওপরই নজর দেয়া হয়েছে বেশি। কাটার পর মূর্তিটাকে পোড়াতে চেয়েছিল, তবে ভালমত পোড়ার আগেই নিভে গেছে আগুন। আর বোধহয় খেয়াল করেনি ওরা।

'একেবারে শিওর হয়ে গেলাম এখন,' কিশোর বলল। 'বকালকাকে ওরাই এনেছে, এখানেই এনেছে। জানে এটাতে করে চোরাই মাল এসেছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে এটার ভেতর। পায়নি। পুড়িয়ে সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দিতে চেয়েছে।'

আর কিছু দেখার নেই। আঙিনা থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কুপাররা। সব কথা জানাল কিশোর। কুপার বললেন, 'ওদের জিনিস ওরা পুড়িয়েছে, আমার কিছু না। কিন্তু এরকম একটা শিল্পকর্ম পুড়িয়ে নষ্ট করল! দুঃখই লাগছে।'

এই প্রথম পুলিশের কাছে যাওয়ার কথা বললেন না তিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বলল, 'মিস্টার কুপার, কোথায় গেছে ওরা বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি। আপনার দোকানে। এতক্ষণে হয়তো তালা ভেঙে ঢুকে পড়েছে। গোল্ডেন সান আর পাথরগুলো খুঁজছে।'

'তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। চলো।'

দোকানের কাছে এসে গাড়ির আলোয়ই দরজাটা দেখতে পেলেন কুপার। অক্ষতই আছে। সব কিছু শান্ত, নীরব। চোরগুলো দোকানে ঢুকেছিল বলে মনে হলো না। হয়তো অন্য কোথাও গেছে। এখানে আসার ইচ্ছে থাকলেও এসে পৌঁছায়নি এখনও।

কিন্তু না, ওরা এসেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গেল দরজা খুলতেই। মেঝেতে পড়ে আছে একটা চিঠি। দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিয়েছে।

দশ

'কি লেখা আছে?' কুপারের গা ঘেঁষে এল রবিন। 'নিশ্চয় ডোনাই আর তার দুই দোস্ত?'

'দাঁড়াও, দেখি,' কুপার বললেন। 'মুখোমুখি হতে মনে হয় ভয় পেয়েছে। তাই চিঠি লিখে রেখে গেছে।'

কিন্তু পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে নিয়ে একটা সাদা কাগজে সাজিয়ে বসিয়ে লেখা হয়েছে চিঠিটা। নীরবে একবার পড়ে সবাইকে শোনানোর জন্যে জোরে জোরে পড়লেন আরেকবার ঃ

> আমাদের গোল্ডেন সান আর পাঁচটা মূর্তি ফেরত না দিলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে। দ্বিতীয়বার আর হুঁশিয়ার করব না। কাল রাত দুটোয় ডেভিলস রকের নিচের সৈকতে নিয়ে আসবে ওগুলো। পুলিশের কাছে যাবে না। গেলে বুঝবে মজা। একা আসবে।

সই নেই। কে লিখেছে তার নাম নেই।

'ডেভিলস রকের নিচে, সৈকতে,' বিড়বিড় করল জিনা। 'জায়গাটা চিনি। ওখান

থেকে আমার দ্বীপটা বড় জোর আধমাইল।'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'সময়ও তো নেই। মাত্র একটা দিন। এত তাড়াতাড়ি ব্যাটাদের গারদে ভরা যাবে না। কি করব?'

'কি আর,' রাগত স্বরে বললেন কুপার। 'যা ইচ্ছে করুক। জিনিসগুলোতে হাত ছোঁয়াতে দেব না।'

'এক কাজ করব,' কিশোর বলল।

'কি কাজ?'

'সহজ। কুপার গিয়ে ওদেরকে বলবেন জিনিসগুলোর কথা তিনি কিছু জানেন না। বলবেন মূর্তিটা চুরি হয়ে গেছে। তারপর পাঁচটা মূর্তি দিয়ে দেবেন। তার ভেতরে কিছু রঙিন কাঁচ ভরে দেব। ব্যস...'

মুসা বলল, 'ওরা সেটা মানবে...'

'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। ওঁরা যখন কথা বলবেন আমরা তখন দূরে দাঁড়িয়ে নজর রাখব। পুলিশকেও খবর দেয়া হবে। মিস্টার কুপার তাদের জানিয়ে রাখবেন, যাতে ওরা আগেভাগেই এসে লুকিয়ে বসে থাকতে পারে। চোরগুলো এলেই ধরবে।'

ভুরু কোঁচকালেন কুপার, 'পুলিশকে ডাকবে তাহলে শেষ পর্যন্ত?'

'ডাকব না, একথা তো কখনও বলিনি। বলেছি, সময় হলে জানাব। এখন সময় হয়েছে।'

চুপ হয়ে গেলেন কুপার।

সবাই উত্তেজিত। আগামী রাতেই এসব কিছুর সমাধান হবে। কালকের পর রহস্যটার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

দিনের বেলা কোন এক সময় পুলিশকে জানাবেন কুপার, এটাই ঠিক হলো। কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই সেই যে ট্যুরিস্ট ঢোকা আরম্ভ হলো দোকানে, বন্ধই আর হতে চায় না। তাতে কুপারের ক্ষতি নেই, লাভ। ক্রমাগত বকবক আর জিনিস বিক্রি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি। সন্ধ্যায় যখন কাস্টোমার আসা বন্ধ হলো, তখন তাঁর মনে হলো এখন গিয়ে আর সব কথা বলার সময় নেই। কারণ যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে ছেলেমেয়েরা। সঙ্গে করে রঙিন কাঁচ নিয়ে আসবে, মূর্তির ভেতর ভরে দেয়ার জন্যে। কিন্তু পুলিশকেও না জানালে নয়। তাই থানায় না গিয়ে বরং ফোন করলেন শেরিফকে। জানালেন, তিনটে চোরকে ধরার চমৎকার এক সুযোগ হাতে এসেছে। দক্ষিণ আমেরিকার মিউজিয়ামে ডাকাতি করছে যে দলটা তাদেরই লোক। কঠিন কোন কাজ নয়। তাদেরকে গিয়ে কেবল ডেভিলস রকের কাছে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে। সংক্ষেপে জানালেন কুপার, রাতে কেন যেতে হবে তাঁকে সৈকতের ওখানটায়।

বেশ ভাল একটা বানানো গল্প মনে হলো শেরিফের কাছে। কুপারের কথা বিশ্বাস করলেন না তিনি। লোকের টেলিফোন পেয়ে এরকম করে গিয়ে বহুবার ধোঁকা খেয়েছেন। দেখা গেছে নিছক মজা করার জন্যেই মিথ্যে কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, খোঁজখবর না নিয়ে, না জেনেশুনে

রাত দুপুরে গিয়ে কারও রসিকতার শিকার আর হবেন না। বরং রসিকতার জবাব রসিকতা দিয়েই দেয়ার জন্যে বলে দিলেন সময়মত দলবল নিয়ে হাজির থাকবেন।

খুশি হয়ে ফোন রেখে দিলেন কুপার। এত তাড়াতাড়ি যে শেরিফকে বোঝাতে পারবেন কল্পনাই করেননি।

কয়েক মিনিট পরেই এসে হাজির হলো গোয়েন্দারা। ওদেরকে খবরটা জানালেন তিনি। শেরিফ এত দ্রুত বিশ্বাস করায় ওরাও অবাক হলো, বিশেষ করে কিশোর। যাই হোক, সেটা নিয়ে আর কোন আলোচনা না করে সঙ্গে করে আনা কাঁচের টুকরোগুলো মূর্তির ভেতর ভরার কাজে মন দিল সে।

রাত দেড়টায় ডেভিলস রকে পৌঁছল ওরা। আধ ঘণ্টা আগেই চলে এসেছে, যাতে জায়গা বেছে নিয়ে লুকানোর সময় পায়। বালির টিবিতে মাঝে মাঝে জন্মে আছে ঝোপঝাড়। ওগুলোর আড়ালে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল ওরা। চাঁদের আলোয় এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সৈকত। স্যুটকেস হাতে পৌনে দুটোর সময় পৌঁছলেন কুপার। পনেরো মিনিট বাকি আছে এখনও। হাতঘড়ি দেখলেন একবার। তারপর পায়চারি শুরু করলেন বালির ওপর। দিনের মত গরম তো নেইই, বরং বেশ ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। হাঁটাচলা করে শরীরটাকে গরম রাখতে চাইছেন। ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে একটুও ভয় পাননি। কারণ তিনি নিশ্চিত, আশেপাশে লুকিয়ে আছে অনেক পুলিশ।

ঠিক দুটোয় কিশোরের গায়ে খোঁচা মারল মুসা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'হেই দেখো, একটা নৌকা!'

কিশোর তাকাচ্ছিল রাস্তা আর বালির টিবিগুলোর দিকে। পুলিশের কোন লোকের ছায়াও চোখে পড়েনি একবার, কোন নড়াচড়াই দেখতে পায়নি। অবাক হয়ে ভাবছিল, শেরিফ কি সত্যিই লোক পাঠিয়েছেন? মুসার কথায় ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল নৌকাটাকে। জলপথে আসবে চোরেরা, এটা ভাবেনি সে। রাস্তার দিকে চোখ রাখার সেটাও আরেকটা কারণ। কিছুটা ঘাবড়ে গেল। পুলিশের কোন বোট দেখা যাচ্ছে না। প্রয়োজন পড়লে এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে পারবে তো?

এগিয়ে আসছে নৌকাটা। পায়চারি থামিয়ে কুপারও তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে। তীরে ভিড়ল নৌকা। লাফিয়ে নামল দুজন লোক। হ্যারি আর জনকে চিনতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের।

রবিন বলল। 'পুলিশ কি এল?'

'আসার তো কথা,' জিনা বলল।

সাগরের দিক থেকে হাওয়া বইছে। নীরব রাত। ফলে দূর থেকেও লোকগুলোর কথা শোনা গেল।

'মাল এনেছ?' হ্যারির প্রশ্ন।

'এনেছি,' স্যুটকেসটা বাড়িয়ে দিলেন কুপার।

বালিতে নামিয়ে ওটার ডালা খুলল জন। টর্চের আলোয় দেখল মূর্তিগুলো। 'হ্যাঁ, এগুলোই। সানটা কোথায়?'

নিরীহ স্বরে কুপার জবাব দিলেন, 'কিসের কথা বলছেন?'

'দেবতার মূর্তিটার মধ্যে যে জিনিসটা ছিল। গোল্ডেন সান।'

'গোল্ডেন সান? সেটা আবার কি?'

খপ করে কুপারের কব্জি চেপে ধরল হ্যারি। ধমকে উঠল, 'খবরদার, আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না। চলো, বসের সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে।'

'দেখুন,' প্রতিবাদ করতে লাগলেন কুপার, 'যা চেয়েছেন দিয়ে দিয়েছি…আর কিসের কথা বলছেন…'

'চুপ! এসো। একটা কথা বলবে না।'

'কোথায় আপনাদের বস্?'

'ইয়টে। গেলেই দেখতে পাবে।'

হাত ধরে টানতে টানতে কুপারকে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলল দুজনে।

কুপার ভাবছেন, এইবার বেরোবে পুলিশ।…কিন্তু এল না। আসছে না কেন? তারা কি বুঝতে পারছে না কিছু? আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না তিনি, চিৎকার করে উঠলেন, 'বাঁচাও, বাঁচাও! আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!'

কিন্তু আড়াল থেকে বেরোল না পুলিশের কোন লোক। এইবার ভয় পেলেন কুপার। বুঝলেন, পুলিশ আসেনি। লোকগুলোর নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

হাসছে দুই চোর। একজন বলল, 'যতই চেঁচাও, কেউ আসবে না তোমাকে বাঁচাতে। কেউ শুনবে না তোমার চিৎকার।'

তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কি করবে ওরাও বুঝতে পারছে না। ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কুপারকে, এখনও বেরোয় না কেন পুলিশ? তবে কি আসেনি?

নৌকা ভাসাল চোরেরা। তবু বেরোল না পুলিশ। নিশ্চিত হয়ে গেল গোয়েন্দারা, সত্যিই আসেনি পুলিশ।

মুসা বলল, 'নিয়ে যাচ্ছে তো! কিছু একটা করা দরকার আমাদের!'

'কি করব?' গলা কাঁপছে জিনার। 'রাফিকে লেলিয়ে দেব?'

'এখন আর দিয়ে কোন লাভ নেই। পানিতে কিছু করতে পারবে না ও,' কিশোর বলল। অন্যদের মত অতটা ঘাবড়ায়নি সে। এরকম কিছু ঘটলে কি করবে মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিল।

কি করতে হবে সঙ্গীদের বলতে লাগল সে। সাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে কালোমত দেখা যাচ্ছে, ওটাই নিশ্চয় ইয়ট। ডোনাই ওতে রয়ে গেছে। এক দৌড়ে বাড়ি চলে যাই চলো আমরা। তারপর জিনার নৌকাটা নিয়ে চলে যাব ইয়টের কাছে। জলপথে কোন বিপদ আশা করবে না ওরা। নজর না রাখার সম্ভাবনাই বেশি। শব্দ না করলে ওদের চোখে পড়ব না আমরা।'

'তারপর?' জানতে চাইল রবিন।

'পরেরটা পরে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। চলো। আর দেরি নয়।'

কিছুক্ষণ পরই জিনার নৌকা নিয়ে ইয়টে চলল গোয়েন্দারা। দাঁড় বাইছে জিনা আর মুসা। নিঃশব্দে দ্রুত ইয়টের দিকে এগিয়ে চলেছে নৌকা। পৌঁছতে বেশি দেরি হলো না। ডেকে কেউ নেই। কেউ দেখেনি ওদেরকে। ইয়টে ওঠাও কঠিন হবে না। কান পেতে শুনতে শুনতে কিশোর বলল, 'আমি আর মুসা যাচ্ছি। তোমরা থাকো। রাফিকে সাবধানে রাখবে। একটা শব্দও যাতে না করে।'

ডেকে উঠে এল কিশোর আর মুসা। কাউকে চোখে পড়ল না। ডেকে কেউ থাকলে অবশ্য এত সহজে ওরা উঠতে পারত না। হ্যাচের ভেতর দিয়ে কথা শোনা যাচ্ছে। পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল দুজনে।

হ্যারি বলছে, 'গোল্ডেন সানটার কথা নাকি জানে না, বস্।'

'মূর্তিগুলোর ভেতর যা পেয়েছি ওগুলোও সাধারণ কাঁচ,' বলল জন।

আরেকটা কণ্ঠ শোনা গেল, ডোনাইই হবে, 'তাহলে এভাবেই ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেছ? এসব করে পার পাবে না বাপ। এখন বলে ফেলো দেখি জিনিসগুলো কোথায় রেখেছ?'

'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না!' কুপারের কণ্ঠ। 'যা চেয়েছেন দিয়ে দিলাম, আর কি বাকি রইল? হতচ্ছাড়া ওই বলিভিয়ান মূর্তিটা আসার পর থেকেই একটার পর একটা গোলমাল হয়েই চলেছে। কোন অলক্ষী যে পাঠাল ওটা বুঝতে পারছি না। হুমকি দেয়া হলো, জিনিস চুরি হলো; তারপর আমাকেই তুলে নিয়ে আসা হলো। এসব কি কাণ্ড!'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ডোনাইয়ের কণ্ঠ, 'কি কাণ্ড এখনও কিছু টের পাওনি। তবে এবার পাবে।...বলো, গোল্ডেন সানটা কোথায়...'

চাপা একটা গোঙানি শোনা গেল। গলা টিপে ধরলে যেমন আওয়াজ বেরোয় তেমনি।

চট করে একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর।

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু শুনব?' চাপা রাগ মুসার কণ্ঠে।

'মোটেও না। দাঁড়াও না, দেখি কি করে? অত সহজে কুপারকে মারবে না ওরা। আগে তাঁর মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করবে।'

থেমে গেল গোঙানি। আবার শোনা গেল ডোনাইয়ের গলা, 'হয়েছে তো? এবার বলো। এরপর নইলে আরও ব্যথা পাবে।...কি হলো? শুরু করব আবার?'

'দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন,' ককিয়ে উঠলেন কুপার। অভিনয় ভালই করেন। 'আমি কিচ্ছু জানি না।'

'মুসা, মন দিয়ে শোনো কি করতে হবে। কোন প্রশ্ন করবে না। এখন সব ব্যাখ্যা করার সময় নেই। নৌকায় নেমে যাও। তারপর তুমি আর জিনা সাঁতরে চলে যাও জিনার দ্বীপটায়।'

'তা নাহয় গেলাম, বেশি তো দূরে না। বড় জোর আধ মাইল। কিন্তু...'

'বললাম না এখন কোন প্রশ্ন নয়। যাও। রাফিকে নিয়ে রবিনকে অপেক্ষা করতে বলবে। ওদেরকে দরকার হবে এখানে। দ্বীপে উঠে দুর্গে ঢুকবে। সব চেয়ে উত্তরের পাতালঘরটায় ঢুকে দরজার কাছে লুকিয়ে বসে থাকবে আমাদের জন্যে।'

'ওই যে যেটার বিরাট ভারি দরজা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা তাহলে আসছ?'

'হ্যাঁ। এমন ভাবে তৈরি থাকবে, যাতে বলামাত্র দরজা লাগিয়ে দিতে পারো। যাও, আর দেরি কোরো না।'

হ্যাচ দিয়ে আবার ভেসে এল গোঙানির শব্দ। মুসাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিল কিশোর।

মুসা চলে যেতেই কয়েকবার লম্বা দম নিল সে। অভিনয় করার জন্যে তৈরি করে নিল নিজেকে। তারপর পা ঢুকিয়ে দিল হ্যাচের ভেতর। নামতে শুরু করল মই বেয়ে।

নিঃশব্দে নেমে চলে এল। একটা দরজায় আলো দেখা যাচ্ছে। পা বাড়াল সেদিকে।

দরজার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। প্রথমেই চোখ পড়ল হ্যারির ওপর। দাঁত বের করে হাসছে। একটা চোখ কুঁচকে আরেকটা ভুরু উঁচিয়ে রেখেছে জন। ডোনাইয়ের মুখ থমথমে। আরও কুৎসিত লাগছে এখন ব্যাঙটাকে। পেছন থেকে দুহাতে চেপে ধরেছে কুপারের গলা। চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে বেচারা অ্যানটিক ডিলারের হাত-পা। দম বন্ধ হয়ে যখন চোখ উল্টে দেয়ার অবস্থা হলো তাঁর, তখন গলা থেকে হাত সরিয়ে আনা হলো।

'হ্যাঁ, এইবার বলো,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ডোনাই।

'থামুন!' দরজার কাছ থেকে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

এগারো

ঝট করে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ।

ছুটে ঘরে ঢুকল কিশোর। আছাড় খেয়ে পড়ল ডোনাইয়ের পায়ের কাছে। হাতজোড় করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে লাগল, 'দোহাই আপনার, মিস্টার ওনকে মারবেন না। আসলেই তিনি গোল্ডেন সানের কথা কিছু জানেন না। জিনিসটা আমার কাছে। ইস্, যে ভাবে গলা টিপে ধরেছিলেন আপনি, আরেকটু হলেই তিনি মরে যেতেন!'

বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠে কড়া গলায় দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল ডোনাই, 'কে ছেলেটা?'

জবাব দিল জন, 'ওই চারজনের একজন। আপনাকে বলেছিলাম না…'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল ডোনাই, 'ঢুকলে কি করে এখানে?'

এবার কেঁদেই ফেলল কিশোর। দুহাতে মুখ ঢাকল। এমন ফোঁপানো শুরু করল, কথাই আর বেরোতে চায় না মুখ দিয়ে।

অনেকটা সামলে নিয়েছেন কুপার। কিশোরের এই আচরণের সঙ্গে পরিচিত নন। শুরুতে খুবই অবাক হয়েছিলেন। আস্তে আস্তে সন্দেহ বাড়তে লাগল তাঁর, নিশ্চয় কোন কারণে এই অভিনয়টা করছে সে। সময় নষ্ট করছে। সেই সময়টা অন্য

কাউকে কাজে লাগাতে দিচ্ছে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল কিশোর, 'প্লীজ, স্যার!…দোহাই আপনার, মিস্টার রেনকে ছেড়ে দিন। তাঁর কোন দোষ নেই। তিনি কিচ্ছু করেননি।'

মুসা আর জিনাকে জাহাজের কাছ থেকে সরে যাওয়ার সময় করে দেয়ার জন্যে এসব করছে কিশোর।

'দেখো ছেলে,' কিশোরের কান্না দেখে ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেছে ডোনাই, 'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে। তোমার এই বন্ধুটিকে যদি বাঁচাতেই চাও, যা জিজ্ঞেস করব ঠিক ঠিক জবাব দেবে। নইলে তার তো রক্ষা নেইই, সেধে এসে তুমিও পড়লে বিপদে।'

একথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ার ভান করল কিশোর। প্রচণ্ড এক চিৎকার দিয়ে দরজার দিকে দিল দৌড়। আটকে ফেলল তাকে জন। হাত ধরে টেনে আনতে আনতে বলল, 'বসের কথার জবাব তোমাকে দিতেই হবে! এখানে ঢুকলে কি করে?'

'আমি আর আমার বন্ধু ডাকাত ডাকাত খেলছিলাম। জলদস্যু। কয়েকজন ছেলের সঙ্গে বাজি ধরেছি, অন্ধকারে এখানে আসতে ভয় পাব না বলে। তাই আমার আংকেলের নৌকাটা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।' চেহারাটা করুণ করে রেখেছে কিশোর। আরেকবার ফোঁপাল। 'পড়ে গেলাম স্রোতের মধ্যে। নৌকাটা ভেসে চলে এল এদিকে। দাঁড় বাইতে বাইতে হাত ব্যথা হয়ে গেল। আর পারছিলাম না। তাই আপনাদের জাহাজটা দেখে এটার সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। সাহায্যের জন্যে উঠে এলাম ওপরে। তারপর শুনি মিস্টার রেনের চিৎকার…'

'শুনে কৌতূহলী হয়ে দেখতে চলে এলে?'

'হ্যাঁ। বড় বেশি কৌতূহল আমার। কত দিন কত বিপদে যে পড়েছি এর জন্যে, তা-ও শিক্ষা হয় না!'

'বস্,' জন বলল, 'যে বাড়িতে মূর্তিটা লুকিয়ে রেখেছিল কুপার, এই ছেলেটাকে সেই বাড়িতে দেখেছি। ওখানেই থাকে মনে হয়। এই, থাকো না?'

'হ্যাঁ। বেড়াতে এসেছি।'

'চমৎকার,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে কঠিন হয়ে উঠল ডোনাইয়ের দৃষ্টি। 'তাহলে তো তোমার জানাটা স্বাভাবিক।' কুপারকে দেখিয়ে বলল, 'এ ব্যাটা তো বলছে কিচ্ছু জানে না। দেখা যাক এখন তুমি কি জানো? তাহলে বলছ, কাঠের মূর্তিটার ভেতরে একটা সোনার জিনিস খুঁজে পেয়েছ?'

দ্বিধায় পড়ে গেল যেন কিশোর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। একপাশে কাত হয়ে ঝুলে পড়ল মাথা। মনে মনে হাসিতে ফেটে পড়ছে। ঠিক যেভাবে ঘটবে আশা করেছিল তাই ঘটছে।

'ও, তাহলে জবাব দেবে না? আবার শুরু করব কুপারের ওপর? দেব গলাটা মুচড়ে?'

আতঙ্কে শিউরে উঠল কিশোর। 'না না না!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'দোহাই আপনার। বলছি, আমি সব বলছি। আমি আর আমার বন্ধুরা মূর্তিটাকে সরাতে

গিয়ে উল্টে ফেলে দিয়েছিলাম। পড়ে যাওয়াতে বুকের কাছে একটা ঢাকনা সরে গেল। দেখি, নিচে একটা খোঁড়ল। তার মধ্যে দারুণ একটা জিনিস পেলাম। চকচকে একটা সোনার তৈরি সূর্য। তাতে নানা রঙের পাথর বসানো। খুব সুন্দর। দেখলে আপনারও ভাল লাগবে।'

চট করে দুই সহকারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ডোনাই। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। 'ভাল লাগবে বলেই তো এত করে চাইছি। মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছ। গুড। কুপারকে জানাওনি বুঝতে পারছি। তবে তার জিনিস চুরি করেছ ভেবে মন খারাপ করার কিছু নেই। জিনিসটা তার নয়, আমাদের। গোল্ডেন সান আমাদের জিনিস। তাহলে এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বলে দাও কোথায় রেখেছ?'

'বললে তো খুঁজে পাবেন না। লুকিয়ে রেখেছি।'

'তাহলে তো তোমাকেই বের করে দিতে হয়। কোথায় রেখেছ?'

'কাছেই। একটা দ্বীপে। পুরানো ভাঙা দুর্গ আছে দ্বীপটায়।'

মাথা ঝাঁকাল ডোনাই। 'হুঁ। আরেকটা কথা। এই পাঁচটা মূর্তির মধ্যে,' টেবিলে রাখা মূর্তিগুলো দেখাল সে, 'অনেকগুলো পাথর ছিল। পেয়েছি কেবল কতগুলো রঙিন কাঁচ। এ ব্যাপারে কি জানো?'

মনে মনে কিছুটা ভরসা হচ্ছিল কুপারের, ডোনাইয়ের এই প্রশ্ন শুনে আবার চুপসে গেল। কিশোর যদি এখন বলে বসে, ওরাই পাথর সরিয়ে কাঁচ ভরে রেখেছে, তাহলেই সর্বনাশ। চালাকিটা ধরে ফেলতে পারে ডোনাই।

কিন্তু সে কথা বলল না কিশোর। মুখের ভাব এমন করে ফেলল, যেন আকাশ থেকে পড়েছে। মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওগুলো? দেখেছি। মিস্টার রেনের দোকানে বাক্স থেকে ওগুলো বের করতে তাঁকে সাহায্য করেছি। কিন্তু ভেতরে কি আছে দেখিনি। কিছু আছে কিনা তাই জানি না।'

'আমিও না,' বলে উঠলেন কুপার। 'সে জন্যেই তো আপনারা যখন জিজ্ঞেস করছিলেন কিছু বলতে পারছিলাম না। বিশ্বাস তো করলেন না আমার কথা।'

'হুঁমম!' দ্বিধায় পড়ে গেছে ডোনাই। ভাবতে আরম্ভ করেছে, পাথরগুলো বলিভিয়াতেই খোয়া গেছে কিনা। যাদের হাত ঘুরে এসেছে হয়তো তাদেরই কেউ সেগুলো মেরে দিয়ে কাঁচ ভরে দিয়েছে। আবার 'হুঁমম!' বলে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, আপাতত পাথরের চিন্তা বাদই দিচ্ছি। গোল্ডেন সানটা দরকার।' কিশোরকে বলল, 'দ্বীপটাতে লুকিয়েছ, না? হ্যারি, আগে দেখো, ছেলেটা সত্যি বলছে কিনা। নৌকাটা আছে কিনা দেখো। থাকলে জাহাজের পেছনে বেঁধে রেখে ওর বন্ধুকে নিয়ে এসো।'

'হুঁশিয়ার থাকবেন,' হ্যারিকে বলল কিশোর। 'নৌকায় আমাদের কুকুরটাও আছে। অচেনা লোকের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। কামড়েও দিতে পারে।...দাঁড়ান, আমিও আসি।'

পাঁচ মিনিট পর রবিন আর রাফিকে নিয়ে আবার কেবিনে ঢুকল কিশোর ও হ্যারি।

কিশোরের দিকে তাকাল ডোনাই। 'হুঁ, এ পর্যন্ত যা যা বলেছ, সব মিলে

গেছে। আশা করি গোল্ডেন সানের ব্যাপারেও মিথ্যে বলোনি। হ্যারি, নোঙর তোলো। ইঞ্জিন স্টার্ট দাও। দ্বীপে যাচ্ছি আমরা।'

হাসি চাপতে কষ্ট হলো কিশোরের। কিছুতেই তাকাল না রবিনের দিকে, তাহলে হেসে ফেলত। তার চালাকি ধরতে পারেনি বোকা চোরগুলো। তিন তিনটে লোককে এভাবে গাধা বানাতে পেরে খুব মজা লাগছে তার। তবে ভালয় ভালয় সব শেষ করতে পারলে হয়।

জিনা আর মুসা এখনও দ্বীপে পৌঁছতে পারেনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার জন্যে আরও সময় ব্যয় করা দরকার। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই দ্বীপে গেছেন কখনও?'

মাথা নাড়ল হ্যারি, 'না।'

'তাহলে খুব সাবধানে চালাবেন। জায়গা খুব খারাপ। ওদিকটায় বহুবার গেছি আমরা। পানির নিচে চোখা চোখা পাথরে বোঝাই। জাহাজের তলায় লাগলে শেষ। কত জাহাজ আর নৌকার যে ক্ষতি হয়েছে ওদিকে গিয়ে...'

'তুমি এসো,' এক আঙুল নেড়ে ডাকল হ্যারি। 'পথ দেখাবে। তবে কোন চালাকি করবে না। পালানোর চেষ্টা করবে না। তাহলে ভুগতে হবে বলে দিলাম।'

'না না, চালাকি করব না।'

ঘুরপথে ওদেরকে নিয়ে চলল কিশোর। তাতে সময় কিছুটা বেশি লাগল। তবে তাকে বিশ্বাস করল ওরা। কারণ দ্বীপের চারপাশের পানিতে সত্যিই চোখা চোখা পাথর খুব বেশি। দ্বীপ থেকে বেশ কিছুটা দূরে নোঙর ফেলতে বলল সে।

হ্যারি আর জনকে নির্দেশ দিল ডোনাই, 'নৌকা নিয়ে যাও। ছেলেটা তোমাদের পথ দেখাবে। গোল্ডেন সানটা নিয়ে এসো। ওর দুই বন্ধু আর কুত্তাটাকে নিয়ে আমি থাকছি। ও যদি কোন চালাকি করে, এরা মরবে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ডোনাই যে জাহাজে থেকে যাবে এই সম্ভাবনাটার কথা ভাবেনি। তাকে কাবু করার জন্যে এখন নতুন আরেকটা বুদ্ধি বের করতে হবে। ভাবতে ভাবতে চলল হ্যারি আর জনের সঙ্গে।

'আমি যেখানে বলব সেখানে নৌকা রাখবেন। জায়গা এদিকে খুবই খারাপ। সাবধান।'

ইচ্ছে করেই পুরো দ্বীপের চারপাশে নৌকা নিয়ে ওদেরকে এক চক্কর ঘোরাল কিশোর। নিশ্চিত হয়ে নিল, মুসা আর জিনা পৌঁছেছে কিনা। ওদের দেখা গেল না। তারমানে দ্বীপে উঠে গেছে। এতক্ষণে হয়তো ঢুকে পড়েছে পাতালঘরে।

'ওই যে, ওখানটায় ঢুকুন,' হাত তুলে দেখাল সে। 'ওখানে একটা খাঁড়ি আছে। তার পরে ছোট্ট এক চিলতে সৈকত।'

খাঁড়িতে নৌকা ঢোকাল হ্যারি। পারও হয়ে এল। ঘ্যাঁচ করে তলা ঠেকল সৈকতের বালিতে। লাফিয়ে নামল কিশোর। জন আর হ্যারিও নামল। ঢেউয়ে ভেসে যেতে পারে, সে জন্যে নৌকাটাকে টেনে তুলে রাখল ওপরে।

জন জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে?'

'দুর্গের মধ্যে লুকিয়েছি,' পাহাড়ের ওপরে হাত তুলে দেখাল সে। 'আপনারা

যাবেন, না আমি নিয়ে আসব গিয়ে?'

'নিয়ে এসো' বলতে পারলেই খুশি হত জন, কিন্তু বসের ভয়ে পারল না। যদি কোন গণ্ডগোল হয়ে যায় ডোনাই তাকে আস্ত রাখবে না। আমতা আমতা করে বলল, 'নাহ্, চলো আমরাও যাই।'

প্রায় খাড়া উঠে গেছে সরু পথ। সেই পথ ধরে একসারিতে উঠতে লাগল তিনজনে। কিশোরের চেনা পথ, বহুবার এসেছে এখানে। হ্যারি আর জনের জন্যে নতুন। কয়েকবার অজায়গায় পা গিয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল। অবশেষে ওপরে উঠে এল ওরা।

চাঁদের আলো পড়েছে পুরানো দুর্গ আর তার সামনের ঝোপঝাড়, গাছপালায়। কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

আগে আগে চলল কিশোর। পাথরে তৈরি একটা খিলানের নিচ দিয়ে এসে একটা চত্বর পেরোল, ঢুকল বিশাল এক হলঘরে। দেয়াল-টেয়াল প্রায় সবই ভাঙা টার।

'আর কদ্দূর?' জানতে চাইল জন।

'আসুন না।'

অহেতুক ঘোরাচ্ছে দুজনকে কিশোর, অস্থির করে তুলে দ্বিধায় ফেলে দেয়ার জন্যে। অহেতুক এখানে ওখানে ঢুকল-বেরোল, তারপর এসে দাঁড়াল একটা চ্যাপ্টা পাথরের কাছে। তাতে লোহার আঙটা লাগানো। পাতালঘরে নামার সুড়ঙ্গের ঢাকনা ওই পাথরটা।

'অনেক সুড়ঙ্গ আছে এই দুর্গের নিচে, পাতালঘর আছে,' লোকগুলোকে বলল কিশোর। 'প্রায়ই এখানে খেলতে আসি আমরা। এই যে পাথরটা দেখছেন, এর নিচ থেকে নেমে গেছে লোহার মই। সেটা দিয়ে নামতে হবে। একটা পাতালঘরে জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছি।'

'ভাল জায়গাই বের করেছ, হুঁহ্!' ঢাকনাটা সরানোর জন্যে আঙটা চেপে ধরল হ্যারি। সরানোর পর বলল, 'তুমি আগে নামো। পথ দেখাও।'

নেমেই চলেছে মই। শেষ আর হয় না। অনেক অনেক নিচে শেষ হলো। নিচে থেকে টর্চ জেলে ধরে রাখল যাতে হ্যারি আর জন ঠিকমত নামতে পারে।

মুসারা শুনছে কিনা কে জানে, ভাবল কিশোর। নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে বেচারাদের। এতটা পথ সাঁতরে এসে ভেজা কাপড় নিয়ে বসে আছে। ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

কিশোর যে ভাবে বলে দিয়েছে সে ভাবেই বড় দরজাটার আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে মুসা আর জিনা। কথার শব্দ কানে এল। তারপর দেখল টর্চের আলো। একটু পরেই দেখতে পেল কিশোর, হ্যারি আর জনকে।

'মিস্টার ডোনাই না এসে ভুল করেছেন,' লোকগুলোকে বলছে কিশোর। 'এসব দেখতে খুব ভাল লাগত তাঁর।'

'ফালতু কথা বাদ দাও!' অধৈর্য হয়ে পড়েছে হ্যারি। 'তাড়াতাড়ি জিনিসটা বের করে দাও, ভাগি এখান থেকে। জঘন্য জায়গা!'

'এই যে এসে গেছি। ওই যে বড় দরজাটা দেখছেন, তার ওপাশে একটা ঘর। সেখানেই মাটির নিচে পুঁতে রেখেছি গোল্ডেন সানটা। বাঁ দিকে, শেষ মাথার কোণটায়।'

সরে দাঁড়িয়ে দুই চোরকে আগে ঢোকার জায়গা করে দিল কিশোর। অস্থির হয়ে উঠেছে লোকগুলো। জিনিসটা হাতে পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করছে। সে আশা করল, সোজা কোণের দিকে এগোবে ওরা। মুসা বা জিনাকে দেখতে পাবে না।

কিশোরকে বিশ্বাস করেছে ওরা। ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল শেষ প্রান্তের দিকে।

কিশোরও ঢুকল। সরে এসে তার হাতে চাপ দিল মুসা।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'বেরোও। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেব।'

চোখের পলকে বেরিয়ে চলে এল তিনজনে। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারি দরজাটার গায়ে। ঠেলতে শুরু করল। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। বাইরে থেকে আটকে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। চোখের পলকে আটকে দিল। এই দরজা খুলে না দিলে এঘর থেকে আর কিছুতেই বেরোতে পারবে না লোকগুলো।

আনন্দে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল মুসা।

হাসতে হাসতে জিনা বলল, 'যত খুশি চেঁচাক ব্যাটারা এখন ওখানে বসে। কেউ শুনবে না।'

কিশোর বলল, 'জলদি চলো। রবিনরা জাহাজে রয়ে গেছে। ওদের ছাড়াতে হবে। এই, ভেজা কাপড়ে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'হলেও ভুলে গেছি,' মুসা বলল। 'এরকম আনন্দ তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় মেলে না। তাছাড়া সব কাপড় ভেজেনি। পানিতে নামার আগে শার্ট-প্যান্ট খুলে নিয়ে মাথায় বেঁধে নিয়েছিলাম। প্রায় শুকনোই আছে ওগুলো।'

'বাহ্, আজকাল মাথাটা তোমার খুলতে আরম্ভ করেছে। ভাল। চলো, চলো।'

মই বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। ঠেলেঠেলে আবার লাগিয়ে দিল ঢাকনাটা। মুসা আর জিনা ঢোকার সময় অন্য পথে ঢুকেছিল। এদিক দিয়ে ঢোকেনি, তাই তখন ঢাকনাও সরাতে হয়নি।

খাঁড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সব বলতে লাগল কিশোর। চোরগুলোকে কিভাবে বোকা বানানো হয়েছে শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল মুসা আর জিনা।

'কিন্তু রবিনদেরকে তো আটকে রেখেছে ডোনাই। মুক্ত করবে কি করে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কোন শব্দ না করে ইয়টের গায়ে নৌকা ভেড়াব। চুপ করে উঠে যাব ওপরে। হঠাৎ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডোনাইকে কাবু করে ফেলার চেষ্টা করব। তারপর আর কি? ধরে নিয়ে যাব পুলিশের কাছে। ওরাই এসে পাতালঘর থেকে বের করবে হ্যারি আর জনকে। ডোনাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আশা করি এবার আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন শেরিফ।'

'যদি ডেকে দাঁড়িয়ে থাকে ডোনাই? নৌকাটা আসছে কিনা দেখে?' প্রশ্ন তুলল

জিনা।

'এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে। আর কোন উপায় নেই।'

সৈকতে নেমে এল ওরা। ঠেলে পানিতে নামাল নৌকা। দাঁড় তুলে নিল জিনা আর মুসা।

খাড়ি থেকে বেরোতেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর।

'কি হলো?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ইয়টটা নেই!'

বারো

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। এরকম কিছু ঘটবে কল্পনাই করেনি। বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাপারটা কি? এমন তো হওয়ার কথা নয়? গোল্ডেন সান ফেলে কিছুতেই যেতে পারে না ডোনাই!'

'রবিন, কুপার আর রাফিকেও তো নিয়ে গেল!' জিনার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'কোথায় যেতে পারে বলো তো?' মুসার প্রশ্ন।

তিনজনের কারও কাছেই কোন জবাব নেই।

হ্যারি আর জনকে নিয়ে কিশোর নেমে আসার পর জাহাজে কি ঘটেছে তার জানা নেই। তবে অনেক কিছুই ঘটেছে। চুপ করে কুপারের পাশে বসে ছিল রবিন। তার কাছে রাফি। সে-ও চুপ। কুপার তখনও চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। আগের জায়গায় বসে আছে ডোনাই।

হঠাৎ বলল সে, 'অপেক্ষাই করতে হবে আমাদের, তাই না? গোল্ডেন সান নিয়ে যদি ঠিকমত ফিরে আসে আমার অ্যাসিসটেন্টরা তাহলে সবার জন্যেই ভাল। তারপর পাঁচটা মূর্তির ভেতরে যে পাথর না পেয়ে কাঁচ পাওয়া গেল, সেটা নিয়ে আলাপ করতে পারব।'

নীরবে কাঁধ ঝাঁকালেন শুধু কুপার। ভঙ্গি করলেন যেন সেটা তাঁর ব্যাপার নয়। তবে ভেতরে ভেতরে খুবই চিন্তিত। গোল্ডেন সান দ্বীপে নেই। তাহলে চোর দুটোকে কি করতে নিয়ে গেছে কিশোর? রবিনও ভয় পাচ্ছে। কি ঘটবে বলা মুশকিল। একমাত্র নির্ভর করতে হচ্ছে কিশোরের উপস্থিত বুদ্ধির ওপর। কিন্তু পরিস্থিতি যে রকম শেষ রক্ষা করতে পারলে হয়।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা উঠে দাঁড়াল ডোনাই। 'আমি একটু ওপরে যাচ্ছি। রবিন, তুমি নড়বে না। কুত্তাটাকেও চুপ থাকতে বলবে। নাহলে,' পকেট থেকে একটা ভয়ঙ্কর চেহারার পিস্তল বের করে দেখাল সে, 'ওটাকেই আগে খতম করা হবে। আমি দু-মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

কুত্তা শব্দটা শুনেই কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রাফি। কেবল জিনা তাকে চুপ থাকতে বলে গেছে দেখে এখনও কিছু করেনি, নাহলে এতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ত গিয়ে ঘৃণিত লোকটার ঘাড়ে।

না নড়তে বলেছে, কিন্তু ডোনাই বেরিয়েও সারতে পারল না, অমনি উঠে দাঁড়াল রবিন। কুপারের বাঁধন টেনেটুনে দেখতে লাগল খোলা যায় কিনা। বড় শক্ত

বাঁধন। গিঁট খুলতে অনেক সময় লাগবে। সব চেয়ে ভাল হত একটা ছুরি পেলে। নেই যখন, কি আর করা। খোলারই চেষ্টা করতে লাগল সে।

'খুলে লাভ নেই,' কুপার বললেন। 'কিছু করতে পারব না। লোকটার কাছে পিস্তল আছে।'

'মুক্ত তো হোন আগে, তারপর দেখা যাবে।'

'নিশ্চয় কোন বুদ্ধি করেছে কিশোর, তাই না?'

'তা তো করেছেই। ও কি আর বুদ্ধি ছাড়া থাকে। বিনা কারণে কিছু করে না।'

'কিন্তু দ্বীপে নিয়ে গেল কেন? গোল্ডেন সানটা তো ওখানে নেই।'

'নেই জেনেই তো নিয়েছে। মুসা আর জিনাকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যাটাদের জন্যে নিশ্চয় কোন ফাঁদ পেতেছে। আমাকে বলার সময় পায়নি...'

'তাহলে এই ব্যাপার, না!' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল ডোনাই। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে।

বাঁধন খোলা বন্ধ রেখে চমকে ফিরে তাকাল রবিন। সে কুপারের দৃষ্টি আড়াল করে ছিল বলে লোকটাকে ঢুকতে তিনিও দেখতে পাননি। আর রাফিকে তো চুপ থাকতেই বলা হয়েছিল, সে জন্যে সে-ও কিছু বলেনি। তবে ডোনাইয়ের হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে সে এখন গরগর করে উঠল।

রাগে সাদা হয়ে গেছে লোকটার মুখ। ভারি পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল কুপারের সামনে। ঘুসি পাকিয়ে নাড়ল তাঁর নাকের কাছে। 'তাহলে এই ব্যাপার! কিচ্ছু জানো না তুমি না!' রবিনের দিকে তাকাল। 'আর তোমরা, বিচ্ছুর দল, শয়তানী শুরু করেছ! বলেছিলাম না ভাল হবে না, এখন বোঝাব মজা!'

রবিনকে চড় মারার জন্যে হাত তুলল সে। ভীষণ গর্জন করে উঠল রাফি। মাঝপথেই থেমে গেল ডোনাইয়ের হাত। কুকুরটার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা চোখের দিকে তাকিয়ে মারার আর সাহস হলো না। হাতটা সরিয়ে নিল। 'হ্যারি আর জনের জন্যে অপেক্ষা, আর করছি না আমি। এখুনি জাহাজ নিয়ে চলে যাব। কুপার, মালগুলো কোথায় রেখেছ জলদি বলো, যদি এই ছেলেটাকে গুলি খেতে দেখতে না চাও।'

চোখ বন্ধ করে ফেললেন কুপার।

'কি হলো?' ধমকে উঠল ডোনাই। 'কথা কানে যায় না?'

চোখ মেললেন কুপার। রবিনের দিকে তাকালেন একবার। আবার তাকালেন ডোনাইয়ের চোখের দিকে। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না লোকটা। যা বলছে করবে। আর না বলে পারা যাবে না। বললেন তিনি, 'ব্যাংকের ভল্টে।'

'পাঁচটা মূর্তির ভেতর পাওয়া পাথরগুলোও আছে নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকালেন কুপার।

'বেশ। চালাকির চেষ্টা না করতে আর বলব না। নিজের গরজেই যাতে না করো তার ব্যবস্থা করব। এমন একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাব ছেলেটাকে, যেটা কেউ জানবে না, শুধু আমি ছাড়া। আমার কিছু হয়ে গেলে, ফিরে এসে মুক্ত করে দিতে না পারলে ছাড়াও পাবে না সে, না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরবে।

পুলিশকে খবর দিয়ে আমাকে আটকে ফেলে যদি ছেলেটাকে মারতে চাও, মারবে, তোমার ইচ্ছে।' কুপারের চোখের দিকে তাকাল। 'আমি এখন জাহাজ ছাড়তে যাচ্ছি।'

বেরিয়ে গেল ডোনাই। তবে এবার আর দরজা খোলা ফেলে গেল না, বাইরে থেকে লাগিয়ে দিল। কেবিনে আটকা পড়ল বন্দিরা।

পরস্পরের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল রবিন আর কুপার। নিজের হাত কামড়ে কেটে ফেলতে ইচ্ছে করছে রবিনের। কেন যে কথাগুলো বলতে গিয়েছিল! আলাপটা এখানে না করলেই কি হত না! কিশোর যে প্রায়ই সাবধান করে, যেখানে সেখানে সব কথা বলবে না, বেশি কথা বলবে না, এই জন্যেই করে। কথা হলো বন্দুকের গুলি। একবার ফসকে বেরিয়ে গেলে আর ঠেকানোর উপায় নেই। সে জন্যে বলার আগেই সাবধান থাকতে হয়।

তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কুপার বললেন, 'অত ভাবছ কেন? ওর জিনিস ওকে দিয়ে দেব। বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না, এভাবেই ধরে নেব, আর কি?'

'এসব হলো নিজের মনকে চোখ ঠারানো।'

'কিন্তু আর কি করতে পারি আমরা?'

'কিছু তো একটা করতেই হবে। নইলে কোন দিন আমাকে ক্ষমা করবে না কিশোর। এত কষ্ট করে সব কিছু করল সে, আর চোখের পলকে আমি সব নষ্ট করে দিলাম! সে করবে কি, আমিই তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না!'

চুপ হয়ে গেলেন কুপার। কি জবাব দেবেন? কোন উপায়ও বের করতে পারছেন না।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল জাহাজ। মিনিট পনেরো পর কেবিনের দরজা খুলে গেল আবার। ঘরে ঢুকল ডোনাই। আপনাআপনি চলছে জাহাজ, অটো পাইলটের ওপর চালানোর ভার ছেড়ে দিয়ে এসেছে। হাতে উদ্যত পিস্তল। রবিনকে বলল, 'এবার তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।'

নড়ল না রবিন।

'কি হলো?' ধমক দিল ডোনাই।

গরগর করে উঠল রাফি। রবিন জবাব দিল না। নড়লও না।

রাফির দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডোনাই। তারপর বলল, 'কুত্তাটা বহুত জ্বালাবে। এটাকে রেখে লাভ নেই…' তার দিকে পিস্তল ঘোরাতে শুরু করল সে।

চোখের পলকে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা। কি ঘটতে যাচ্ছে আঁচ করে ফেলেছিল বুদ্ধিমান কুকুরটা। ডোনাই পিস্তল ঘোরানো শুরু করতেই লাফিয়ে উঠল সে। কারও নির্দেশের আর তোয়াক্কা করল না। বিদ্যুৎ-গতিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডোনাইয়ের হাতের ওপর। নাড়া লেগে ওপর দিকে উঠে গেল পিস্তলের নল। বদ্ধ ঘরে গুলি ফোটার বিকট শব্দ হলো। কারও কোন ক্ষতি না করে ছাতে বিঁধল বুলেট। হাতে কামড় খেয়ে পিস্তলটা খসে পড়ে গেল তার হাত থেকে। লাফ দিয়ে

এসে সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিল রবিন। ততক্ষণে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে রাফিয়ান।

তাকে ডোনাইয়ের বুকের ওপর বসে থাকার নির্দেশ দিল রবিন। একটা ছুরি খুঁজতে শুরু করল। শেষমেষ চোরের সর্দারের পকেটেই পাওয়া গেল একটা পেননাইফ। সেটা দিয়ে কুপারের বাঁধন খুলে দিল সে।

ডলে ডলে হাত-পায়ের বাঁধা জায়গাগুলোর রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগলেন কুপার।

রবিন বলল, 'আগে শয়তানটাকে বাঁধুন। ছাড়া থাকলে কখন কি করে বসে ঠিক নেই।'

পিস্তল তাক করে ধরে রইল রবিন। একেবারে গায়ের সঙ্গে সেঁটে থেকে কড়া নজর রাখতে লাগল রাফি, ডোনাই কিছু করার চেষ্টা করলেই গাঁক করে কামড়ে ধরবে। ফলে চোরটাকে বেঁধে ফেলতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না কুপারকে।

বাঁধা শেষ করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। রবিনের দিকে ফিরলেন। তাঁর মুখেও হাসি।

'তাহলে আমরাই জিতলাম,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি।

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে। তবে কিশোরদেরকে সাহায্য করতে যেতে হবে এখন। কিন্তু জাহাজ তো অনেক দূরে চলে এসেছে। চালাবে কে?'

'আমি। তোমরা তো সবই করলে। আমি কি এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারব না?'

চওড়া হাসি দেখা দিল রবিনের মুখে। 'চলুন তাহলে। আমি সাহায্য করব আপনাকে। রাফি, তুই এখানেই থাক। ব্যাঙটা কিছু করার চেষ্টা করলে ভুঁড়িটা ফুটো করবি আগে। তারপর যেখানে ইচ্ছে কামড়াস, কেউ কিছু বলবে না তোকে।'

'হউ' করে খুশির একটা হাঁক ছাড়ল রাফিয়ান।

—o—

ভলিউম ২১

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।

জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালি। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্করের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০